প্রথম প্রকাশ ঃ ১লা বৈশাখ ১৩৬৫

প্রকাশক ঃ জয়দেব ঘোষ
মডেল পাবলিশিং হাউস
২এ, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট,
কলকাতা-৭০০ ০০৩

প্রচ্ছদ ও চিত্রাঙ্কন : স্বপন দেবনাথ, দিলীপ দাস

মুদ্রাকর : জী, শীল
ইম্প্রেসন প্রবলেম
২৭এ, তারক চ্যাটার্জী লেন, কলিকাতা-৫

প্রচ্ছদ ও রঙীন ছবি
নবজীবন প্রেস
৬৬, গ্রে স্ট্রীট কলকাতা-৭০০০০৬

সমুদ্রের হাজারো বিস্ময় কি রকম ?

জল, স্থল, বায়ুমণ্ডল নিয়ে পৃথিবী। পৃথিবী জীবধাত্রী, লক্ষ-কোটি জীবের আবাস। বায়ুমণ্ডলে যে সকল জীবের বিচরণ, তাদের বসতভূমি স্থলভাগ। জলমণ্ডল, পৃথিবীর স্থল অংশ থেকে যেমন অনেকগুণ বেশি, এখানকার জীবের সংখ্যা ও বৈচিত্র্যও তেমনি কল্পনাতীত।

স্থলচারী মানুষ আমরা, শক্ত মাটিতে পা ফেলে চলতে স্বস্তি পাই। সমুদ্রের তরঙ্গবিক্ষুব্ধ পৃষ্ঠে শক্ত ভূমি কোথায় ? একদিকে বিশাল বিস্তার, অপর দিকে জলতলে অজানার অস্তিত্ব। মানুষের কৌতুহল জাগায়, শংকারও উদ্রেক করে। আমরা সমুদ্রের রহস্যময় অন্তঃপুরে প্রবেশ করে জানার চেষ্টা করছি সেখানকার জীবজগৎ, জীবন-সংগ্রাম, সৌন্দর্য নিকেতন।

সমুদ্র এক নতুন জগৎ। মানুষের সঙ্গে এর সম্পর্ক চিরন্তন ও অচ্ছেদ্য হলেও আমরা প্রায় একে ভুলেই থাকি। আমরা ভুললেও সাগর ভোলে না; ভুললে স্থলভাগের জীবন নিশ্চিহ্ন হয়ে যেত।

সমুদ্রের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক এবং সামুদ্রিক জীবন ও সম্পদরাশির মোটামুটি পরিচয় তুলে ধরা এই বই-এর লক্ষ্য। স্থলভাগের বিষয় বাংলা সাহিত্যের বেশির ভাগ অঙ্গন জুড়ে রয়েছে, তার পাশে একটু স্থান করে নিয়ে রহস্যময় সমুদ্র এবং সেখানকার বিচিত্র সব জীবজন্তুর প্রতি আমরা কিশোরদের কৌতুহল জাগাতে চাই, এছাড়া আর একটি উদ্দেশ্য আছে ঃ ভাবতের পক্ষে সমুদ্রের সামরিক ও অর্থনৈতিক গুরুত্বের প্রতি তরুণদের দৃষ্টি আকর্ষণ। ভারতের তিন দিক সাগর দিয়ে ঘেরা, সুবিস্তীর্ণ উপকূল। নিজস্ব দরিয়ায় তেল ও অন্যান্য সম্পদের প্রাচুর্য। ইদানিং সমুদ্রের তলদেশ থেকে ধাতুপিন্ড আহরণে ভারত সচেষ্ট। দক্ষিণ মেরুতে বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণ-কেন্দ্র স্থাপন করে এবং সমুদ্র উন্নয়ন-বিভাগ গঠন করে সমুদ্র চর্চায় উদ্যোগী হয়েছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে সমুদ্র ও সমুদ্রজীবন সম্পর্কিত তথ্য প্রকাশ প্রাসঙ্গিক হবে বলেই আমাদের বিশ্বাস।

ভারত সরকারের সমুদ্র উন্নয়ন বিভাগের (Department of Ocean Development) সচিব ডঃ এস· জেড·কাশিম (Dr. S. Z. Qasim) আমাদের অনুরোধে সাড়া দিয়ে 'দক্ষিণ গঙ্গোত্রী' অভিযান বিষয়ক তথ্য পুস্তিকা ও চিত্র সরবরাহ করে আমাদের উৎসাহিত ও আমাদের প্রচেষ্টাকে অভিনন্দিত করেছেন। আমরা জন্য তাঁর কাছে আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ।

পরিশেষে, মডেল পাবলিশিং হাউসের নবীন প্রকাশক শ্রীজয়দেব ঘোষকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ এইজন্য যে, গতানুগতিক সাহিত্য পুস্তক প্রকাশের কিঞ্চিৎ ব্যতিক্রম ঘটিয়ে তিনি কিশোরমনের পুষ্টিসাধনের জন্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের নতুন নতুন পথে লেখকদের উৎসাহিত করছেন। এ প্রচেষ্টা বাংলা সাহিত্যে শুধু বৈচিত্র্যই আনবে না, বিদ্যার্থী ও কৌতুহলী মানুষের জ্ঞানবিস্তারেও সহায়ক হবে।

নারায়ণ চন্দ্র চন্দ

সমুদ্রের প্রতি

আমি পৃথিবীর শিশু বসে আছি তব উপকূলে,
শুনিতেছি ধ্বনি তব, ভাবিতেছি, বুঝা যায় যেন
কিছু কিছু মর্ম তার—বোবার ইঙ্গিতভাষা-হেন
আত্মীয়ের কাছে।

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সূচীপত্র

অক্টোপাস

প্রবালগুচ্ছ

গভীর সমুদ্রের মাছ

ব্যারাকুডা

ওয়ালরাস

রীফ শার্ক

পিরান্‌হা

স্কেট
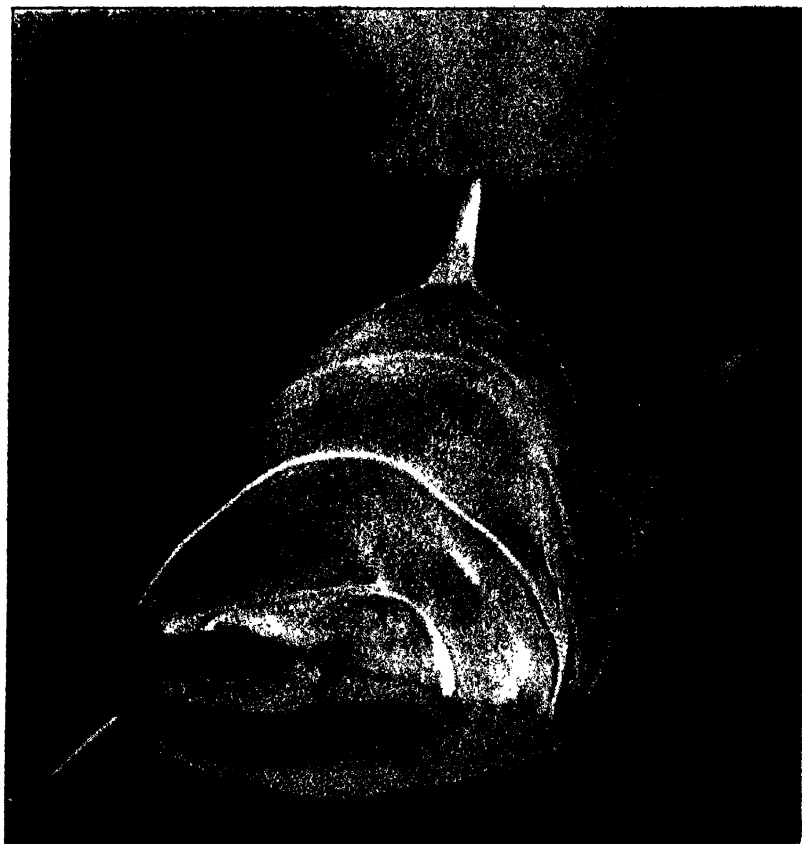
টাইগার শার্ক ।

ডলফিন

কোরাল রীফ

স্পঞ্জ

সাগর ঘোড়া
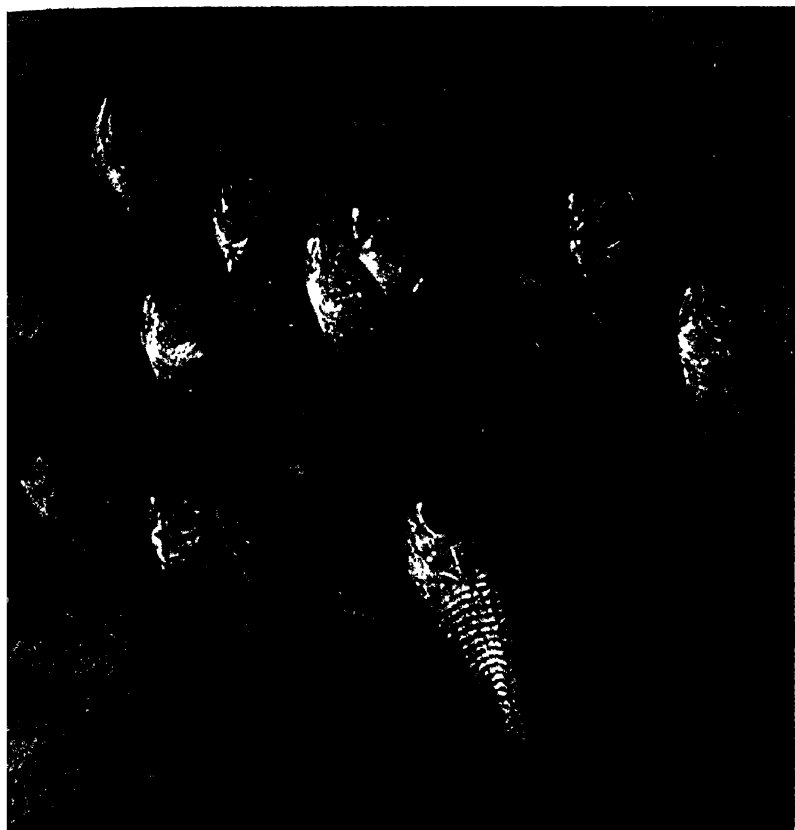
সমুদ্রের কথা

* সমুদ্র কাকে বলে ?

পরস্পর সংযুক্ত যে বিশাল লবণাক্ত জলরাশি, ভূমণ্ডলের শতকরা ৭০·৮ স্থান জুড়ে রয়েছে, তাকে বলা হয় সমুদ্র বা বিশ্বসমুদ্র। মহাদেশগুলোর মধ্যবর্তী এর কথঞ্চিৎ ছোট অংশ মহাসাগর এবং তার চেয়ে ছোট জলভাগ হল সাগর ও উপসাগর। পৃথিবীর স্থল ও জল অংশের আয়তনের অনুপাতে জলভাগ এত বেশী যে পৃথিবীকে ভূমণ্ডল না বলে 'জলমণ্ডল' বা 'সাগরিকা' বললেই সঙ্গত হত।
জল স্থলের পরিমাণ সম্বন্ধে বিজ্ঞানীর এই হিসাব সাধারণ মানুষের বোধগম্য হয় না। কারণ, মানুষ স্থলচর জীব, ভূমির সঙ্গেই তার পরিচয় নিবিড়। দিগন্তপ্রসারী প্রান্তরে দাঁড়িয়ে যখন কেউ দিক্-চক্ররেখায় ছায়াঘন গ্রামের ওপারে সূর্যাস্ত দেখে কিংবা ট্রেনে করে দেশের এক প্রান্ত থেকে দূরান্তরে যেতে মাঠের পর মাঠ পার হয়ে যায়, কিংবা তার চোখে পড়ে অবিচ্ছিন্ন নীলাভ পর্বতমালা, তার মনে হয় ভূমির বোধ হয় শেষ নেই। কিন্তু সাগরকূলে দাঁড়িয়ে যখন কেবল জল ছাড়া আর কিছুই দেখা যায় না, মনে হয় দিগন্তে আকাশ আর সমুদ্র মিশে একাকার হয়ে গেছে, জলের বিশালতা সম্বন্ধে তখন তার ধারণা গড়ে ওঠে। পুরীর সমুদ্রতট থেকে কেউ যদি নৌকা নিয়ে সোজা দক্ষিণ দিকে চলতে পারত তবে ভারত মহাসাগরের সাড়ে ছয় হাজার মাইল পার হয়ে সে দক্ষিণমেরু দেশে গিয়ে পেঁাছত, পথে কোথাও স্থলভাগ তার চোখে পড়ত না!

* মহাসাগর কয়টি ?

মধ্যযুগের আরবদেশের ভৌগলিকরা 'সপ্ত সমুদ্রের' কথা তাঁদের পুঁথিপত্রে উল্লেখ করেছিলেন। ষোড়শ শতকের তুর্কি সমুদ্রবিশেষজ্ঞ পিরি রেইস সাতটি সাগরের নাম করেছেন। এগুলো হল—(১) দক্ষিণ চীন সাগর

(২) বঙ্গোপসাগর (৩) আরব সাগর (৪) পারস্য উপসাগর (৫) লোহিত সাগর (৬) ভূমধ্য সাগর এবং (৭) আটলাণ্টিক মহাসাগর। মুসলিমদের হাতে কনস্টান-টিনোপলের পতনের (১৪৫৩ খৃঃ) আগে এই সাগরগুলোর সঙ্গে মুসলমান বণিকদের পরিচয় ছিল। স্পষ্টতই দেখা যায়, আটলাণ্টিকের সামান্য অংশ ছাড়া অন্যান্য মহাসাগর সেকালের মানুষের কাছে ছিল অজ্ঞাত। কলম্বাসের আটলাণ্টিক পাড়ি দিয়ে আমেরিকা আবিষ্কার ও ম্যাগেলানের প্রশান্ত মহাসাগর পার হয়ে ভূ-প্রদক্ষিণের ফলে জলরাশির বিশালতা সম্বন্ধে মানুষের জ্ঞানলাভ সম্ভব হয়েছে। দেখা গেছে, মধ্যযুগের 'সপ্ত সমুদ্র' আসলে মহাসাগরের অংশ মাত্র। ভৌগোলিক জ্ঞানের নতুন আলোকে মহাসাগর কয়টি এবং তাদের নামকরণই বা কি হবে, এ নিয়ে বিভিন্ন বিশেষজ্ঞের মধ্যে মতপার্থক্য থাকলেও সাতটি নাম নির্দিষ্ট হয়েছে। এই নাম, এদের আয়তন ও গড় গভীরতা দেখান হচ্ছে ঃ

মহাসাগর পরিচিতি

মহাসাগরের নাম	আয়তন (বর্গমাইল)	গড় গভীরতা (ফুট)
১। উত্তরমেরু মহাসাগর	৫৪,২৭,০০০	৫০১০
২। উত্তর আটলাণ্টিক মহাসাগর	১,৭৬,৪৬,০০০	১০,৭৫০
৩। দক্ষিণ আটলাণ্টিক মহাসাগর	১,৪০,৯৮,০০০	১৩,৪২০
৪। উত্তর প্রশান্ত মহাসাগর	৩,১৬,৩৯,০০০	১৪,০৫০
৫। দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগর	৩,২৩,৬১,০০০	১২,৬৬০
৬। ভারত মহাসাগর	২,৮৪,০০,০০০	১৩,০০২
৭। দক্ষিণ মেরু মহাসাগর	১,২৪ ৫১.০০০	১২,২৪০

বিষুবরেখা আটলাণ্টিক ও প্রশান্ত মহাসাগরের উত্তর দক্ষিণ দুই অংশের সীমা বলে ধরা হয়েছে। সমুদ্রের মোট আয়তন হল ১৪,২০,২২,০০০ বর্গমাইল, জল ৩২,৮৭,৫০,০০০ কিউবিক মাইল এবং গড় গভীরতা ১৪,৪৫০ ফুট অর্থাৎ ২ মাইলের বেশি।

* সমুদ্রতল কেমন ?

প্রান্তরের মধ্যে দাঁড়ালে আমরা ভূমি কেমন সমতল তা দেখতে পাই, পাহাড়ের উঁচুনিচু অংশ ও উপত্যকার গভীরতা চোখে পড়ে কিন্তু সমুদ্রতীরে দাঁড়িয়ে এর তলদেশ সমতল কি উঁচুনিচু কিছুই বোঝা যায় না। তবে সাগরবিজ্ঞানীর চার্টে সমুদ্রতলের যে রেখাচিত্র ফুটে ওঠে, তা থেকে দেখা যায় জলের তলায় ভূমির ওপরকার মতই পাহাড় পর্বত, উপত্যকা ও গভীর খাত বিদ্যমান।

ইলেকট্রনিক বিজ্ঞানের উন্নতির ফলে বর্তমান শতাব্দীতে জলের মধ্যে শব্দ পাঠিয়ে ফিরে-আসা প্রতিধ্বনির সময় হিসাব করে সমুদ্রের গভীরতা সঠিকভাবে মাপার ব্যবস্থা হয়েছে 'echo-sounding'-এর যন্ত্রপাতির মাধ্যমে। এর সাহায্যে জলের নিচেকার যে নকশা তৈরি করা হয়েছে তাতে দেখা যায়, কোথাও উঁচু পাহাড় ঢেউ-এর তলায় ডুব দিয়ে রয়েছে, কোথাও রয়েছে নিভে-যাওয়া আগ্নেয়গিরি, কোথাও রয়েছে দীর্ঘ টানা নালাখাত। সব খাতের গভীরতা সমান নয়। ১৯৩৬ সালের ২৩ জানুয়ারি প্রশান্ত মহাসাগরের ম্যারিয়ানা ট্রেঞ্চে ব্যাথিস্কোপ 'ট্রেয়েস্ট' নামিয়ে দিয়ে সমুদ্রের গভীরতম স্থান মানুষের নাগালের মধ্যে আনা হয়। ম্যারিয়ানা ট্রেঞ্চের এই সর্বাধিক গভীর স্থান Challenger Deep সাগরপৃষ্ঠ থেকে ৩৬,১৯৮ ফুট নিচে; তার মানে, পৃথিবীর সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গ (২৯,০২৮ ফুট) মাউণ্ট এভারেস্ট ম্যারিয়ানা ট্রেঞ্চে নামিয়ে দিলে এটি ত সম্পূর্ণ ডুবে যাবেই, শৃঙ্গের মাথার ওপর থাকবে ১ মাইলেরও বেশি জল!

- সাগর হল কেমন করে?

ভূগোলক যদি সর্বত্র একই রকম সমতল হত তবে পৃথিবীর চারদিক ঘিরে দেড় মাইলের বেশি গভীর জল বিরাজ করত। তাই কৌতূহলী মানুষের মনে প্রশ্ন উঠবে—তবে ভূমি ও জল পৃথক হয়ে মহাদেশ আর সমুদ্র সৃষ্টি হল কেন? সৌরজগতে পৃথিবীই বোধ হয় একমাত্র গ্রহ যাতে জলভাগ ও স্থলভাগ পাশাপাশি রয়েছে। এখানে এরূপ ব্যতিক্রমের কারণই বা কি? পৃথিবীতে সমুদ্র সৃষ্টি হয়েছে কেন তা বোঝার জন্য তিনটি প্রশ্ন আলোচনা করতে হবে ঃ

এক, সমুদ্রখাত সৃষ্টি হল কেমন করে? এর উত্তরে বলা যায়, যে সকল শিলা পৃথিবীর বহিঃত্বক সৃষ্টি করেছে তাদের ধর্ম (properties) বা রাসায়নিক উপাদান এক রকম নয়। ভূ-পৃষ্ঠের অনেক স্থান জুড়ে রয়েছে যে শিলা তার রঙ হালকা, ওজনেও তা অপেক্ষাকৃত লঘু। এগুলো গ্র্যানাইট শিলা। এদের চেয়ে আরো বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে রয়েছে যে শিলা, তার রঙ গ্র্যানাইটের চেয়ে গাঢ়, ওজনও বেশি। এগুলি ব্যাসাল্ট শিলা। ভূমিকম্পের তরঙ্গ গতি পরীক্ষা করে বোঝা গেছে, ভূ-স্তরের কয়েকশো মাইল নিচে ভূকেন্দ্র প্রচণ্ড উত্তাপে তরল অবস্থায় রয়েছে। পৃথিবীর ওপরের স্তরের প্রায় ৫০ মাইল পুরু শিলা বস্তুত ভূ-মধ্যস্থ তরল উপাদানের ওপর ভাসছে। গ্র্যানাইট প্রস্তর ব্যাসাল্টের চেয়ে হালকা হওয়ায় দুটি শিলা অঞ্চল পাশাপাশি থাকলেও হালকাটি উঁচু হয়ে ভাসে, ভারিটি ভাসে নিচু হয়ে, যেমন একই আকারের কাঠের খণ্ড ও কর্ক তরল পদার্থে ফেললে কর্ক বেশি হালকা হওয়ায় কাঠের চেয়ে উঁচু

হয়ে ভাসবে। এইভাবে গ্র্যানাইট অঞ্চল সৃষ্টি করল মহাদেশ এবং ব্যাসাল্ট অঞ্চল নিচু হওয়ার দরুন সমুদ্রখাতে পরিণত হল। পৃথিবীর ভূত্বকের শিলাপ্রস্তর যদি সমজাতীয় ও সমগুণভাবাপন্ন হত তবে পৃথিবীর উপরিভাগে থাকত এক মাইলের বেশি এক গভীর সমুদ্র।
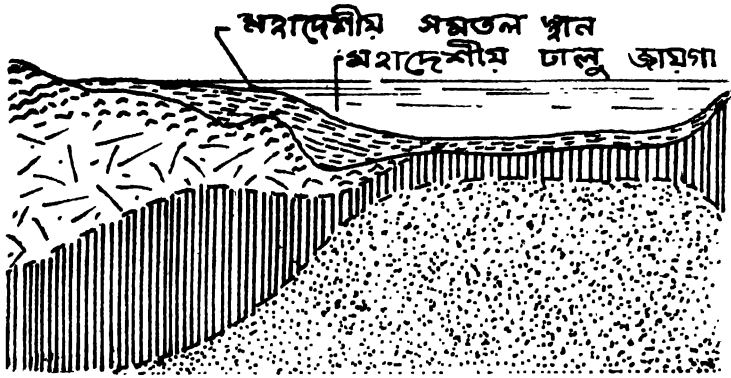
সমুদ্রতল

দুই, সমুদ্রখাতে জল রয়েছে কেন? সমুদ্রখাত কিভাবে সৃষ্টি হয়েছে তা বোঝা গেলেও সমুদ্র কেন হল তা জানতে হবে, কারণ এ খাত শুকনোও ত থাকতে পারত, যেমন রয়েছে চাঁদের পিঠে।

* সমুদ্রে জল থাকার কারণ তিন

প্রথম, গলিত শিলা, যেমন লাভা, শুকনো ও ঠাণ্ডা অবস্থার চেয়ে তরল অবস্থায় অনেক বেশি জল ধরে রাখে। তাই ভূতাত্ত্বিক যুগে ভূস্তর যখন কঠিন হয়ে আসে, তরল লাভা থেকে জলীয় বাষ্প বায়ুমণ্ডলে উঠে যায়। আগ্নেয়গিরি থেকে উৎক্ষিপ্ত গ্যাস পরীক্ষা করে দেখা যায়, এখনও এই প্রক্রিয়া চলছে। চাঁদের ওপর এই ধরণের ক্রিয়া নিশ্চয়ই চলেছিল কিন্তু সেখানে সমুদ্র নেই। এর কারণ, পৃথিবী অপেক্ষা চাঁদের মাধ্যাকর্ষণ শক্তি অনেক কম। পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে যে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র গ্যাসকণিকা রয়েছে তার ঊর্ধ্বগতি যদি সেকেণ্ডে ৭ মাইলের বেশি হয় তবেই তা ভূ-মাধ্যাকর্ষণের পিছুটান কাটিয়ে মহাশূন্যে চলে যেতে পারে। জলের স্ফুটনাংকে অর্থাৎ ২১২° ফারেনহাইট তাপে জলীয়বাষ্পের অণু (মলিকিউল)-র গড় গতি হয় সেকেণ্ডে 0'8 মাইল, এই একই রকম উত্তাপে অণুর পক্ষে এর ১৭½ গুণ বেশি গতি অর্জন

নেহাৎ অসম্ভব। কাজেই ঊর্ধ্বস্তরে উচ্চ তাপমাত্রা থাকা সত্ত্বেও ভূপৃষ্ঠের জল জলীয় অণু হারায় না। চাঁদের যে পিঠ সূর্যের দিকে থাকে, সেখানে তাপমাত্রা নিয়মিত ২১২° ফারেনহাইটের বেশি, নিষ্ক্রমণ বেগ (**escape velocity**) প্রতি সেকেণ্ডে মাত্র ১'৪ মাইল। ২১২° ডিগ্রি তাপে প্রতি ৬০ হাজার জল-অণুর একটি এই নিষ্ক্রমণ বেগ লাভ করে শূন্যে উঠে যায়। এইভাবে জলের অণু এবং অন্যান্য হালকা গ্যাস হারানোর ফলে চাঁদ তার পৃষ্ঠে জল ধরে রাখতে পারে না। ফলে আমাদের পৃথিবীতে যে বায়ুমন্ডল ও বারিমন্ডল রয়েছে, চন্দ্রে তার অভাব ঘটেছে।

পৃথিবীর সমুদ্রে জল থাকার দ্বিতীয় কারণ হল মাধ্যাকর্ষণ শক্তি, যা আমাদের শ্বাস-প্রশ্বাস কাজের উপযোগী বায়ুমন্ডলও ধরে রেখেছে।

তৃতীয় কারণ, ভূ-পৃষ্ঠে চাপ-তাপের সম্পর্ক (**pressure temperature relationship**) এমন, যাতে জল প্রধানত তরল অবস্থায় থাকে। এটা ধরে নিতে বাধা নেই, বায়ুমন্ডল এমন উত্তপ্ত হতে পারে যাতে সব জল বাষ্পে পরিণত হবে। এরূপ হতে হলে অন্ততঃ ৭০৫° ফারেনহাইট তাপ প্রয়োজন হবে, তখন বায়ুর চাপ হবে প্রতি বর্গইঞ্চির ওপর ৫,৫০০ পাউন্ড। [সমুদ্র সমতলে তাপমাত্রা ৩২° এবং বায়ুর চাপ প্রতি বর্গইঞ্চির ওপর ১৪'৭ পাউন্ড]। পক্ষান্তরে, সমুদ্র সমতলে তাপমাত্রা যদি এখনকার মত ৩২° ফারেনহাইটের বেশি না হয়, সমুদ্রখাত কঠিন বরফে ঢাকা পড়ে যাবে। যেহেতু তখনও বায়ুমন্ডলে জলীয় বাষ্প থাকবে এবং তুষারপাতও হতে পারবে, তখন বর্তমানের নদীনালার জলনিকাশী ব্যবস্থার জায়গায় দেখা দিতে পারে হিমবাহ প্রবাহ। কিন্তু তাপমাত্রার এরূপ চরম অবস্থা বিদ্যমান নেই বলে পৃথিবীতে আমরা বর্তমান আকারে সমুদ্র পেয়েছি।

* সমুদ্রের জল লবণাক্ত কেন ?

২০০ কোটি বছর ধরে ভূত্বকের আগ্নেয়শিলা পচনের ফলে সমুদ্রের জল লবণাক্ত হয়েছে। দ্রবণীয় বস্তু সমুদ্র জলে রয়ে যায়, অদ্রবণীয় উপাদানসমূহ অধঃক্ষেপণের ফলে গঠিত হয়েছে পাললিক শিলা (**sedimentary rock**) এবং সমুদ্র কল্ক (**Ocean sediments**)। আগ্নেয়শিলায় যে সকল উপাদান থাকে, যা যা দ্রবণীয় ও কর্দমের মধ্যে শোষিত হয় না কিংবা জৈবিক কর্ম-প্রক্রিয়ায় নষ্ট হয় না সে সবই সমুদ্রে পাওয়া যায়। মহাদেশ থেকে যে সকল নদী সাগরে এসে পড়ছে তার সঙ্গে ভাসমান পদার্থ ও শিলার দ্রবীভূত লবণ সমুদ্রজলে এসে মিশছে। এই ক্ষয়িত বস্তুর অধিকাংশই পূর্ব গঠিত পাললিক শিলা থেকে প্রাপ্ত। এইভাবে সমপরিমাণে নতুন কল্ক সাগর সঞ্চিত

হচ্ছে। ফলে লবণের সংযুক্তি (composition) বিষয়ে সাগর লক্ষ লক্ষ বছর ধরে অবিচলিত (steady) রয়েছে। জলের সাধারণ লবণত্ব ক্রম বেশি হচ্ছে না। কিন্তু কোন হ্রদ থেকে উৎপন্ন নদীর সাগরে পড়া ভূস্তরের পরিবর্তনের ফলে যদি বন্ধ হয়ে যায় কিছুকাল পরে সেই হ্রদের জল লবণাক্ত হয়ে পড়ে। উদাহরণ স্বরূপ 'উটার গ্রেট সল্টলেক'-এর কথা বলা যায়! ৪,২০০ ফুট উঁচুতে অবস্থিত এই হ্রদ কখনই সাগরের অংশ ছিল না। এতে যে নদী এসে পড়ে তা বাষ্পীভবনের ফলে পাড় ছাপিয়ে বাইরে যেতে পারে না এবং আশপাশের পাহাড় থেকে আনীত লবণ হ্রদেই রয়ে যায়। ফলে বদ্ধ হ্রদের জল সাগরজলের চেয়ে ৮/১০ গুণ বেশি লবণাক্ত হয়ে পড়ে।
গড়ে ১000 কেজি সমুদ্রজলে লবণ থাকে ৩৫ কেজি।

* সমুদ্রের প্রকৃতি কেমন?

সমুদ্রের স্বরূপ-প্রকৃতি বিচিত্র। ইহা বিশাল, চঞ্চল এবং আকারবিহীন। ইহা রহস্যময়। এ রহস্য শুধু এর আকস্মিক রুদ্ররূপ ধারণে নয়, মানুষের চোখের আড়ালে সমুদ্রের গভীরে কী রয়েছে, কি রকম অজানা বস্তু লুক্কায়িত আছে সে সম্বন্ধে মানুষের কৌতূহল ও বিস্ময়ের অন্ত নেই।
সমুদ্র-প্রকৃতির একটি দিক এর অবিচলতা। কোটি কোটি বছর ধরে সমুদ্র একই অবস্থায় রয়েছে। সারা ভূতাত্ত্বিক যুগে সাগর কখনো মহাদেশের ওপর এগিয়ে এসেছে ও পিছিয়ে গেছে কিন্তু কখনই সমগ্র ভূভাগ কিংবা বেশির ভাগ অংশ প্লাবিত করেনি। কিসের কারণে জল-স্থলের এই মিত্রতুল্য সহাবস্থান বজায় আছে তা অজ্ঞাত। এমন হয়ত আশংকা করা যেত যে, ভূ-অভ্যন্তরস্থ জল বেরিয়ে আসবে এবং তার ফলে সমুদ্রের আয়তন বাড়তে থাকবে কিংবা জল হয়ত হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন গ্যাসে পরিণত হয়ে বায়ুমণ্ডল পাড়ি দিয়ে মহাকাশ যাত্রা করবে, যার ফলে ভূপৃষ্ঠে পড়ে থাকবে শুধু শুকনো সাগর অববাহিকা। কিন্তু এমন ঘটে না। ভূপৃষ্ঠে যোগবিয়োগ গুণভাগের সমীকরণ করে সমুদ্র একই স্বরূপে বিদ্যমান রয়েছে।
সমুদ্র অবিচল থাকলেও মহাসাগরের তলদেশের শিলাদেহে পরিবর্তন ঘটে চলেছে, যদিও তা অতি ধীর গতিতে। বিজ্ঞানীরা বলেন, গত ১০ কোটি বছর ধরে মহাসাগরের মাঝামাঝিকার শৈলশিরা বাইরের দিকে চাপ দিয়ে ধীরে ধীরে বেড়ে ওঠার ফলে মহাদেশের অবস্থানের পরিবর্তন ঘটছে। খুব সম্ভব ১৫ কোটি বছর আগে আটলান্টিক মহাসাগরের অস্তিত্ব ছিল না, দক্ষিণ আমেরিকা ছিল আফ্রিকার পশ্চিম অংশের সঙ্গে যুক্ত। ক্রমে দুটি মহাদেশ পৃথক হয়ে পড়েছে, মাঝের জলরাশি আটলান্টিক মহাসাগর। ভূতত্ত্বের হিসাবে

আধুনিককালে, ২০ কোটি বছর আগেও আরবদেশ আফ্রিকার সঙ্গে সংযুক্ত ছিল। তারপর লোহিত সাগর ও এডেন উপসাগর সৃষ্টি হয়েছে এবং এখন পর্যন্ত এর বিস্তার ঘটে চলেছে। শুধু আফ্রিকা ও দক্ষিণ আমেরিকার মধ্যে নয়, ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকার মধ্যেও মহাসাগরের বিস্তার বৃদ্ধি পাচ্ছে। হিসাবে বলা হয়েছে, এই দুই মহাদেশের মধ্যে সামুদ্রিক দূরত্ব বাড়ছে প্রতি ১০০ বছরে ১ ফুট করে।
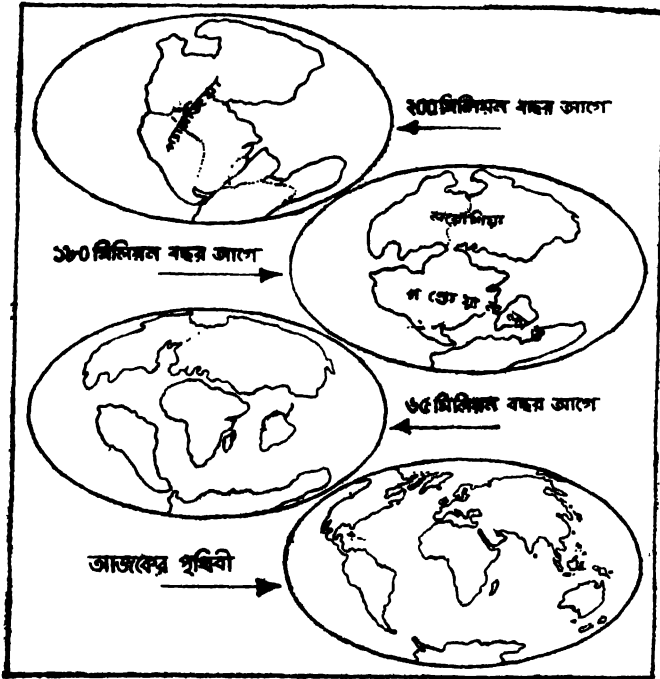
মহাদেশ সঞ্চরণ : মহাদেশগুলোর গঠন পরিবর্তনের ফল চিহ্নিত হয়েছে

* সমুদ্রের উপযোগিতা কি ?

সমুদ্রের সঙ্গে মানুষের জীবন ও কর্ম গভীরভাবে যুক্ত। সমুদ্রেই প্রথম প্রাণের বিকাশ তারপর তা বহুরূপে এবং স্থাবর জঙ্গম ভূচর খেচর পর্যায়ে জলে স্থলে বিস্তার লাভ করেছে। সমুদ্র আদিপ্রাণের লালন ক্ষেত্র।

সমুদ্র উত্তাপ ও জল সঞ্চয় করে রাখে এবং আবহাওয়া ও জলবায়ু প্রভাবিত করে। প্রতিদিন সারা সমুদ্র-পৃষ্ঠ থেকে ১ মিটার জল সূর্যকিরণে বাষ্প

হয়ে উঠে যায় এবং তা বৃষ্টি, নদীজল ও হিমশৈল আকারে আবার সাগরে ফিরে আসে। সমুদ্র সূর্যতাপে উত্তপ্ত হয় ধীরে এবং তাপ ধরে রাখে ভূমি অপেক্ষা অধিক সময় পর্যন্ত। সমুদ্র তাই শুধু মেঘের মাধ্যমে সুপেয় জলের যোগানই দেয় না, জলবায়ু নিয়ন্ত্রণেও বিশেষ ভূমিকা পালন করে।

সমুদ্র মানব খাদ্যের এক বিরাট ভাণ্ডার, বিশেষ করে জৈব প্রোটিন ও চর্বি সরবরাহ ব্যাপারে। সমুদ্রজ প্রাণী ও উদ্ভিদ থেকে শুধু মূল্যবান রত্ন নয়, রঞ্জক পদার্থ, জৈবসার, আঠা প্রভৃতি বহু সাধারণ প্রয়োজনের জিনিসও মেলে। সাগর জল থেকে লবণ ও রাসায়নিক পদার্থ নিষ্কাশন করা হয়, মহীসোপান থেকে নির্মাণকার্যে ব্যবহারযোগ্য প্রস্তর সংগ্রহ করা হয়। অগভীর সমুদ্র অঞ্চল থেকে তৈল, প্রাকৃতিক গ্যাস প্রভৃতি বহুবিধ দ্রব্য আহরণ করা হয়ে থাকে।

রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যাপারেও সমুদ্র মানুষের চিন্তা ও কর্মকে প্রভাবিত করেছে। সাগরবেষ্টিত দেশ বিদেশীর আক্রমণ হতে অনেকাংশে নিরাপদ। আমেরিকা ও ইউরোপের মধ্যে সমুদ্র থাকার ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও পর্তুগীজঅধিকৃত অঞ্চলের স্বাধীনতা লাভে সহায়তা হয়েছিল। পূর্বে পশ্চিমে মহাসাগর দ্বারা বেষ্টিত থাকায় যুক্তরাষ্ট্র মনরো-নীতি (**Monroe Doctrine**) প্রয়োগে সক্ষম হয়।

এক সময়ে সমুদ্র দূরবর্তী দেশের সঙ্গে যোগাযোগ ও ব্যবসা বাণিজ্যের পক্ষে অন্তরায় ছিল বটে কিন্তু যন্ত্রযুগে সমুদ্রের দূরত্ব বিশেষ প্রতিবন্ধক নয়। ফলে স্থলপথ অপেক্ষা জলপথেই বাণিজ্য প্রসার সম্ভব হয়েছে।

সমুদ্র একদিকে যেমন অগণিত জীবের বাসভূমি ও মানুষের সম্পদের আকর অন্যদিকে ভূমিচারী মানুষের বহুবিধ আবর্জনা এমন কি তেজস্ক্রিয় বর্জ্য পদার্থও সমুদ্রে নিক্ষেপ করা হয়। শুনতে অদ্ভুত মনে হলেও বলা চলে, সমুদ্র একাধারে মানুষের জীবনের ধারক, খাদ্য-ভাণ্ডার ও আবর্জনাকুণ্ড। সমুদ্রের বিশালতার জন্যই নানা প্রকার দূষিত পদার্থ ধারণ করেও সাগর এখনও 'নীলকন্ঠ' হয়ে আছে, গরলে পরিপূর্ণ হয়ে ফেনিয়ে ওঠেনি।

* সমুদ্রের রঙ সবুজ-নীল কেন ?

সমুদ্রজলের রঙ কোথাও ঘন নীল, কোথাও উজ্জ্বল সবুজ, কোথাও এ দুয়ের মাঝামাঝি। তবে বাহির সমুদ্রে নীল রঙই চোখে পড়ে, বিশেষ করে উষ্ণ ও নাতিশীতোষ্ণ মন্ডলে। এর কারণ, আকাশে বায়ুর অণুর মত জলের অণু সূর্যকিরণে নীল রঙ ছড়িয়ে দেয়। এজন্য পরিস্রুত জল দেখতে ঈষৎ নীলাভ। উপকূলভাগে নীল আলোর সঙ্গে হলুদ রঙের মিশ্রণের ফলে জল সবুজ

দেখায়। উপকূলের সাগরে উদ্ভিদের পচন থেকে যে হলুদ রঙের পদার্থ জলে মেশে, তা সূর্যকিরণের হ্রস্ব তরঙ্গ (নীল রঙ) শুষে নেয়; জল আত্মস্থ করে (absorb) দীর্ঘ তরঙ্গ (লাল রঙ), বর্ণচ্ছটার মধ্যভাগস্থিত সবুজ রঙ রয়ে যায়। এই সবুজ চোখে পড়ে। মধ্যসমুদ্রে, যেখানে উদ্ভিদ পদার্থের কণিকা অতি অল্প বা অনুপস্থিত, সেখানে সমুদ্র দেখায় ঝকঝকে নীল। উপকূলের কাছাকাছি সমুদ্রে জলের সবুজ রঙের কারণ ভূমিজ উদ্ভিজ্জ ও জলজ উদ্ভিজ্জের অবস্থিতি।

* 'সমুদ্রের ঘাস' কি?

খালি চোখে দেখা যায় না, কেবলমাত্র অণুবীক্ষণ যন্ত্রে ধরা পড়ে এমন মিহি জলজ উদ্ভিদ ও প্রাণী প্ল্যাংকটন—বহিঃসমুদ্রে অমিত পরিমাণে বিরাজ করে। ভূমিতে যেমন তৃণ ও ঘাস-ছাওয়া মাঠ তৃণভোজীদের বিচরণক্ষেত্র, প্ল্যাংকটন ক্ষেত্র তেমনি বহু সামুদ্রিক প্রাণীর চারণ অঞ্চল। বিরাট আকারের কতক জাতের তিমি, ওজনে ও দৈর্ঘ্যে স্থলচর হাতির চেয়েও বেশি; হাতির মতই তারা তৃণভোজী। প্ল্যাংকটন এদের প্রধান খাদ্য।

* সমুদ্রস্রোত কি করে হয়?

সমুদ্র সদা চঞ্চল, সমুদ্র জল সদাচলমান। চঞ্চলতা দেখি তরঙ্গে, চলমানতা বোঝা যায় স্রোতে। স্রোত কেন হয়? পাল্টা প্রশ্ন করা যায়, বাতাস কেন প্রবাহিত হয়? ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন দিক থেকে কেন বয় বাতাসের স্রোত? বায়ুস্রোত আর সমুদ্রস্রোত, উভয়েরই কারণ সূর্যের উত্তাপ। উত্তরমেরু থেকে দক্ষিণমেরু সর্বত্র সূর্যকিরণ সমানভাবে পড়ে না, তাই সূর্যতাপের তারতম্যের ফলে বায়ুর গতি পরিবর্তিত হয়। যেদিকে তাপ বেশি, সেখানকার বায়ু হালকা হয়ে উঁচুতে উঠে যাওয়ায় অন্যস্থান থেকে অপেক্ষাকৃত ভারি বাতাস সেদিকে ছোটে। এই চলমান বায়ু গতি পরিবর্তন করে পৃথিবীর দৈনিক আবর্তনের ফলে। বিষুবরেখার উত্তরে বায়ুর গতি ডানদিকে এবং বিষুবরেখার দক্ষিণে তা বাঁদিকে বেঁকে যায়। এই বায়ুর গতি সমুদ্রস্রোতকে তার চলার পথে চালিয়ে নেয়।

পৃথিবীর উষ্ণমণ্ডল সবচেয়ে বেশি সূর্যকিরণ পায় বলে এখানকার সমুদ্রজল উত্তপ্ত হয় বেশি, এখান থেকে জলীয় বাষ্প শূন্যে উঠে যায় অন্য স্থান অপেক্ষা অনেক বেশি পরিমাণে। হিসাব করে দেখা গেছে, সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে দৈনিক ১ মিটার (৩ ফুট) পরিমাণ জল বাষ্প হয়ে যায়। ফলে উষ্ণমণ্ডলের জল অপেক্ষাকৃত উষ্ণ ও লবণাক্ত, কারণ লবণাক্ত জল থেকে কেবল জলই বাষ্পীভূত

হয়, লবণ অংশ থেকে যায় সমুদ্রেই। উষ্ণমণ্ডলের সমুদ্র থেকে উষ্ণ স্রোতের উৎপত্তি। এই স্রোত পৃথিবীর আবর্তনও বায়ু প্রবাহের ফলে গতিশীল হয়ে উত্তর গোলার্ধে ঘড়ির কাঁটার মত এবং দক্ষিণ গোলার্ধে ঘড়ির কাঁটার বিপরীত মুখী—গতি লাভ করে! উষ্ণমণ্ডলের সমুদ্রের বৈশিষ্ট্য হল—উষ্ণ, কম ঘন জলস্রোত তলাকার ভারি ও ঠাণ্ডা জলের ওপর দিয়ে বয়ে চলে। উষ্ণ স্রোতের তাপমাত্রা সর্বত্র সমান থাকে না, না থাকারই কথা। স্রোত উষ্ণমন্ডল থেকে যতই উত্তর ও দক্ষিণ মেরু অঞ্চলের দিকে এগিয়ে যায়, ততই তার তাপের মাত্রা কমতে থাকে।

তাছাড়া উষ্ণমন্ডলেও ওপর-নিচ সর্বত্র জলের তাপমাত্রা এক রকম নয়। উষ্ণ অঞ্চলের সমুদ্র-পৃষ্ঠে তাপ ৩০° ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড ৩০০ ফুট (১০০ মিটার) নিচে ১৫° সেন্টিগ্রেডে দাঁড়ায়। তার নিচে ৩০০০ ফুট (১০০০ মিটার) পর্যন্ত কমতে কমতে তারও নিচে তাপাংক ৫° থেকে ০,৪° সেন্টিগ্রেডে নেমে যায়।

ওদিকে ওপরের স্রোত দক্ষিণ মেরুতে অত্যন্ত ঠান্ডা হয়ে যায়। এই শীতল ভারি জলপুঞ্জ তখন জলে ডুবে পড়ে এবং মহীঢাল বেয়ে সমুদ্রের গভীর খাত অঞ্চলে চলে যায়। সাগরতলে গিয়ে স্রোত কোথাও থেমে থাকে না, কারণ অনবরত ভারি জলে নিচে ডুবে পড়ছে এবং তার ঠেলায় সমুদ্রতলাতেও স্রোতের সৃষ্টি হচ্ছে। এখানেও তার গতির দিক নিয়ন্ত্রিত হয় পৃথিবীর দৈনিক আবর্তন গতির ফলে। দক্ষিণমেরু থেকে ভারি শীতল স্রোত তলদেশ দিয়ে উত্তরমুখে চলতে চলতে বাঁদিকে বেঁকে দক্ষিণ আমেরিকার পূর্ব উপকূল দিয়ে পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে গিয়ে পৌঁছে। এটি হল ডুবো স্রোত। ওপরকার স্রোতে নিরক্ষীয় অঞ্চলের গরম জলের প্রবাহ, তলা দিয়ে বয়ে চলে শীতল স্রোত। ১৯৫৫ সালে বিজ্ঞানী বুস্ট পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখেন, দক্ষিণ আমেরিকার আটলান্টিক উপকূল বরাবর ১০ হাজার ফুট তলা দিয়ে চলছে দক্ষিণমুখী শীতল স্রোত, গতিবেগ ঘন্টার ০.২৮ মাইল কিন্তু আরো নিচে সাড়ে ১১ হাজারের ফুট ও তারও বেশি গভীরে বয়ে চলেছে বিপরীতমুখী অর্থাৎ উত্তর-মুখী স্রোত, যার গতিবেগ ঘন্টায় ০.৩৫ মাইল। সমুদ্রের তলাকার ভূমির ওপর দিয়ে প্রবহমান স্রোতের চিহ্ন ধরা পড়েছে তলদেশের ফটোগ্রাফে। গভীর সমুদ্রের ফটোগ্রাফিতে ভারত মহাসাগরের পশ্চিমাংশে ১,৭৫৬ ফ্যাদম অর্থাৎ ১০,৫৩৭ ফুট এলাকায় যে ছবি উঠেছে তাতে সাগর বিছানার ওপর বালুকার উঁচুনিচু ছোট ছোট ঢেউ-এর সারি দেখে স্পষ্ট বোঝা যায়, সাগর স্রোত এই কারুকর্মের শিল্পী।

সমুদ্রপৃষ্ঠের ওপরকার সব স্রোত উষ্ণ নয়, শীতল উষ্ণ দুই রকম স্রোতই রয়েছে। গরম হাল্কা জলের স্রোতের পাশাপাশি শীতল স্রোত চলছে। এদের

গতি নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে একই নিয়মে—বায়ুবেগ, পৃথিবীর আহ্নিক গতি আর স্থলভাগের অবস্থান দ্বারা। গতিপথে স্থলের বাধা পেলে স্রোতকে তা কাটিয়ে যেতে হয়। উত্তর গোলার্ধের প্রধান উষ্ণ স্রোত জাপানের পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া কুরোশিও, ব্রিটেনের উপকূল ঘেঁষে প্রবহমান উপসাগরীয় স্রোত। প্রধান শীতল জলের প্রবাহ গ্রীণল্যান্ড স্রোত, হামবোল্ড স্রোত, কেপ হর্ন স্রোত প্রভৃতি। সাগর পিঠে সমান্তরাল (**horizontal**) বা ভেসে ভেসে চলা ছাড়া স্রোতের আর একটি বিশেষ গতি আছে—ওপর-নিচ (**vertical**)। দক্ষিণ মেরুর কাছাকাছি গিয়ে উষ্ণস্রোত উষ্ণতা হারিয়ে বেশি শীতল ও ভারি হয়ে পড়ার ফলে তার গতি হয় নিম্নমুখী কিন্তু ঊর্ধ্বমুখী হয় কোথায়, কিভাবে ?

সাগর-পৃষ্ঠের স্রোত (**surface current**) যখন চলার পথে কোন ভূখণ্ডে বাধা পায়, জল সেখানে উপকূলে আছড়ে পড়ে। তারপর তার গতিপথ কিছুটা বেঁকে যায়। কিন্তু সমুদ্রের তলা দিয়ে প্রবাহিত এইরূপ বাধা পেলে তা মহী ঢাল বেয়ে ওপরের দিকে উঠে আসে, যেন নিচের জল উথলে ওঠে ওপর পানে। ৬00 থেকে ১000 ফুট নিচেকার এই রকম ঊর্ধ্বমুখী স্রোত দেখা যায় গ্রীষ্মকালে উত্তর ক্যালিফোর্নিয়া উপকূলে। মরোক্কো, পেরু ও দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকার উপকূলে শীতল স্রোতোধারা তলা থেকে ওপরে উঠে আসে। এইভাবে নিচের জল আপনা-আপনি ওপরে উঠে আসাকে বলা হয় 'আপ-ওয়েলিং' বা তলজোয়ারি।

সমুদ্রস্রোতের পুরো ব্যাপারটা কি রকম দাঁড়াল ? কল্পনায় যদি উষ্ণস্রোতকে লাল ও শীতল স্রোতকে সাদা সুতো মনে করি তবে সমুদ্রপৃষ্ঠে স্রোতের আঁকা-বাঁকা রেখাকে ভাবা যায় লাল আর সাদা সুতোর নকশা ! সমুদ্রটা যেন এক বিরাট নীলকাপড়ের কাঁথা, সূর্যমামার ভাগ্নে-ভাগ্নী, পবন আর কিরণ লাল ও সাদা সুতো পরানো সূচ দিয়ে ফোঁড় দিয়ে চলেছে। এ ফোঁড় শুধু ওপরে ওপরে নয়, কখনো কখনো নিচে নেমে দূরে গিয়ে জেগে উঠছে। কতকাল আগে যে বুনানি শুরু হয়েছে, এখনো তা সমানে চলেছে। এদের সঙ্গে সমানতালে পাক খেয়ে চলেছে পৃথিবীটা, যার ওপর পাতা রয়েছে নীল সাগরের আস্তরণ। নিয়মিত একই পদ্ধতিতে পাক খাওয়ার ফলে স্রোতের লাল-সাদার নকশা এলোমেলো হয়ে জট পাকিয়ে যায় না কখনো।

* সমুদ্রস্রোতের ফল কি ?

রামায়ণে সমুদ্রমন্থনের কথা আছে। বাসুকি নাগ হয়েছিলেন মন্থন রজ্জু, মৈনাক পর্বত মন্থন দণ্ড। দেবতা ও অসুরদের টানে সমুদ্রজলে আলোড়ন

সৃষ্টি হল। সাগর থেকে উঠল নানা মূল্যবান সম্পদ। সমুদ্রমন্থন মনে হয় সমুদ্রস্রোতের রূপক কাহিনী। সাগরস্রোত বিরাট অজগরের মতই এঁকে বেঁকে সারা সমুদ্রে পরিব্যাপ্ত, কোথাও কুণ্ডলী পাকিয়ে ঘূর্ণি সৃষ্টি করেছে, কোথাও সমুদ্রের এক স্থানে ডুব দিয়ে তলদেশ দিয়ে চলতে চলতে বহু দূরে গিয়ে হুস করে উঠে পড়ছে। মৈনাক সাগরজলে ভাসমান নয়, সমুদ্রতলে যে ছোট বড় পাহাড়-পর্বত, খাত উপত্যকা রয়েছে তা যেন স্থির মন্থনদণ্ড হয়ে জলে আলোড়ন এনে দিচ্ছে, যার ফলে সমুদ্রের ওপর-তলে সদাই ঢেউ-এর দোলানি। পৌরাণিক সমুদ্রমন্থনে রত্নাকর থেকে পারিজাত উঠেছে, সুধা উঠেছে যা কিনা জীবনসঞ্জীবনী। প্রকৃত সমুদ্রস্রোতের আলোড়ন-মন্থন সংখ্যাতীত সামুদ্রিক জীবের খাদ্যপরিবেশনের সহায়ক। জীবনের সঞ্জীবনীর বাহক, কি রকম রহস্য ?

সামুদ্রিক উদ্ভিজ্জের জীবন নির্ভর করে দেহপোষক রাসায়নিক লবণ ও অন্যান্য পদার্থের ওপর। প্রাণিজীবন নির্ভর করে অক্সিজেনের ওপর। সমুদ্র-পৃষ্ঠে যেখানে যথেষ্ট সূর্যকিরণ পড়ছে সেখানে ফটোসিনথেসিস বা আলোক-সংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় উদ্ভিদ এই গ্যাস উৎপাদন করে এবং তা মেশে সাগরজলে। এছাড়া বায়ুমণ্ডল থেকে অক্সিজেন সমুদ্রের গভীর অংশে না পৌঁছলে সেখানে জীবন বাঁচবে কিভাবে ? সাগরপৃষ্ঠে এবং তলদেশ দিয়ে প্রবাহিত স্রোত জীব ও উদ্ভিজ্জের খাদ্যবস্তু সারা সমুদ্র অঞ্চলের ওপর নিচ সর্বত্র ছড়িয়ে দেয়। জলের এই আলোড়ন-বিক্ষোভ 'স্রোত-বাসুকি' দ্বারা সমুদ্রমন্থনের ফল। অধ্যাপক হ্যারাল্ড সেরড্রুপ সমুদ্রস্রোতের অনুভূমিক (**horizontal**) ও ঊর্ধ্বাধ (**vertical**) গতিকে তুলনা করেছেন লাঙ্গল দিয়ে জমি চাষ করার সঙ্গে, যার ফলে মৃত্তিকায় প্রদত্ত উদ্ভিদের খাদ্যসার সারা জমিতে মিশিয়ে দেওয়া সম্ভব হয়। সমুদ্রস্রোত না থাকলে সমুদ্রের গভীরে জীবের অস্তিত্ব থাকত না, সমুদ্রপৃষ্ঠেও সর্বত্র প্রাণী ও উদ্ভিদের জীবন প্রবাহ অব্যাহত রইত না, চলমান জীবন্ত সমুদ্রের যে রহস্যময়তা তার আকর্ষণ থাকত না মানুষের কাছে।

* সমুদ্র-পুরীতে

বাহির-সমুদ্রের জল টাটকা শিশির-ধোওয়া অপরাজিতা ফুলের পাপড়ি মত ঝকঝকে উজ্জ্বল নীল, গলানো কাচের মত স্বচ্ছ। যতদূর চোখ যায়, কেবল জল আর জল ঐ দিগন্তে আকাশের সাথে মিশেছে। সমুদ্রের তলায় কী রয়েছে ? সেখানে গেলে কী দেখতে পাব ?

হ্যানস এন্ডারসেন 'ছোট্ট সাগরকুমারী' রূপকথায় মন-ভুলানো সব দৃশ্যের বর্ণনা দিয়েছেন। সেখানে সাগররাজা, সাগররাণী রাজপুত্র রাজকন্যাদের নিয়ে প্রাসাদে

বাস করেন। গোলাপী রঙের প্রবাল আর সোনালী অ্যাম্বার দিয়ে সেগুলো তৈরি। রাজকন্যারা সেখানে সোনা বিছানো বালুর ওপর খেলা করে, বাগানের সুশ্রী লতাকুঞ্জের মধ্যে ভেসে ভেসে বেড়ায়। সেখানে রামধনুরঙের ছোট ছোট মাছ আমাদের জগতের রঙিন পাখির মত ডালপালার ফাঁকে ফুরফুর করে ঘুরে বেড়ায়। সেখানে আছে সুন্দর সুন্দর গুহা যার মধ্যে মৎস্য বালক-বালিকারা লুকোচুরি খেলে। সাগর তলায় নানা রঙের ফুলের অদ্ভুত সব উদ্যান, ছেলে-মেয়েরা তার পরিচর্যা করে। সেখানে আবার ভয়ংকর অরণ্য আছে যার মধ্যে আছে আধা-জানোয়ার আধা-তরু প্রাণী। ছোটরা কাছাকাছি গেলে লম্বা লিকলিকে সাপের মত হাত দিয়ে তাদের জাপটে ধরে, আর অন্ধকার গর্তে বাস করে একশো বছর বয়সী সাগর-ডাইনী যার কুৎসিৎ চেহারা দেখলে শিশুরা ভয়ে আঁতকে উঠবে।

আমরা যদি সাগরের গভীরে নেমে গিয়ে ঘুরে ঘুরে সব দেখার ব্যবস্থা করতে পারি তবে কী নজরে পড়বে? মাথার ওপর সূর্যকিরণভরা নীল আকাশ ছেড়ে আমরা যেই সাগরজলে ডুব দেব অমনি মনে হবে এক নতুন জগতে এসে পড়েছি। জলের ভিতর ঢেউ-এর আলোড়ন নেই, কেমন আবছা নীল রহস্যময় আলোতে সবকিছু নতুন রকম দেখায়। এ আলোতে তীব্রতা নেই, আছে স্নিগ্ধ কোমলতা। নিচের দিকে চলে যেতে দেখা যাবে, সমুদ্র ঝপ করে গভীর হয়ে পড়েনি। ভূমির পাহাড়-পাষাণ অংশ ক্রমশ ঢালু হয়ে সাগরের মাঝ দিকে চলে গেছে। একে বলি মহীসোপান। সাগরের ওপর ভাগ থেকে ২০০ মিটার (৬০০ ফুট) পর্যন্ত এই ঢাল। এ পর্যন্ত সূর্যকিরণ জলের মধ্যে চলে আসে, এর পরও চলে যায় ১০০০ মিটার পর্যন্ত তবে যতই নিচে নামা যায়, আলো ততই কমতে থাকে, যেন দিনের আলো গোধূলি, গোধূলি ছাড়িয়ে রাত্রির মহলে প্রবেশ। মহীসোপানের ঢাল দিয়ে নিচের দিকে নেমে যেতে দেখা যাবে রুপালি-শুভ্র বালু-বিছানো উপত্যকা, তার মেঝে থেকে উঠছে বিচিত্র কারুকার্য-করা প্রাসাদের মত প্রবালপুঞ্জ, তার আশেপাশে ছড়ানো রয়েছে নানারঙে রঙিন ঝিনুকশঙ্খের খোলা। কোন কারিগর বুঝি এগুলি দিয়ে নকশার প্যাটার্ন বানিয়েছে।

ঢাল বেয়ে আরো নিচে নেমে যেতে মনে হবে এবার ঢালটা যেন ক্রমশ খাড়া-হেলানোভাবে চলেছে। এভাবে গভীরতা গেছে দুহাজার মিটার পর্যন্ত। এই দুশো থেকে দুহাজার মিটার স্থল-অংশকে বলি মহীঢাল (continental slope)। মহীঢাল থেকে গভীর সমুদ্রের দিকে চলে যেতে প্রথম দিকে মনে হবে ঢাল ভাবটা কমছে কিন্তু ধীরগতিতে গভীরতা বেড়ে চলেছে। দুহাজার থেকে চার হাজার মিটার গভীর ঢালু অংশকে বলা হয় মহী-উত্থান (continental rise)। এ উত্থান ক্রমে নামতে নামতে গভীরতম অংশে চলে গেছে। সেটি সমুদ্রতল।

১. জোয়ান্ট ডেভিল রে (ম্যানটা) **Manta** ২. ব্রামিড **Tarachtichthys** ৩. স্পিয়ার ফিস (তরোয়াল মাছ) **Tetrupturus** ৪. সান ফিস (সামুদ্রিক সূর্য মাছ) **Mola** ৫. রিবন ফিস (ফিতা মাছ) **Regalecus** ৬. উড়ুক্কু মাছ (ফ্লাইং ফিস) **Flying-fish** ৭. টুনা **Tuna** ৮. পর্তুগীজ ম্যান অব ওয়ার **Physalia physalis** ৯. গ্রেট হোয়াইট হাঙ্গর **Carcharodon** ১০. (হ্যাচেট) ফিস **Argyno pelecus** ১১. ভাইপার ফিস **Choliodus** ১২. জেলিফিস **Atolla** ১৩. স্কুইড **Histioteuthis** ১৪. **Vampyroteuthis** ১৫. গভীর সাগরের অক্টোপাস **Amphitretus** ১৬. **Cyclothone** ১৭.-১৮. স্ত্রী অ্যাংলার ফিস **Lynophryne** ১৯. র‍্যাট টেইল **Nezumia** ২০. ট্রাইপড ফিস **Benthosaurus** ২১. গভীর সমুদ্রের ঈল **Synophobranchus.**

গভীরতা অনুসারে সমুদ্রের স্তরভাগ ও বিভিন্ন স্তরের প্রাণী
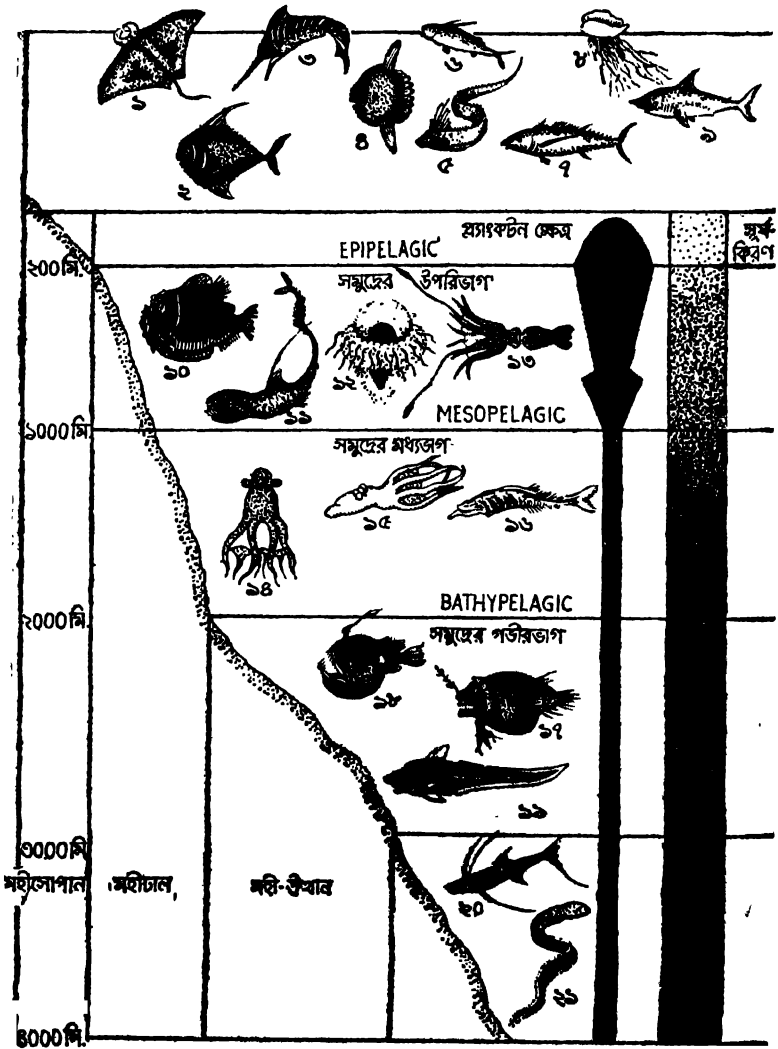
সমুদ্রজলে ঝাঁপ দিয়ে মহীসোপান, মহীঢাল, মহী-উত্থান বেয়ে নিচের দিকে নেমে যেতে আমরা হ্যান্স এণ্ডারসেনের রূপকথার সাগর-কন্যার দেখা পাব না, যে প্রবাল উদ্যানে বসে মুক্তাবসানো সোনার চিরুণী দিয়ে চুল আঁচড়াত, কিংবা দেখতে পাব না সেই ডাইনীবুড়িকে যে আঁধার গুহায় বসে একটি চোখ বের করে

দেখত ছেলেমেয়েরা কেউ কাছে-ভিতে আসছে কিনা। এদের দেখা না পেলেও অনেক সত্যিকারের অদ্ভুত জিনিসের দেখা মিলবে যা মনে আনন্দ আনবে, ভয়ও জাগবে।

সমুদ্রজলে অল্প গভীরে আমরা যদি ভাগ্যক্রমে প্রবালক্ষেত্রে পেঁছে যাই, দেখতে পাব সাগর রাজার বিচিত্র উদ্যান। নানা প্যাটার্নের এবং নানারঙের পুষ্পবৃক্ষের মত থরে থরে সাজানো প্রবালকুঞ্জ। কোথাও দেখতে পাব মুক্তা-জননী-ঝিনুক, স্ফটিকের মত উজ্জ্বল প্রস্তর-উদ্যান। তার মধ্যে রঙিন স্পঞ্জকুঞ্জ; দেখতে পাব, হীরার দীপ্তিতে ঝলমলে রঙের মাছ এদিক ওদিক ছুটাছুটি করছে, হালকা যেন বুদ্বুদ। কিংবা হয়তো দেখা যাবে, জলের মধ্যে স্থির হয়ে এরা ছোট্ট পাখনা আস্তে আস্তে নাড়ছে। যেখানে পাহাড়ের গায়ে শেওলা জমেছে সেখানে দেখতে পাব ছোট মাছের ঝাঁক। কোমল তাদের চোখের দৃষ্টি। ভূমির ওপর মাঠে মেঘের দলের মত মাছেরা সাগরজলে চারণভূমিতে চরছে, ঠোঁট দিয়ে টুকে টুকে শেওলা খাচ্ছে। বিচিত্র এদের রঙ—নীল, সবুজ, লাল, বাদামী। কেউ কেউ আবার খেলায় মেতে উঠেছে, লুকোচুরি খেলছে উল্লাসে একে অন্যকে ধাওয়া করে।

সাগরে চলার সময় নয়ন সুখকর দৃশ্য যেমন চোখে পড়বে, তেমনি অদ্ভুত জীবের দেখাও মিলবে নিশ্চয়। সেখানে দেখতে পাবে ভীষণদর্শন সব প্রাণী। তাদের সর্বাঙ্গে মধ্যযুগের যোদ্ধার মত বর্ম, অস্ত্র হল ধারাল কাঁটা আর বল্লম। কিংবা দেখা পেতে পারি এমন দৈত্যসদৃশ জীবের যাদের দেখলে মনে হবে সমুদ্রতলে অভিযানে না এলেই ভাল হত!

এছাড়া সেখানে রয়েছে নানাধরণের বহুরূপী। তাদের কান্ডকারখানা দেখলে অবাক হতে হবে। এদের কতকের অভ্যাস হঠাৎ চেহারা পালটিয়ে ফেলা। হয়ত দেখলাম পায়ের কাছে রয়েছে জলজ উদ্ভিদে ঢাকা একখন্ড পাথর। যেই ছোঁয়া লেগেছে 'পাথরটি' জীবন্ত হয়ে উঠে ধীরে ধীরে সরে গেল একপাশে। পাহাড়ের ধারে ভারি সুন্দর রঙিন ফুল ফুটে রয়েছে। যেমন চমৎকার পাপড়িবিন্যাস তেমনি মনোহর রঙ। ও কি! একটু কাছে যেতেই ফুলটি নিজের চেহারা পালটিয়ে ম্যাটমেটে রঙের জেলি হয়ে গেল! পায়ের কাছে কি একটা বস্তু পড়ে ছিল। আশপাশের দৃশ্যের সঙ্গে এমন বেমালুম মিশে আছে যে, আমার পা পড়ে গেল তার ওপর। অমনি বস্তুটি ভেল্কি দেখিয়ে একটা বেশ মাছ হয়ে ভেসে উঠল, পাখনা দিয়ে জল টেনে ওদিকে চলে গেল, ফ্ল্যাটফিস। ওর দুটো চোখ একই পাশে। যে দিকটায় চোখ নেই সেদিকটা মাটির ওপর রেখে শুয়ে থাকে, যেখানকার মাটি বা পাথর বা গাছপালার যেমন রঙ তেমনি রঙ ধারণ করে নিজের দেহে। যেখানে যাচ্ছে, সেখানকার পরিবেশের সঙ্গেই নিজদেহের মিল করে

নিচ্ছে। 'মেক-আপ' নেওয়ার ওস্তাদ ফ্ল্যাটফিস। মেক আপ নিচ্ছে কেন? অভিনয় করার জন্য নয় নিশ্চয়ই। এক জায়গায় শুয়ে থেকেই খাদ্য সংগ্রহ করার কৌশল আয়ত্ত করছে সে। অন্যান্য প্রাণী খাবার যোগাড় করতে এদিক ওদিক ছুটছে, খাবার সংগ্রহ করছে আবার তাকেই খাদ্য বানাতে তার চেয়ে বড় বড় প্রাণী ঘুরে বেড়াচ্ছে। কিন্তু ফ্ল্যাটফিস এক জায়গায় চুপটি করে পড়ে থাকে, ঘুমিয়ে নয়, চোখ তার সজাগ। ছোট মাছ বা অন্য প্রাণী তার অস্তিত্ব বুঝতে না পেরে কাছে এসে পড়ল, বহুরূপী ফ্ল্যাটফিসের খাবার জুটে গেল। তাকে যে খেতে পারে সে হয়ত তার পাশ দিয়েই গেল কিন্তু তাকে ঐ স্থানের একটা অংশ মনে করে তার দিকে নজরই দিল না।
গভীর সমুদ্রের দিকে নেমে যেতে যেতে মনে হবে আমরা বুঝি স্থলভাগেরই কোন দেশে এসে পড়েছি। এখানে রয়েছে পাহাড়, দীর্ঘ তার চূড়া, পার্থক্য কেবল স্থলের পাহাড়ের ওপর যেমন নানা জাতের গাছ দেখা যায়, এখানে তেমন নেই। পাহাড়ের শীর্ষদেশ দূর থেকে দেখে মনে হয় গির্জার চূড়া।
প্রান্তর রয়েছে বিস্তৃত তবে সেখানে ঘাস-জঙ্গল নেই, রয়েছে বালি ও নানা রঙের নুড়িপাথর। এখানে ওখানে দাঁড়িয়ে আছে ধাপে-ধাপে নেমে যাওয়া শৈলমালা, কোন কোনটি খাড়া দুর্গপ্রাচীরের মত। এর শেষ কোথায়? নীলাভ রঙ ক্রমে কালো কালির রঙে পরিণত হয়। অবশেষে ঘন অন্ধকারে আর কিছুই চোখে পড়ে না, কেবল মাঝে মাঝে কেমন অদ্ভুত আলো দেখা যায় ক্ষণিকের জন্য। মাথার ওপর দিয়ে একসারি আলো ভেসে চলে গেল, দেওয়ালির রাতে চলমান প্রদীপমালার মত। কখনও দেখা গেল পাহাড়ের গুহার মধ্যে একটি আলো, একবার দেখা দিয়েই আড়ালে চলে গেল। কিম্ভূতকিমাকার মাছেদের গায়ে রয়েছে বিন্দু বিন্দু রোশনাই; কোন কোন মাছ মাথার ওপর আলোর নিশান তুলে ঘুরে বেড়াচ্ছে, কেউ বা আলোকগুচ্ছ ঝুলিয়ে দিয়েছে। মাঝে মাঝে আলোধারী মাছেদের মধ্যে সাড়া পড়ে যায়, কেউ হয়ত ছুটছে অন্য কাউকে ধরে নিজের জঠরে পুরতে। আবার যদি বড় কোন জানোয়ারের ছায়া দেখা যায়, সবাই আত্মরক্ষার জন্য ব্যস্ত হয়ে পাহাড়ের গুহায় আশ্রয় খোঁজে। কিন্তু সেখানেও তো ছোটদের জন্য প্রতীক্ষা করছে ক্ষুধার্ত অন্য কেউ।

নিকষ কালো অন্ধকার রাতে ভূমির ওপর চলতে যেমন লাগে, সাগরের তলায় অভিজ্ঞতা ঠিক তেমন নয়। ভূমির ওপর দাঁড়িয়ে গভীর রাতে তারার দীপ্তি দেখা যায়, গভীর সাগরেও দেখা যায় গা থেকে আলো ছড়ানো মাছের আলোকবিন্দু কিন্তু এখানে যেমন স্রোতের মধ্যে পড়তে হতে পারে, ডাঙায় তেমন আশংকা নেই। গভীর সমুদ্র-অংশে কোন কোন জায়গায় পাওয়া যায় শীতল

জলের স্রোত প্রবাহ, ওপর থেকে নিচে নেমে এসে তলদেশের ওপর দিয়ে বয়ে চলেছে। কোথাও পাওয়া যাবে ঊর্ধ্বমুখী স্রোত, যার মধ্যে পড়লে লিফ্‌টে নিচতলা থেকে ওপর তলায় ওঠার মত আপনা-আপনি উঠে আসা যাবে। দক্ষিণ মেরুতে গিয়ে ওখানকার নিচে ডুব-দেওয়া স্রোতে স্থান করে নিলে সোজা নিচে নেমে 'পাতালরেলের' যাত্রী হয়ে আটলাণ্টিক মহাসাগরের মাঝামাঝি গিয়ে পেঁছান যাবে। সমুদ্রের ওপর থেকে একে যেমন দেখি, তলায় নেমে গেলে দেখব সম্পূর্ণ অন্যরকম দৃশ্য। সে এক বিস্ময়ের জগৎ। ভূমিতে মানুষ সবাই ভূমিচারী, কেউ সমভূমিতে কেউ বা পাহাড় অঞ্চলে কিছুটা উঁচু অংশে বাস করে। কিন্তু সমুদ্রের বিভিন্ন জলস্তরে দেখা মিলবে বিভিন্ন ধরণের প্রাণীর সঙ্গে। এরা যে স্তরের বাসিন্দা তা ছেড়ে প্রায়ই অন্য স্তরে বসবাস করতে যায় না। অবশ্য কতক প্রাণী আছে যারা গভীর জলের স্তরে পাহাড়ের গুহায় দিনের বেলাটা কাটিয়ে দেয়, রাত্রিতে উঠে আসে জলের ওপর স্তরে খাদ্যের সন্ধানে। এরা রূপকথার রাক্ষসের মত নিশাচর, দিনে আড়ালে বাস, রাত্রিতে দারুণ তৎপর।

সমুদ্রতলের গভীর অন্ধকার মুলুকে পাহাড়-পর্বত, প্রান্তর উপত্যকার ভিতর দিয়ে চলতে দিশেহারা হয়ে পড়তে হবে। আমরা যদি বাহির সমুদ্রের প্রান্ত, মধ্য ও গভীর অঞ্চলে সামুদ্রিক জীবের পরিচয় নিতে যাই, বিচিত্র জীবনসংগ্রামের দৃশ্য দেখতে পাব। যাবতীয় সামুদ্রিক প্রাণীর খাদ্য কাঠামোর মূলে রয়েছে 'সমুদ্রের ঘাস' প্ল্যাংকটন। ভূমিপৃষ্ঠে তৃণ যেমন মাটির ওপর জন্মায়, মাটির নিচে নয়, তেমনি সূর্যকিরণসমৃদ্ধ সমুদ্র-অংশে উৎপন্ন হয় জলজীবের মৌলখাদ্য। স্থলভাগের মাংসাশী প্রাণী যেমন ঘাস খায় না, তৃণভোজীদের ভক্ষণ করে, সাগরেও তেমনি সকল প্রাণীই সাগর তৃণভোজী নয় কিন্তু সকলের সঙ্গেই সাক্ষাৎ বা গৌণভাবে সাগর তৃণের সম্পর্ক রয়েছে। খাদ্য-খাদক সম্পর্কিত চার্ট থেকে বিষয়টি বোঝার সুবিধা হবে।

* সামুদ্রিক জীবের খাদ্যচক্র

স্থলভাগে সমগ্র প্রাণিজীবন যেমন সূর্যের ওপর নির্ভরশীল সমুদ্রেও তেমনি সরল পুষ্টিদায়ী লবণ (ফসফেট, নাইট্রেট প্রভৃতি) কার্বন ডাই-অক্সাইড সহ সর্বত্র অতি অল্প পরিমাণে জলে দ্রব হয়। সূর্যকিরণের তাপশক্তির সাহায্যে জলজ উদ্ভিদ এগুলি দিয়ে দেহকোষ তৈরি করে নেয়। এই কারণে সাগর উদ্ভিদ কেবল সূর্যালোকপ্রাপ্ত অংশেই জন্মে। এই ধরণের উদ্ভিদ মুক্তভাবে ভাসমান নয়, মূল দ্বারা ভূমির সঙ্গে যুক্ত। তাই এরা মহাদেশ বা দ্বীপের উপকূলে উদ্ভিজ্জঝালের সৃষ্টি করতে পারে মাত্র। বাহির-সমুদ্রে তাদের স্থান হয় না,

কারণ সেখানে মূল দিয়ে গভীর সমুদ্রের মাটি স্পর্শ করা উদ্ভিদের পক্ষে সম্ভব নয়।

ভূমির ওপর যেমন সাগরেও তেমনি সামুদ্রিক প্রাণীদের জীবন ধারণের উপযোগী পৌষ্টিকগুণযুক্ত যৌগিক খাদ্যের প্রয়োজন, যা মেলে উদ্ভিদে অথবা উদ্ভিজ্জ-ভোজী প্রাণীর দেহে। সামুদ্রিক উদ্ভিদের এ গুণ আছে কিন্তু এরূপ জলজ উদ্ভিদের জন্ম ও বৃদ্ধির অনুকুল ক্ষেত্র সীমাবদ্ধ হওয়ায় এর পরিমাণ এত কম যে, বিপুলসংখ্যক সামুদ্রিক জীবের খাদ্যচাহিদা মেটানো এদের পক্ষে সম্ভব নয়, কাজেই বেশিরভাগ সমুদ্রচারী জীব নির্ভর করে 'সামুদ্রিক ঘাস' অর্থাৎ ফাইটোপ্ল্যাংকটনের ওপর। ঐ আণবীক্ষণিক উদ্ভিজ্জকণিকা কোটি কোটি সংখ্যায় জলের ওপর স্তরে ভেসে বেড়ায়। এমন কৌশলে এরা ভাসে যে ঘন হয়ে জলের ওপর পুরু স্তর সৃষ্টি না করে সর্বদা সূর্যকর-দীপ্ত অঞ্চলে থাকতে পারে। স্তর ঘন হলে ডুবে সূর্যরশ্মির আওতার নিচে যাতে চলে যেতে না হয় সেজন্যই এরা হাল্কাভাবে সংগঠিত। জলে যেখানে রাসায়নিক খাদ্যলবণের প্রাচুর্য, সূর্যকিরণ ও উত্তাপ অনুকূল, সেখানে তারা দৈনিক তাদের সংখ্যা দ্বিগুণ করতে থাকে, ফলে সেখানকার সমুদ্রের রঙ তাদের রঙে হয়ে যায় সবুজ, এমন কি কখনো কখনো তারা সেই সামুদ্রিক অঞ্চল ময়লা ক্লেদপূর্ণ করে ফেলে। এই প্ল্যাংকটন উদ্ভিজ্জ মিডি প্ল্যাংকটনিক প্রাণীর (zoo·plankton) প্রধান খাদ্য। এরা আবার ছোট ছোট মাছের খাদ্য। সবচেয়ে কচি অবস্থায় মাছেরা এ দুই রকম খাদ্যই খেয়ে বেড়ে ওঠে। কতক মাছ, যেমন হেরিং এবং ম্যাকারেল ও হোয়েলবোন তিমি সারা জীবন প্ল্যাংকটন খাদ্যের ওপর নির্ভরশীল। অন্যান্য মাছ যেমন আকারে বাড়তে থাকে অন্য ছোট মাছ বা সাগরতলের প্রাণী, যেমন কাঁকড়া ও সর্পিল খোলাযুক্ত শামুক (whelk) খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করে। সাগরতলভূমির এইসব জীবের খাদ্যও প্ল্যাংকটন। সমুদ্রের ওপর ভাগ থেকে মৃত ও অর্ধ-মৃত প্ল্যাংকটন অবিরত বৃষ্টির মত ঝরে পড়ছে নিচের দিকে, আকাশ থেকে ইলশেগুঁড়ি বৃষ্টির মত এ যেন সমুদ্রের খাদ্যকণার ইলশেগুঁড়ি বর্ষণ। সমুদ্রজলের ওপর-স্তরের প্রাণীরা প্ল্যাংকটন, ফাইটো প্ল্যাংকটন খাদ্যের মহাভোজ লাগাচ্ছে, সাগরতলে যারা রয়েছে তারাও বঞ্চিত হচ্ছে না। ভোজ্যদ্রব্যের অবশেষ নিচে যারা খাদ্যের আশায় বসে আছে তাদের 'পাতে' গিয়ে পড়ছে। প্রকৃতির রাজ্যে খাদ্যব্যবস্থা এক নিখুঁত 'খাদ্যশৃঙ্খলে গাঁথা—দেহপুষ্টিসাধক রাসায়নিক লবণ ও কার্বন-ডাই-অক্সাইড দিয়ে দেহকোষ গঠিত হয়ে উদ্ভিজ্জ ও প্রাণীর জীবনচক্রের সূচনা ; তাদের জীবন অবসানে দেহাস্থি ও দেহস্থিত রাসায়নিক লবণ পদার্থ আবার সমুদ্রজলেই ফিরে আসে। ভূ-পৃষ্ঠে সাগর জল মেঘবাষ্পরূপে বারিবর্ষণ করে নদীরূপে সমুদ্র-উৎসে এসে নিজেকে বিলীন করে ; সমুদ্রেও অনুরূপ রাসায়নিক জীবনদায়ী রসচক্র বিদ্যমান।
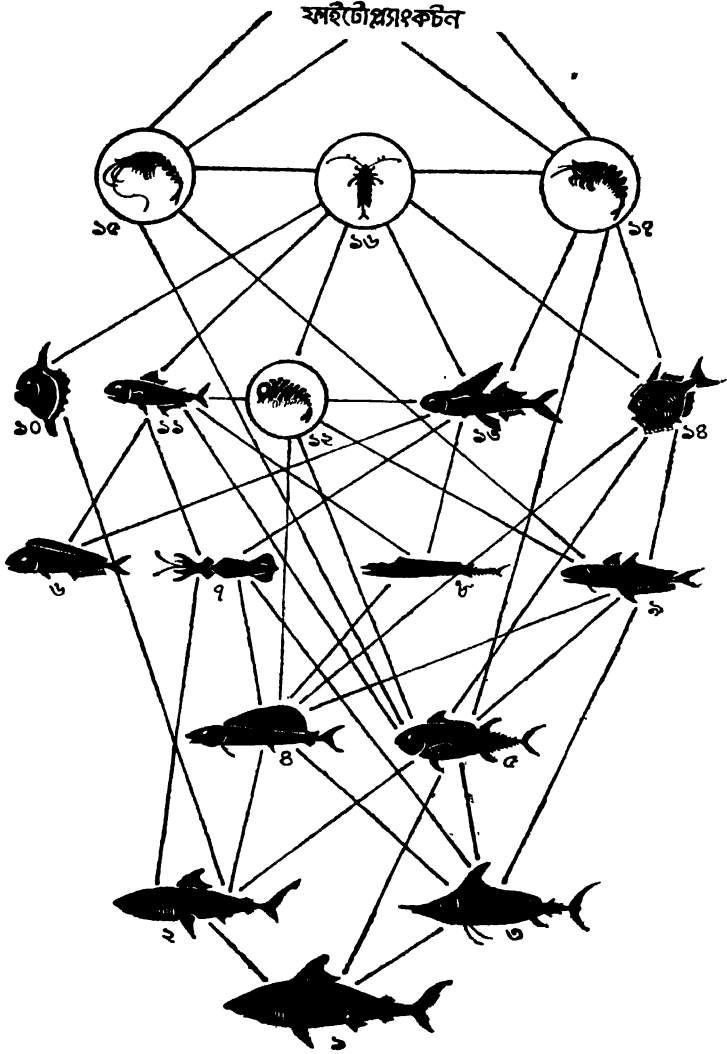
গ্রেট হোয়াইট-শার্কের খাদ্য-উৎস

তলার দিক থেকে প্রতিটি প্রাণীকে রেখা দিয়ে তার প্রধান খাদ্য উৎপাদনের সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে। বস্ত্রের সুতো খুলতে খুলতে শেষ পর্যন্ত যেমন তুলার আঁশে পৌঁছতে হয় তেমনি দেখা যাবে গ্রেট হোয়াইট শার্কের খাদ্যতন্তুর আদি উপাদান ফাইটো প্ল্যাংকটন।

হিসাব নিয়ে দেখা গেছে, পৃথিবীর সমুদ্রে বছরে ২০ কোটি টন ফাইটো প্ল্যাংকটন উৎপন্ন হয়। উদ্ভিজ্জভোজী সামুদ্রিক জীবেরা বিনা চাষে এই অজস্র পরিমাণ খাদ্যফসল পায় বলেই তাদের জীবন ধারণ সম্ভব হচ্ছে। আবার উদ্ভিজ্জভোজীদের ওপর ভিত্তি করেই সমুদ্রের সমগ্র প্রাণীর জীবনচক্র আবর্তিত হচ্ছে। এই শৃঙ্খলের ক্ষুদ্রতম অংশ যদি ছিন্ন হয়, ফাইটোপ্ল্যাংকটন উৎপাদন যদি বন্ধ হয়ে যায়, তবে সমুদ্রের প্রাণীসমূহের জীবনলীলা কিভাবে ব্যাহত হবে একটিমাত্র জীবের খাদ্য উৎসের হিসাব নিলেই তা বোঝা যাবে। এখানে চার্টে গ্রেট হোয়াইট শার্কের খাদ্যশৃঙ্খল দেখান হল। বিরাট, হিংস্র, শক্তিশালী বৃকোদর সদৃশ প্রাণী। সে ফাইটো প্ল্যাংকটন খায় না কিন্তু ঐ মিহি খাদ্য দ্বারা দেহগঠন করেই যারা আকারে বড় হয়েছে, তারাই হয়েছে অন্যদের ভোজ্য। ছোটরা আছে, তাই আছে বড়রাও।

> **The whole system froms a network of feeding 'chains' which, as the salt and carbon dioxide are returned to the sea by excretion and death, is seen to be part of an elaborate chemlcal cycle.**
>
> **—Encyclopaedia Britannica, vol 17. p. 1003**

গ্রেট হোয়াইট শার্কের খাদ্য উৎস

১. গ্রেট হোয়াইট শার্ক **Carcharodon Corcharias** ২. গ্রে শার্ক ৩. মার্লিন ৪. ল্যান্সেট ফিস **Alepisaurus** ৫. টুনা **Tuna** ৬. ডলফিন ফিস **Coryphena** ৭. স্কুইড ৮. স্নেক ম্যাকেরেল **Gympylus** ৯. **Chiasmodontid fish** ১০. সামুদ্রিক সান ফিস **Mola** ১১. ল্যান্টান ফিস **myctophid** ১২. **amphipod** ১৩. ফ্লাইং ফিস ১৪. হ্যাচেট ফিস ১৫. **Mysid Shrimp** (মাইসিড শ্রিম্প) ১৬. **Copepod** ১৭. **Euphausid Shrimp** (ইউফাসিড শ্রিম্প)

সমুদ্রের রহস্য

যা কিছু বিশাল তা মানুষের বিস্ময় জাগায়, যা ভয়ংকর তা শংকামিশ্রিত শ্রদ্ধা জাগায়, যা সুন্দর তা মুগ্ধ করে। সমুদ্রে একাধারে সব কয়টি উপাদানের সমাবেশ। বিশালত্বে মহাকাশের পরেই সমুদ্রের স্থান। মহাকাশের চেয়ে সমুদ্রের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক নিবিড়, কারণ এখানে সে অবগাহন করতে পারে অনুসন্ধানে গভীরতর অংশে প্রবেশ করতে পারে, বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষায় এর স্বরূপ উদ্ঘাটনের প্রয়াস চালাতে পারে। সর্বোপরি, পৃথিবীর জীবকুলের আদিজননী যে সমুদ্র, তার শরিকী অংশ মানুষ বহন করে চলেছে তার দেহে লবণাক্ত শোণিত স্রোতে।

ভূমিপৃষ্ঠে নানা আকারের ভয়ংকর প্রাণী আছে কিন্তু সমুদ্রে এদের সংখ্যা ও বৈচিত্র্য গণনাতীত। এমন কতক প্রাণী আছে, বিরাটত্বে যার সমকক্ষ স্থলে কেউ নেই। স্থলভাগে প্রাকৃতিক রুচি ও সৌন্দর্যের বাহন হয়েছে বৃক্ষলতা, অরণ্য, ফুলফল, পাখি যাদের অঙ্গে রঙের বাহার। সমুদ্রে প্রকৃতি যেন জীবের দেহেই নানা বর্ণের আলপনা নকশা এঁকেছেন, স্থলের সংগীত ও সুগন্ধের অভাব পূরণ করেছেন রঙের জৌলুসে ও আকারের অভিনবত্বে।

- শীতল আলো কি থেকে হয় ?

সমুদ্রের 'শীতল আলো' মানুষের কাছে বিস্ময়ের বস্তু। মানুষ যে আলো উৎপন্ন করে তাতে তাপ আছে কিন্তু সামুদ্রিক জীবের দেহনিঃসৃত আলোতে উত্তাপের অভাব। ওপর-জলস্তরে প্ল্যাংকটনপুঞ্জ থেকে যে দ্যুতি বের হয় তাতে বিশেষত্ব রয়েছে। প্ল্যাংকটন কণা এত মিহি যে এককের আলোকবিন্দু চোখে পড়ে না। বহুর সমাবেশেই এদের অস্তিত্ব প্রকাশমান। দিনের আলোতে বা তীব্র বৈদ্যুতিক আলোকে প্ল্যাংকটনের আলো আছে বলে বোঝা যায় না, অন্ধকারেই এর দীপ্তি, আলোড়িত হলে যে আলো ঠিকরে বের হয় তাতে খবরের কাগজ পড়া যায়। এই ওপর স্তরের আলোর বিচিত্র স্বভাব লক্ষ্য করা গেছে আরবসাগরে। নাবিকদের কাছে এই আলোর 'নাচন' উইম-ওয়াম (**wim-wam**) নামে পরিচিত।

It consists of revolving bands of light several miles long, rotating slowly about a centre like spokes of wheel.

একটি বিন্দুকে কেন্দ্র করে কয়েক মাইল লম্বা আলোর ফিতা বিরাট চলমান চাকার মত ধীরে ধীরে চক্রাকারে ঘোরে। কেন এরূপ হয় তার কারণ আজ পর্যন্ত অজ্ঞাত।

প্রাণীর দেহনিঃসৃত আলো সম্বন্ধে ব্রিটানিকায় বলা হয়েছে ঃ

Phosphorescence of the sea is largely due to Protozoa of which the radiolaria and dino-flagellata are luminous. The latter my develop in such enormous numbers that the sea is a pink or red by day and a vivid sheet of flame by night.

Vol. 3. p. 6676

সমুদ্রের পৃষ্ঠস্তরের মিহি উদ্ভিদ ও জীবকণিকা ছাড়াও গভীর সমুদ্রে অনেক প্রাণীর দেহে আলো জ্বালানোর কৌশল আছে। এই আলো দিয়ে আত্মরক্ষার জন্য শত্রুর ভীতি উৎপাদন করে। স্বজাতীয়দের আকর্ষণ করে মিলনের জন্য। স্থলে জোনাকি যেমন আলোক সংকেত দিয়ে সঙ্গীকে তার অবস্থান জানিয়ে দেয়, গভীর সমুদ্রের অন্ধকারময় রাজ্যে মাছ ও অন্যান্য প্রাণীরা তেমনি নানা প্যাটার্নের আলোকমালা নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। এখানে দিনের আভাস নেই, সর্বদাই রাত্রি এবং তা যেন দীপান্বিতার রাত্রি।

* হিমশৈল (Iceberg) কি ? কিভাবে এর উৎপত্তি ?

হিমশৈল হল সমুদ্রে ভাসমান বিরাট তুষারস্তূপ। উত্তর ও দক্ষিণ মেরুতে প্রচণ্ড শীতে জল সাদা বরফস্তূপে পরিণত হয়ে আছে ! উত্তর-মেরুতে বৃক্ষলতাহীন পাহাড়ের গায়ে জমা বরফ হিমপ্রবাহ হয়ে অতি ধীরে সাগরের দিকে এগিয়ে চলে। উত্তর গোলার্ধে যখন গ্রীষ্মকাল, সূর্যের তাপ অন্য অন্য সময়ের চেয়ে অপেক্ষাকৃত উষ্ণ, তখন হিমপ্রবাহ কিছুটা গতি পায়, হিমপ্রবাহের সামনের দিকটা সাগরজলে প্রবেশ করে। সেখানে জোয়ার ও ঢেউ-এর দাপটে তুষারস্তূপের কিছু অংশ ভেঙে যায়। তখন শোনা যায় বজ্রগর্জনের মত শব্দ। হিমশৈলের জন্ম হল ! ঐ অংশ এতক্ষণ ভূমির ওপর দিয়ে লম্বিত হিমবাহের সঙ্গে যুক্ত ছিল ; বিচ্ছিন্ন হওয়া মাত্র তা জলের মধ্যে ভারসাম্য হারিয়ে ওলটপালট করে ডিগবাজি খেতে শুরু করে। খানিক পরে আবার ভারসাম্য ফিরে পেয়ে সমুদ্র স্রোত

ও বাতাসের বেগে ভেসে চলতে থাকে দক্ষিণ অক্ষাংশের দিকে। সেখানে এদের বিলুপ্তি।
গ্রীণল্যাণ্ড হল হিমশৈলের প্রধান জন্মভূমি। এর উপকূল বরাবর, বিশেষ করে বাফিন উপসাগর ও ডেভিস প্রণালীতে সর্বদা এদের উদ্ভব হচ্ছে। উৎপত্তির প্রক্রিয়া একই প্রকার। হিমপ্রবাহ স্থলভাগ থেকে সাগরে এসে নামলে তার মাথার দিকটা ভেঙে জন্মভূমি ছেড়ে নিরুদ্দেশ যাত্রা করে। উষ্ণজলের সংস্পর্শে গেলে ক্ষীণকায় হতে হতে অবশেষে সমুদ্রেই মিশে যায়। আকার ছোট হতে থাকলে ভারসাম্য রাখার জন্য এরা ক্রমাগত জলের মধ্যে ওলট-পালট খায়, কতক বা কোন মহাদেশের উপকূলে গিয়ে ঠেকে পড়ে। এইভাবে আমেরিকার নিউফাউণ্ডল্যাণ্ড ব্যাংকস হয়েছে হিমশৈলের 'সমাধিস্থান'। হিমশৈল অনেক সময় মাটি ও শিলা বহন করে নিয়ে যায়, চলার পথে তা সাগরে জমা দেয়! অবশিষ্ট কিছু থাকলে তা সঞ্চিত হয় তাদের বিলুপ্তির স্থানে। অনেক সময় হিমশৈল এইভাবে গরম জলের সাগরে বিলীন হওয়ার আগে দুই হাজার মাইল পর্যন্ত সুমেরুর পাথর বয়ে আনে।

* হিমশৈল জলে ভাসে কেন ?

জল জমাট হলে আয়তনে বাড়ে, কাজেই বরফ জলের চেয়ে ওজনে হাল্কা। এক গ্যালন জল ঐ আয়তনের (volume) বরফের চেয়ে ওজনে প্রায় $\frac{1}{10}$ বেশি। হিমশৈল তার সমগ্র ওজনের N পরিমাণ জল সরিয়ে দেয় (displace করে) সেই অনুপাতে জলের মধ্যে ডোবে। হিমশৈল ভেসে থাকার সময় তার ৯ ভাগের ৮ ভাগ থাকে জলের নিচে, জলের ওপর জেগে থাকে মাত্র $\frac{1}{9}$ অংশ। কাজেই যে হিমশৈল ১০০ ফুট জলের ওপর দেখা যায়, জলের নীচে রয়েছে তার ৯০০ ফুট অংশ

* হিমশৈল কত বড় হয় ?

হিমশৈলগুলি যেন সমুদ্রে ভাসমান বিরাট শান্ত দানব। নীল আকাশের পটভূমিতে সূর্যকিরণে চোখ ঝলসানো বিশাল গির্জার মত দেখায়।
দক্ষিণমেরু সাগরে ৭০০ ফুট হিমশৈল দেখা গেছে, যার বেড় হবে এক মাইলের বেশি। জলের মধ্যে ডোবা রয়েছে ৬০০০ ফুটের অধিক।

* হিমশৈলের উপযোগিতা

হিমশৈল মিঠাজলের বরফস্তূপ, কারণ এদের উৎপত্তি সাগরের নোনাজলে নয়, এরা স্থলে উৎপন্ন হিমপ্রবাহের খণ্ডিত অংশ। এরা অবিরত সুপেয় জল সমুদ্রে

এনে মিশিয়ে দিচ্ছে। কী পরিমাণ জল? হিসাব করে দেখা গেছে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পূর্ব উপকূলে সাগরজল প্রতি বছর ⅛ ইঞ্চি করে বাড়ছে, প্রতি একশো বছরে সমুদ্র-পৃষ্ঠের জল ২ ফুট করে ফেঁপে উঠছে। মেরু অঞ্চলের বরফগলা জল এই বৃদ্ধির কারণ বলে মনে করা হয়। এ ছাড়া মেরু থেকে ভূ-শিলা দূর অঞ্চলে ছড়িয়ে দেওয়ার কাজ করছে হিমশৈলগুলি।

* হিমশৈল থেকে বিপদ

ভুবন্ত বরফস্তূপ অনেক সময় সমুদ্রে জাহাজ চলাচলের পথে বাধা ও বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। ছোটখাট পাহাড়সদৃশ বরফস্তূপের (iceberg) সঙ্গে বেগে চলমান জাহাজের ধাক্কা লাগলে তা মারাত্মক হয়ে পড়ে। এমনি ঘটনা ঘটেছিল ১৯১২ সালের ১৪ই এপ্রিল, রবিবার রাত্রিতে। তৎকালের সর্ববৃহৎ যাত্রীবাহী জাহাজ 'টাইটানিক' (Titanic) ইংল্যান্ড থেকে আমেরিকায় প্রথম যাত্রা করেছে। আধুনিক সাজ-সরঞ্জাম ও বিলাসবহুল উপকরণে সজ্জিত ভাসমান নগরীসদৃশ লৌহপোত, যাত্রী সংখ্যা ২,২২৪ জন। তুষারশৈলের সঙ্গে আঘাতে জাহাজের লোহার পাতের খোল ভেঙে ফাটলের সৃষ্টি হল। কিছুতেই জল রোধ করা গেল না, জাহাজ ডুবে গেল। মোট যাত্রীর মধ্যে ৭১১ জন রক্ষা পায়, অন্য সকলের ঘটল সলিল সমাধি। সে সময়ে 'টাইটানিক' ডুবি সারা বিশ্বে দারুণ আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। আলোচনার বিষয় হয়েছিল ঘাতক হিমশৈল।

* হিমবাহ, হিমশৈল ও হিমানী সম্প্রপাতের পার্থক্য

হিমবাহ (glacier) পর্বতের গায়ে ও মেরুক্ষেত্রে সঞ্চিত বরফের স্তূপ। অতি ধীর গতিতে এই বরফপ্রবাহ নিচের দিকে এগিয়ে আসে। চলার পথে পাথরের খণ্ড থাকলে তাও ঐ সঙ্গে চলে আসে। পর্বত অঞ্চলে হিমবাহ-গলা জল থেকে নদীর উৎপত্তি হয়।

হিমশৈল (iceberg) মেরু অঞ্চলের হিমবাহের খণ্ডিত দেহাংশ। সমুদ্রের স্রোত ও ঢেউ-এর তাড়নায় ভেসে চলে বিলুপ্তির দিকে।

হিমানী সম্প্রপাত (avalanche) পর্বতের ওপর স্তূপীভূত বরফের ভগ্ন অংশ অকস্মাৎ পাহাড়ের গা বেয়ে দুর্বার-গতিতে নামতে সুরু করে। চলার পথে সব কিছু চূর্ণ করে দিয়ে উপত্যকায় এসে শান্ত হয়। হিমানী সম্প্রপাতে জীবননাশ ও সম্পত্তির ক্ষতি হয়ে থাকে।

* সমুদ্রজলে বিভিন্ন ধাতু

পৃথিবীর প্রথম ৯২টি মৌল উপাদনের মধ্যে ৬০টির মত সমুদ্রজলে বিদ্যমান,

এদের বেশির ভাগই দ্রব অবস্থায়, কতক আছে গ্যাসীয় আকারে, কতক অতি মিহি কণিকারূপে (particulate form)। সমুদ্রজলে সোনা, রূপা, ইউরেনিয়াম আছে, জানার পর এগুলি আহরণের জন্য উদ্যম দেখা দেয়। তাত্ত্বিক দিক থেকে দেখলে প্রতি ১ কিউবিক মাইল জলে ধাতুর যে পরিমাণ আছে বলে হিসাব করা যায়, তা যথেষ্ট আশাব্যঞ্জক কিন্তু জল থেকে তা ছেঁকে তোলা সহজ নয়। সাগর থেকে ১ আউন্স সোনা আহরণ করতে ৮০ লক্ষ টন সাগরজল এবং ২ লক্ষ ৮০ হাজার টন লবণ ছার্কান প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে চালাতে হবে। এইভাবে ৮০ আউন্স রূপা এবং ৫ পাউন্ড ইউরেনিয়ামও মিলতে পারে। কিন্তু এই পদ্ধতিতে ব্যবসায়িক ভিত্তিতে এরূপ ধাতু আহরণ বাস্তবসম্মত নয়।

* সমুদ্রতলের পাহাড়

মহাদেশের মূল ভূভাগের কাছাকাছি যেসব দ্বীপ রয়েছে তাদের বেশির ভাগই একদা ভূখন্ডের সঙ্গে সংযুক্ত ছিল; কোন ভূ-প্রাকৃতিক কারণে কিছু অংশ জলের তলে চলে যাওয়ায় উঁচু অংশটি দ্বীপে পরিণত হয়েছে। কতক গাছ মাটির তলা দিয়ে শিকড় চালিয়ে দেয় যা থেকে কিছুটা দূরে নতুন একটি চারাগাছ গজিয়ে ওঠে। মহীসোপানের সঙ্গে সংলগ্ন সাগরমধ্যস্থ দ্বীপকে এমনি মূল ভূখন্ডের প্রসারিত অংশ বলা যায়।

অন্য একধরণের পাহাড় সমুদ্রে জলের তলায় ডুবে আছে যেগুলো সাগরতল থেকে আগ্নেয়গিরিরূপে ফুঁসে উঠেছিল; আগুন নিভে গেলে সেগুলো আর বাড়েনি। ঢেউ-এর তাড়নায় তাদের মাথা ক্ষয়ে গেছে, কালক্রমে ভূত্বকের অবনমনের ফলে পাহাড়ও ক্রমে নিচের দিকে বসে গেছে। যে আগ্নেয়গিরিগুলোর চূড়া জলের ওপরে জেগে ওঠেনি তাদের বলা হয় সাগর-পাহাড় (sea mount)। যে ডুবো পাহাড়গুলির মাথা জলের ওপরতল পর্যন্ত আসে, সেখানে প্রবাল দ্বীপ ও প্রবাল বলয় (atoll) গড়ে ওঠে। ১৮৩৭ সালে ডারউইন এই অভিমত প্রকাশ করেছিলেন। তিনি বলেন, সাগরতল উত্থিত এরূপ আগ্নেয়গিরি কালক্রমে নিচে বসে যেতে থাকলেও প্রবালকীট পাহাড় নিমজ্জনের সঙ্গে সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে এমনভাবে প্রবালকুঞ্জ একটির ওপর আরেকটি এমনভাবে তৈরি করে চলেছে যে, এদের জীবনধারণের পক্ষে আবশ্যক ঢেউ-এর আলোড়ন-জনিত অক্সিজেন সহজলভ্য হচ্ছে। অ্যাটলের ভূ-নিম্নে পাইপ প্রোথিত করে এবং অন্যান্য উপায়ে যে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়েছে, তা থেকে এবং বিশেষ করে ১৯৪৬ সালে বিকিনি অ্যাটল অঞ্চলের পরীক্ষার ফলে ডারউইনের মতের সমর্থন মিলেছে। এছাড়া হেস্ সাহেব (H. H. Hess) ১৯৪৬ সালে পরীক্ষা চালিয়ে দেখেছেন প্রশান্ত মহাসাগরে শত শত সমতলশীর্ষ সাগর পাহাড় রয়েছে। ১৯৫৬ সালে

হ্যামিলটন সাহেব (E. L. Hamilton) দেখলেন যে, হাওয়াই দ্বীপের পশ্চিম সমুদ্রের জলতলে এমন অনেক মাথাকাটা নির্বাপিত আগ্নেয়গিরি রয়েছে যেগুলো সমুদ্র সমতলের কাছাকাছি আসার পর ঢেউ-এর আঘাতে অনেকখানি ক্ষয়িত হয়ে গেছে এবং সাগরতলের নিমজ্জনের ফলে জলপৃষ্ঠ হতে ৩০০০ থেকে ৬০০০ ফুট নিচে চলে গেছে। এখানে অ্যাটল গঠিত হতে পারেনি কারণ, যে হারে প্রবাল উদ্যানের উচ্চতা গড়ে উঠলে প্রবালকীটেরা সাগরের ঢেউ-এর সাহায্য পেতে পারত, তার চেয়ে বেশি দ্রুত পাহাড় নিচের দিকে বসে গেছে।
সমুদ্রপৃষ্ঠে শুধু জলের বিস্তার আর ঢেউ-এর মাতামাতি দেখা গেলেও জলের তলায় রয়েছে গভীর দীর্ঘ খাত আর বহু নিমজ্জিত পাহাড়।

* সমুদ্রের গাছপালা

উদ্ভিদ ধরিত্রীর আদি সন্তান। পৃথিবীকে বলা যায় উদ্ভিদের রাজ্য। এখানে খুব অল্প অঞ্চলই আছে যেখানে উদ্ভিদের বিস্তার ঘটেনি। সমুদ্রেও গাছপালা রয়েছে তবে স্বাভাবিক কারণেই স্থল ও জলের উদ্ভিদের গঠন ও স্বভাবে পার্থক্য ঘটেছে। জলে যে বিশেষ ধরণের অপুষ্পক গাছের বিস্তার, তাকে বলা হয় অ্যাল্‌জি (algae , ল্যাটিন শব্দ অ্যালগা (alga) থেকে এর উৎপত্তি। তবে অরণ্য, গাছপালা বলতে যে ধরণের উদ্ভিদের কথা আমাদের মনে আসে, সমুদ্রের গাছপালা সে ধরণের নয়। অতি সরল-গঠনের প্রাণকোষ (cell) দিয়ে গঠিত এই উদ্ভিজ্জ মেরু অঞ্চল থেকে নিরক্ষীয় অঞ্চল পর্যন্ত সর্বত্র বিস্তারলাভ করেছে, অবশ্য কতক অঞ্চলে বেশি, কোন কোন অঞ্চলে কম। লোনাজল ও মিঠাজল সকল স্থানেই এদের অনুকূল পরিবেশ।
যেহেতু সারা জলমণ্ডল এদের রাজ্য, অ্যালজির গড়ন ও আকারে সংখ্যাতীত বৈচিত্র্য। কতক এত মিহি যে, অনুবীক্ষণ যন্ত্র ছাড়া খালি চোখে দেখা যায় না, তাদের অস্তিত্ব চোখে পড়ে একত্র বহুর সমাবেশ। আবার আমেরিকার প্রশান্ত মহাসাগর উপকূলে এমন অ্যালজি আছে যার কাণ্ড ভূ-পৃষ্ঠের অরণ্যের দীর্ঘতম বৃক্ষের চেয়েও দীর্ঘ ; কতকের আছে এমন পাতা যা তালপাতার চেয়েও চওড়া (প্রায় ৬ ফুট)। মজা হল, অ্যালজি যত বড়ই হোক, শিকড় দিয়ে মাটি বা পাথর থেকে খাদ্যরস সংগ্রহ করে না, সামান্য শিকড় মত অংশ কেবল তাকে নির্দিষ্ট স্থানে আটকে রাখে মাত্র। যারা সমুদ্রজলে ভাসমান তাদের কোন স্থানকে অবলম্বন করার প্রয়োজন হয় না। তাদের নিজেদের মধ্যে 'বন্ধনহীন গ্রন্থি'। একত্রে থাকে, নিজেদের দেহরঙে জল রঞ্জিত করে। লোহিত সাগরের নাম হয়েছে অ্যালজিদের লালরঙের দেহের জন্য যা

খালি চোখে পড়ে না কিন্তু সংখ্যা এত বেশি যে, সমুদ্রের জল লাল দেখায়। কোন অঞ্চলের সমুদ্রে এদের রঙ বাদামী, কোথাও এদের রঙ দেখে বলা যাবে কোন অঞ্চলে এদের আবাস।
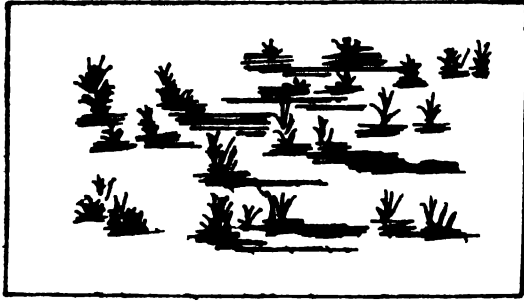
অ্যালজি (**algae**)

সূর্যকিরণের ওপর উদ্ভিজ্জের জীবন নির্ভরশীল। তাই যে অঞ্চলে সূর্যরশ্মি সাগরজলে যতদূর প্রবেশ করে ততদূরেই কেবল এদের অস্তিত্ব। উচ্চ অক্ষাংশে ১৫০ থেকে ১৮০ ফুট পর্যন্ত এবং নিরক্ষীয় অঞ্চলে যেখানে সূর্যকিরণ মোটামুটি লম্বভাবে পড়ে সেখানে ৩০০ থেকে ৬০০ ফুট গভীরেও অ্যালজি জন্মে।

* 'সারগাসো' সাগর

সমুদ্রের উষ্ণ অঞ্চলে সারগাসাম (**Sargassum**) নামে অ্যালজির সংখ্যা খুব বেশি। উপসাগরীয় স্রোত (**Gulf Stream**) এবং আটলান্টিক মহাসাগরে এই উদ্ভিজ্জের সমাবেশ প্রচুর। আমেরিকা অভিযানের সময় কলম্বাস সারগাসো সাগরে এই সাগর-উদ্ভিদের 'অরণ্যে' পড়েছিলেন। পালতোলা জাহাজ নিয়ে ঘন-সন্নিবিষ্ট অ্যালজি-প্রান্তর পার হয়ে যেতে তাঁকে বেগ পেতে হয়েছিল। এই উদ্ভিদ ভাসমান, মাটির সঙ্গে কোন সংযোগ নেই। বাদামি রঙের কোটি কোটি এই অ্যালজি একত্রে ভেসে থাকে। এদের দেহ-কাণ্ড থেকে অন্য অ্যালজি জন্ম নেয়।

উত্তর আটলান্টিক মহাসাগরের মাঝামাঝি ২০° ও ৩০° ডিগ্রি উত্তর অক্ষরেখা এবং ৭০° পশ্চিম দ্রাঘিমার মধ্যবর্তী উপবৃত্তাকার সামুদ্রিক অঞ্চল; যার মধ্যে উপসাগরীয় স্রোত ঘড়ির কাঁটার গতির মত অর্থাৎ বাঁ থেকে ডান পাকে ঘুরছে। বাদামী রঙের অ্যালজির সঙ্গে সাগরস্রোতে ভেসে আসা কিছু উপকূলের উদ্ভিদও

দলবদ্ধভাবে স্রোতচক্রের মধ্যে ভেসে বেড়ায়। ১৯১০ সনে মাইকেল সারস্ (**Michael Sars**) সামুদ্রিক অভিযানে সারগাসো সাগরের সীমানা এলাকা
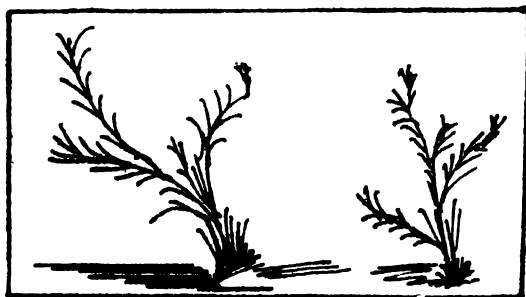
সারগাসাম অ্যাল্‌জি

নিরূপণ করা হয়েছিল। এই সমুদ্র উদ্ভিদের ভাসমান প্রান্তরের তলায় ঈলমাছের ডিম পাড়ার অঞ্চল বলে জানা গেছে। এখানকার জল নির্মল, উষ্ণ এবং লবণাক্ত।

* অ্যালজি কি কাজে লাগে ?

সাগরের উদ্ভিদ অ্যালজি জলের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে অক্সিজেন গ্যাস ছেড়ে দিয়ে জল নির্মল রাখে, ইহা ছোটবড় সাগর প্রাণীদের অনেকের খাদ্য। প্রশান্ত মহাসাগর-কুলে বাদামী অ্যালজি থেকে নানা রাসায়নিক পদার্থ, বিশেষ করে আয়োডিন প্রস্তুত করা হয়। আইসল্যাণ্ডের লোকেরা বহুকাল যাবৎ সাগর উদ্ভিদ জমির সাররূপে ব্যবহার করছে।

কতক সামুদ্রিক অ্যালজি মানুষের খাদ্যরূপেও ব্যবহৃত হয়। প্রাচ্য দেশেই এর চাহিদা বেশি। পরফিরা (**Porphyra**·) নামে লাল অ্যালজি জাপানে উপাদেয় খাদ্যবস্তু বলে আদৃত। শাকের মত ঝোল (**soup**] ও মিঠাইমন্ডা তৈরিতেও পরফিরা ব্যবহার করা হয়। বছরে বিক্রি হয় কয়েক লক্ষ ডলার মূল্যের জিনিস। কতক বিক্রি হয় টাটকা সব্জির মত, কতক রোদে শুকানো। জাপানী জেলেরা জোয়ার-ভাঁটা ক্ষেত্রে বিশেষ পদ্ধতিতে পরফিরা ধরে। ১৫ থেকে ২৫ ফুট গভীর সাগরজলে খুঁটির সঙ্গে দড়ির জাল টাঙিয়ে রাখে। জোয়ারের সঙ্গে অ্যালজি এসে জালের মধ্যে আটকে পড়ে, কতক ছিঁড়ে যায়। ছেঁড়া অংশ থেকেই নতুন অংশ গজায়, গাছগুলোর ব্যাস হয় কয়েক ইঞ্চি করে।

অ্যালজি থেকে প্রস্তুত খাদ্য, জাপানীদের কথায় যাকে বলা হয় কম্বু

[Kombu], তাদের প্রচলিত খাদ্যবস্তু। জেলেরা অ্যালজি সংগ্রহ করে এবং রোদে শুকিয়ে কারখানায় পাঠায়। সেখানে তা অল্প সিদ্ধ করে আবার শুকিয়ে নিয়ে কলে পিষে গুঁড়ো এবং পাঁপরের মত পাতলা রুটির আকার দেওয়া হয়। পরফিরা অ্যালজিতে শর্করা জাতীয় খাদ্য পদার্থ আছে।

* সমুদ্র নিয়ে গবেষণা

ব্রিটিশ নৌবিভাগ এবং রয়্যাল সোসাইটির যৌথ উদ্যোগে 'চ্যালেঞ্জার' (**H. M. S. Challenger**) নামক ২৩০৬ টনের কাঠের পালতোলা জাহাজ নিয়ে ১৮৭২ সনের ডিসেম্বর ৭ থেকে ১৮৭৬ সনের মে ২৬ পর্যন্ত পৃথিবীর সমুদ্র অঞ্চলে সমুদ্র ও সমুদ্রজীবন নিয়ে ব্যাপক গবেষণা পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালানো হয়। এত বিস্তৃত এবং পুঙ্খানুপুঙ্খ বাস্তব পরীক্ষাকার্য আগে আর কখনো হয়নি। গবেষণার লক্ষ্য ছিল সমুদ্রের তাপ, সমুদ্রস্রোত ও গভীরতা নিরূপণ, সাগরতলের কনটুর (**contour** —উঁচু-নিচু অবস্থান জ্ঞাপক) মানচিত্র প্রস্তুত করা। এজন্য পৃথিবীর বিভিন্ন সাগরের মাপজোপ এবং সামুদ্রিক জীবন সম্পর্কে গবেষণা চালানো হয়। পরবর্তী অভিযানগুলো আরো কিছু তথ্য সংযোজন করেছে কিন্তু পূর্ব-সংগৃহীত তথ্যের কোন পরিবর্তন ঘটেনি। সমুদ্র গবেষণার ক্ষেত্রে 'চ্যালেঞ্জার' অভিযান ঐতিহাসিক কৃতিত্ব অর্জন করেছে। ব্রিটানিকায় বলা হয়েছে ঃ

> **The scope and thoroughness op the expedition made it a landmark in the history of exploration.**
>
> **(vol 5, p. 242)**

স্যার জন মারে-র নেতৃত্বে 'চ্যালেঞ্জার' রিপোর্ট ৫০ খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে (১৮৮০-৯৫)।

আন্তর্জাতিক ভূ-বিজ্ঞান বর্ষে **International Geophysical Year (July 1,1957—Dec 31, 1959** ৩০ মাসব্যাপী গবেষণা ও অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে সমুদ্র সম্পর্কেও বহু তথ্য সংগৃহীত হয়। সমুদ্রবিজ্ঞানের বিশেষ কমিটি (**Special Committee on Oceanic Research**) ভারতমহাসাগরে নিবিড় গবেষণা চালায় যার ফলে সাগরে প্রাপ্তিযোগ্য ধাতুপিণ্ড (**nodules**) সম্বন্ধে অনেক তথ্য জানা যায়। ভারত মহাসাগরের তলদেশের আলোকচিত্র থেকে সমতলের ওপর বালুকণার তরঙ্গাকৃতি চিহ্ন দেখে স্রোতের অস্তিত্ব স্পষ্ট বোঝা যায়।

* গবেষণা কার্য

সমুদ্র বিবিধ সম্পদের আকর। বৈজ্ঞানিক উপায়ে সমুদ্রের স্বরূপ জানা এবং

তার অভ্যন্তরস্থ সামগ্রী আহরণ করার উদ্দেশ্য নিয়ে পৃথিবীর নানা দেশে রীতিমত গবেষণা কার্য চলেছে। টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ে সমুদ্র গবেষণা সংস্থা গঠিত হয় ১৯৬২ সনে। অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যাণ্ডেও গবেষণাকেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে। ভারতে অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয় ওয়ালটেয়ারে সমুদ্র বিজ্ঞানের গবেষণা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করে উদ্যমের সঙ্গে কাজ শুরু করেছে। ইন্দিরা গান্ধীর অনুপ্রেরণায় ভারত সরকারের সামুদ্রিক গবেষণা বিষয়ক বিভাগ স্থাপিত হয়, যার তৎপরতার উল্লেখনীয় কৃতিত্ব হল দক্ষিণ মেরুতে সামুদ্রিক অভিযান এবং 'দক্ষিণ গঙ্গোত্রী' গবেষণাকেন্দ্র গড়ে তুলে বিবিধ গবেষণামূলক কাজের সূত্রপাত। ভারত মহাসাগর ভারতের পক্ষে প্রাণস্বরূপ ; সমুদ্র-অনুরাগী হওয়া এবং সমুদ্রকে জানা শুধু জ্ঞানের জন্য নয়, জাতীয় স্বার্থেও আবশ্যক।

* জোয়ার-ভাঁটা কী ?

জোয়ার ভাঁটাকে বলা যায় সাগরের নিয়মিত ডন-বৈঠক। প্রতিদিন নির্দিষ্ট সময় অন্তর ভূ-পৃষ্ঠের জলরাশি এক এক স্থানে ধীরে ধীরে স্ফীত হয়ে ওঠে এবং এক এক স্থানে ধীরে ধীরে অবনমিত হয়। চন্দ্র ও সূর্যের আকর্ষণে জলের এই নিয়মিত ওঠাকে জোয়ার এবং নামাকে ভাঁটা বলে। অদৃশ্য এক বিরাট শক্তি কেমন দুর্নিবারভাবে পৃথিবীর ওপর কাজ করছে তা প্রত্যক্ষ করা যায় সাগর-জলের ওপর তার প্রভাব দেখে। সমুদ্রের জল ধীরে ধীরে কিন্তু অপ্রতিরোধ্যভাবে উপকূল বরাবর বাড়তে থাকে ; মনে হয় কড়াইতে জ্বাল দেওয়ার সময় দুধ যেমন ফেঁপে ফুলে ওঠে, সমুদ্রের বিশাল কড়াইতে জল তেমনি উথলে উঠছে, আবার নির্দিষ্ট সময় অন্তর জল সরে যায়। সমগ্র সমুদ্র পৃষ্ঠকে এভাবে টেনে তুলতে ও নামিয়ে দিতে পারে যে শক্তি, তার খেলা দেখে মানুষ নিজেকে যেন নেহাৎ তুচ্ছ মনে করে।

* জোয়ার কেন হয় ?

চন্দ্র সর্বদা পৃথিবীকে আকর্ষণ করছে, যেমন পৃথিবীও আকর্ষণ করছে চাঁদকে। ফলে যখনই পৃথিবীর জলভাগ চাঁদের মুখোমুখি আসে, ধরণীর জলভাগ, যা কিনা স্থূলপদার্থের চেয়ে ঢিলা, চাঁদের টানে স্তূপাকার হয়ে ওঠে। যেহেতু পৃথিবী পশ্চিম থেকে পূবে পাক খেয়ে ঘুরছে, স্ফীত জল চাঁদের অনুসারী হয়ে পূর্ব থেকে পশ্চিমদিকে চলে। কল্পনা করা যায়, চন্দ্র আকাশ পথে চলছে, সাগরজল তাকে স্পর্শ করার জন্য উদ্দাম হয়ে ছুটে চলেছে সঙ্গে সঙ্গে। এ হল চন্দ্রের সোজাসুজি জোয়ার (direct tide)। চন্দ্রের সোজা স্থানে যেমন জোয়ার হয় তার বিপরীত স্থানে অর্থাৎ পৃথিবীর ওপিঠেও তখন জোয়ার হবে, কারণ

চাঁদের টানে পৃথিবী তার জল-অংশ থেকে একটু সরে আসে বলে সেখানকার জল যেন ঝুলে পড়ে ; এটা হল বিপরীত জোয়ার (**opposite tide**) ।

* ভরা কটাল, মরা কটাল কি ?

চন্দ্র ও সূর্যের আকর্ষণই জোয়ার-ভাঁটার মুখ্য কারণ। এর মধ্যে চন্দ্রের আকর্ষণই বেশি প্রবল, কারণ যদিও সূর্য তার চেয়ে অনেক বড় কিন্তু চন্দ্র আর পৃথিবীর মধ্যে যে দূরত্ব, সূর্যের দূরত্ব তার চেয়ে ৪০০ গুণ বেশি। কাজেই বাড়ির কাছের চাঁদের টানটাই সূর্যের টানের চেয়ে দ্বিগুণ হয়ে দেখা দেয়।
এরা উভয়ে যখন পৃথিবীর সাথে একই সরলরেখায় অবস্থান করে—যেমন হয় অমাবস্যাও পূর্ণিমা তিথিতে—তখন সাগরজল বেশি স্ফীত হয়ে ওঠে। জলের অধিক স্ফীতিকে বলা হয় ভরা কটাল (**spring tide**)। অষ্টমী তিথিতে চন্দ্র পৃথিবী ও সূর্য সমকোণে থাকে বলে পৃথিবীর ওপর উভয়ের আকর্ষণের বেগ কমে যায়। ফলে জলের স্ফীতিও হয় কম। একে বলা হয় মরাকটাল (**Neap tide**)। **Neap** কথাটি প্রাচীন ইংরেজিতে বোঝাত 'নিচু' (**low**)।
প্রত্যেক মুখ্য বা গৌণ জোয়ারের পরবর্তী মুখ্য বা গৌণ জোয়ার ২৪ ঘন্টা ৫২ মিনিট পরে আসে।

* কত উঁচু জোয়ার ?

জোয়ারের স্ফীতি পৃথিবীর সর্বত্র সমান নয়। ভূমধ্যসাগরে এর উচ্চতা ১ ফুটের বেশি হয় না ; অন্য দিকে নোভা স্কশিয়ার ফান্ডি উপসাগরে জোয়ার জলের ওঠা-নামা ৫০ ফুটের বেশি হয়ে থাকে। সমুদ্রে ধাবমান স্ফীত জল যখন কুলে নদীর মোহানায় বা উপসাগরে ঢুকে পড়ে সেখানে প্রতিহত জল অতিমাত্রায় ফেঁপে ওঠে। শুধু সাগর নয়, বড় হ্রদেও জোয়ার-ভাঁটা খেলে। উত্তর আমেরিকার বড় হ্রদগুলিতে জলের ওঠা-নামা ২ ইঞ্চি মত লক্ষ্য করা গেছে। শুনতে অদ্ভুত মনে হলেও একথা সত্য যে, আমাদের ছাদে যে জলের চৌবাচ্চা রয়েছে চাঁদ তার ওপর দিয়ে যাওয়ার সময় সে-জলেও 'টান' দিয়ে যায় যদিও তা এত ক্ষীণ যে বোঝা যায় না।

* বান (**Tidal bore**)

নদীতে সাগরের জোয়ার প্রবেশকে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—'সিন্ধুর বিজয়রথ পশিল নদীতে, আসিল জোয়ার।' উত্থিত জলরাশি সরু নদীপথে প্রবেশকালে ফেনা মাথায় নিয়ে কলগর্জনে যখন ধেয়ে আসে, তাকে বিজয় বাহিনীর মতই মনে হয়। বর্ষাকালে ভরা কটালের সময় সমুদ্র থেকে আগত জোয়ারের জল সংকীর্ণ নদীপথ

দিয়ে অগ্রসর হতে থাকলে নদীপ্রবাহিত জলের সঙ্গে সংঘর্ষ হয়। কিন্তু জোয়ারের জোর বেশি বলে তার ধাক্কায় নদীজল ১০।১২ ফুট উঁচু দেওয়ালের মত নদীপথে ফিরে আসে। একে বলি বান। ভাদ্র-আশ্বিন মাসে হুগলী নদীর ষাড়াষাড়ি বান দর্শনীয়। অন্য সময়েও পূর্ণিমা ও অমাবস্যা তিথিতে হুগলী নদীর বানের সতর্কবার্তা সংবাদপত্র ও বেতার মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হয়। সমুদ্র যেন প্রতি মাসে দেশের মধ্যে কিছুটা এগিয়ে এসে বড় নদীগুলির সঙ্গে দেখা করে যায়।

* জোয়ার-ভাঁটার ফল কী ?

জোয়ার-ভাঁটায় জলের যে আলোড়ন হয় তার প্রভাব পড়ে সাগরে-পতিত বড় নদীগুলির ওপর। দেশের ভিতর থেকে যে পলিমাটি ও আবর্জনা নদীর স্রোতের সঙ্গে এসে মোহানায় জমা হয়, জোয়ার-ভাঁটার ফলে তা অপসারিত হওয়ায় নদীকূল মুক্ত থাকে। এমন অনেক নদী-বন্দর আছে যেখানে জোয়ারের সময় স্ফীত জলে ভেসে সমুদ্রগামী বড় জাহাজ নদীপথে এগিয়ে আসে; জোয়ার-ভাঁটার দরুণ নদীর মোহানায় সহজে চড়া পড়ে না। এগুলি হল প্রত্যক্ষ ফল।
জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা একটি সুদূরপ্রসারী সূক্ষ্ম ফলের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। ভূপৃষ্ঠের বিপুল পরিমাণ জলকে চন্দ্র যেভাবে প্রতিনিয়ত আকর্ষণ করছে তার ফলে পৃথিবীর আবর্তন গতির ওপর পিছু-টান (**drag**) সৃষ্টি হচ্ছে। অবশ্য সেই টান অতি নগণ্য। একটি বিক্ষিপ্ত কামানের গোলাকে মাকড়সার একটি সুতো দিয়ে টেনে ধরার মতন। তবু লক্ষ লক্ষ বছর ক্রমাগত এমনি প্রতিবন্ধক হতে থাকলে শেষ পর্যন্ত পৃথিবীর আবর্তন-বেগ কিছুটা শিথিল হবে। তার ফল কী হতে পারে ? হয়ত চাঁদ আস্তে আস্তে পৃথিবী থেকে দূরে সরে যাবে। সমুদ্রে জোয়ারের বেগও কম হতে থাকবে। সেরূপ অবস্থা হবে পৃথিবীর জীবনে বিরাট পরিবর্তনের সূচক।

* সাগরের ঢেউ কিভাবে হয় ?

বায়ু না থাকলে ঢেউ-এর উদ্ভব হবে না। শান্ত জলক্ষেত্রের ওপর সামান্য বাতাস বইতে সুরু করলে তা জলের ওপর বাধা পায়, জেগে ওঠে স্পন্দন-স্বরূপ ছোট ছোট বীচিমালা। তাতে বাধা পেয়ে বাতাস তো ফিরে যায় না, বরং তাদের ঠেলে ডিঙিয়ে এগিয়ে যেতে চায়, উৎপত্তি হয় ক্রমশঃ বড় আকারের ঢেউ। বায়ুর শক্তি (**energy**) ঢেউ-এর শক্তিতে রূপান্তরিত (**transferred**) হয়; সাগর যেন জেগে ওঠে। যখন প্রবল বাতাস বহুক্ষণ ধরে প্রবাহিত হয়,

সাগর তরঙ্গবিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। ছোট আয়তনের সাগরে এবং ছোট হ্রদে তরঙ্গের উচ্চতা খুব বেশি হয় না। বিস্তৃত সমুদ্রে প্রবল বায়ুর তাড়নায় ৫৫ ফুট উঁচু ঢেউ দেখা গেছে। এটাই সঠিকভাবে নিরূপিত সর্বোচ্চ ঢেউ। এরূপ ঢেউ উৎপন্ন করতে ৫০০ মাইল বিস্তৃত সমুদ্রবক্ষের ওপর দিয়ে ঘণ্টায় ৬০ নটিক্যাল মাইল বেগে বাতাস টানা ২৪ ঘণ্টা প্রবাহিত হওয়া চাই।

* ঢেউ-এর মাপ

জলের ওঠা-নামা হল ঢেউ ; তা কতখানি উঁচু, কতখানি লম্বা কেমন করে মাপা
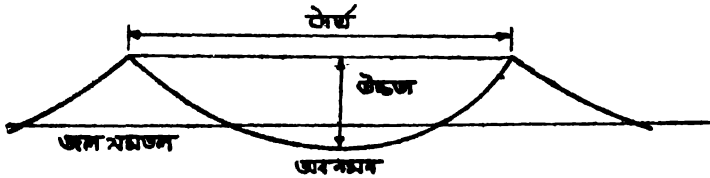
হবে ? কার্ল একার্ট (Carl Eckart) ১৯৫৩ সালে ঢেউ পরিমাপ করার গাণিতিক পদ্ধতি দেখান এই ভাবে ঃ
দুটি ঢেউ-শীর্ষের মধ্যবর্তী দূরত্ব হল ঢেউ-এর দৈর্ঘ্য, দুটি ঢেউ-এর মাঝখানে জল যতখানি নিচু হয়ে 'উপত্যকা' সৃষ্টি করে সেখান থেকে শীর্ষ পর্যন্ত উচ্চতাকে ধরা হয় ঢেউ-এর উচ্চতা।
সমুদ্রের ওপর যখন বিভিন্ন দিক থেকে এলোমেলো জোর বাতাস বইতে থাকে তখন যে ধরণের পাগলা ঢেউ-এর মাতামাতি হয় তার মধ্যে পড়লে জাহাজের বিপদ ঘনিয়ে আসে।

* দীর্ঘ তরঙ্গ (Swell)

দীর্ঘতরঙ্গ সমুদ্রের এক বিস্ময়কর ব্যাপার, মহাশক্তিধর জলধির পক্ষেই তা সম্ভব। ঝটিকায় যে ঢেউ-এর উদ্ভব, তা জন্মক্ষেত্র থেকে দীর্ঘপথ-যাত্রায় সমুদ্রের ওপর দিয়ে তরঙ্গায়িত হয়ে চলতে থাকে ; পথে যা কিছু এর সামনে পড়ে তা চূর্ণ করে ফেলে। ঝটিকাকেন্দ্র থেকে দূরত্ব বাড়তে থাকলে ক্রমশঃ এর প্রচন্ডতাও কমে আসে। ১৮৪৬ সনে আইসল্যান্ডের অ্যাসেনসন (Ascension Island) দ্বীপের কাছে উৎপন্ন দীর্ঘতরঙ্গ পথে ১৩ খানা নোঙর-করা জাহাজ উপড়ে ছিঁড়ে নিয়ে ডুবিয়ে দিয়ে দক্ষিণ দিকে প্রায় ৪ হাজার মাইল প্রবাহিত হয়ে বিষুবরেখা অতিক্রম করে গিয়েছিল। তার গতিবেগ ছিল ঘন্টায় ৬৯ নটিক্যাল মাইল, প্রতিটি তরঙ্গের দৈর্ঘ্য প্রায় আধমাইল। উত্তমাশা অন্তরীপের কাছে আটলান্টিক মহাসাগরে উৎপন্ন আর এক তরঙ্গ সাগর পাড়ি দিয়ে ব্রাজিলের রিও-ডি-জ্যানিরোর কূলে গিয়ে

আছড়ে পড়েছিল। এর এক একটি দৈর্ঘ্য ছিল প্রায় ¾ মাইল, গতিবেগ ঘন্টায় ৮৪ নটিক্যাল মাইল।

* রুদ্রতরঙ্গ

ঝটিকা থেকে উৎপন্ন দীর্ঘতরঙ্গ বিশাল অজগর দৈত্যের মত সমুদ্রের ওপর অবলীলায় হাজার মাইল পথ অতিক্রম করে যায়। কিন্তু রুদ্রতরঙ্গ অকস্মাৎ সমুদ্রের তলদেশ থেকে গর্জে উঠে তার দাপট চারিদিকে ছড়িয়ে দেয়। বাইরে থেকে প্রভঞ্জনের কশাঘাতে দীর্ঘতরঙ্গের উদ্ভব, রুদ্রতরঙ্গের উৎপত্তি সমুদ্রের ভিতর থেকে আকস্মিক প্রচন্ডতায়। সাগরতলে আগ্নেয়গিরির বিস্ফোরণ জীবন-ধ্বংসী তরঙ্গের জন্মদাতা।

১৮৮৩ সনে ক্রাকাতোয়া নামে ছোট একটা অগ্নিগিরি-দ্বীপ বিস্ফোরিত হয়ে প্রলয়ংকর কান্ড ঘটিয়েছিল। জাভা ও সুমাত্রার মধ্যে সুন্দা প্রণালীতে অবস্থিত ক্রাকাতোয়া হঠাৎ অগ্নি উদগীরণ সুরু করে। পাথরের খন্ড ও ভস্ম দ্বীপটির চতুর্দিকে ৩ লক্ষ বর্গমাইল জুড়ে ছড়িয়ে পড়ে, ভাসমান অগ্নিশিলা (pumice) দ্বীপের কাছাকাছি সমুদ্রে এমন পুরু হয়ে জমেছিল যে, তার স্তূপ ঠেলে জাহাজ চলাচল অসম্ভব হয়। আকাশ ভস্মস্তরে এমন অন্ধকার হয়েছিল যে, ২৭ আগষ্ট (উদগীরণের দিন) বাটাভিয়ায় দিনে প্রদীপ জ্বালাতে হয়। সেখান থেকে ৫0 মাইল দূরেও আড়াই দিন পর্যন্ত আকাশ অন্ধকার ছিল।

ক্রাকাতোয়া দ্বীপটি নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। এর বেগে সাগরে যে ঢেউ জেগে ওঠে তা উঁচু হয়েছিল ১২০ ফুট। সেই পাহাড় সমান ঢেউ জাভা ও সুমাত্রার উপকূলবর্তী অঞ্চলের ওপর এসে আছড়ে প'ড়ে ৩৬ হাজার লোক ভাসিয়ে নিয়ে যায়। জলস্তম্ভস্বরূপ এই ঢেউ পশ্চিম দিকে ধাওয়া করে প্রশান্ত মহাসাগর পার হয়ে দক্ষিণ আমেরিকার কুলে গিয়ে পেঁৗছেছিল।

দীর্ঘতরঙ্গ ও রুদ্রতরঙ্গ সমুদ্রের নিত্যকার ঘটনা নয়, একে বলা যায় প্রাকৃতিক নির্যাতনে সমুদ্রের তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া, প্রকৃতির কশাঘাতে সমুদ্রের তীব্র রোষের প্রকাশ। এরূপ ঘটনা বিরল না হয়ে মাঝে মাঝেই ঘটতে থাকলে সমুদ্রে মানুষের চলাচল অসম্ভব হয়ে উঠত।

* অদৃশ্য ঢেউ

সাগরপৃষ্ঠের ঢেউ সবারই চোখে পড়ে, কখনো তা ছোট, কখনো বা বড় কিন্তু নাবিকেরা জানে এমন ঢেউ আছে যা চোখে দেখা যায় না অথচ জাহাজের গতিবেগ কমিয়ে দেয়। মেরু অঞ্চলে যেখানে উষ্ণ ও তরল জল (উষ্ণ ও কম লবণাক্ত) প্রবাহ এবং ভারি (শীতল ও অতি-লবণাক্ত) প্রবাহ পাশাপাশি আসে তখন জলের

স্বাভাবিক ঘনত্বে পরিবর্তন ঘটে। এই পরিবর্তন দুই প্রকার জলের মাঝে ৫০ ফুট মত স্থান-বরাবর অদৃশ্য প্রাচীরের মত বিরাজ করে। আগেকার দিনের পালতোলা জাহাজ এরূপ স্থান অতিক্রম করার সময় তার গতিবেগ হারিয়ে ফেলত। বাতাস আছে, সাগরের ঢেউ-এর প্রতিবন্ধক নেই অথচ জাহাজ সহসা মন্থর হয়ে পড়ল! বিস্মিত নাবিকরা মনে করত জলের তলা থেকে কোন অজানা দৈত্য জাহাজ টেনে ধরেছে। আসল কারণ হল, এতক্ষণ জাহাজ যেরূপ জলের ভিতর দিয়ে চলছিল, জলের ঘনত্ব বেড়ে যাওয়ার ফলে তার বেগ কমে আসা স্বাভাবিক। এরূপ ঘন জলের প্রাচীর সাধারণত জাহাজ যতখানি জল 'ভেঙে' চলে তার চেয়ে কম গভীর হত না। জলের মধ্যে দিয়ে চলতে চলতে কোন নৌকাকে যদি তরল কাদার মধ্য দিয়ে চালানো হয় তবে তার গতিবেগ কমে যাবে, ভারি জলের বেড়া পার হয়ে যেতেও জাহাজের এই অবস্থা হত। ওপর থেকে কোন কিছু বুঝতে না পাওয়ায় নাবিকদের কাছে জাহাজ 'টেনে ধরাকে' ভীতিকর বলে মনে হত।

* ঢেউ-এর রূপান্তর

জলপৃষ্ঠের বায়ুর তাড়নায় ঢেউ-এর সৃষ্টি। অকস্মাৎ প্রচন্ড ঝড়ের তান্ডবে সমুদ্রে যে ঢেউ-এর উদ্ভব তা বহুদূর পর্যন্ত চলে যায়। সমুদ্রের ওপর দিয়ে এরূপ ঢেউ-এর নিয়মিত গতিময় ওঠানামা দীর্ঘতরঙ্গ (Swell) নামে পরিচিত। যখন এর পরিসমাপ্তি ঘটে দেশের উপকুলে, তখন ঢেউ-এর চেহারায় পরিবর্তন ঘটে। সাগরকুলে দাঁড়ালে ঢেউ-এর রূপান্তর দেখা যাবে। কি রকম ?
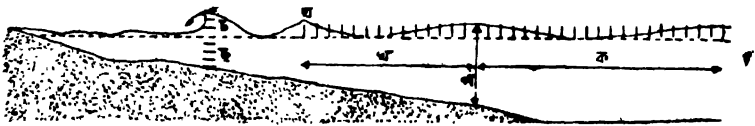
সমুদ্রের ঢেউ ভেঙ্গে পড়ছে

(ডটেড লাইন ঢেউয়ের তল) গভীর জলে ফুলে ওঠা সমুদ্রের জলের উচ্চতা হয় লম্বায় ২০ ভাগের ১ ভাগ (ক) কম গভীর জল ঢেউয়ের পরে (খ) জলের গভীরতার দুগুণ (গ) ঠেলে উঠা ঢেউয়ের শীর্ষ (ঘ) শীর্ষ ভেঙ্গে পড়ে যখন, উচ্চতা দাঁড়ায় (চ) তখন এর গভীরতা থাকে ৩ থেকে ৪ ভাগ বেশী।

ঢেউ দীর্ঘায়িত তরঙ্গের আকারে সাগরের ওপর দিয়ে যখন তীরে ঝাঁপিয়ে পড়তে যায় তখন তার ঢেউ-মাথা সরু হয়ে ওঠে, মাথায় ফেনা নিয়ে তীরের দিকে ছুটে

আসে বিশাল সাপের ফণার আকারে। সবশেষে তীরে ফেণার স্তবক বিছিয়ে দেয়। পুরী বা দীঘার সমতল সাগরবেলায় সাগরের এই ফেণার্ঘ্য নিবেদন দেবতার পায়ে কুসুমাঞ্জলির মতই মনে হবে, কিন্তু সাগরতট যেখানে পাষাণময় প্রাচীরের মত হয়ে ঢেউ প্রতিরোধ করে সেখানে সমুদ্র ধরিত্রীর পায়ে পুষ্প বিছিয়ে দেয় না, জলমুগুরের আঘাত হানতে থাকে নিরন্তর, নির্মমভাবে।

* ঢেউ-এর আঘাত

দীর্ঘতরঙ্গ চলার সময় কোথাও প্রতিরোধ না পেলে সমুদ্রের মধ্যে আপন প্রতাপ প্রদর্শন করে ক্ষান্ত হয় কিন্তু ঢেউ যখন দেশের উপকূলে আঘাতের পর আঘাত হানতে থাকে তার হাত থেকে নিস্তার নেই। সমুদ্রের তীরবর্তী দেশগুলিতে সমুদ্র প্রতিনিয়ত ভূমি অধিকার করে নিচ্ছে। প্রতি বছর ইংল্যান্ডের ১৫শো একর জমি সাগর গ্রাস করে। এ মাটি কোমল নয়; বড় বড় চাঁই পাথর। ঢেউ-এর আঘাতে আঘাতে এগুলো বালুকণায় পরিণত হয়। পাহাড়ময় উপকূলে ঢেউ-এর আক্রমণের প্রমাণ প্রত্যক্ষ করা যায়। লক্ষ লক্ষ বছর ধরে অবিরাম আঘাতের ফলে কঠিন পাষাণ ক্ষয়ে গেছে, ছিন্নমূল গাছের মত ভেঙে পড়েছে; কতক এখনো ক্ষতবিক্ষতদেহে আক্রমণ সহ্য করে চলেছে। অবশেষে একদিন তাদেরও লুটিয়ে পড়তে হবে।

* সমুদ্রজলে কি কি উপাদান আছে?

প্রতি ১,০০০ পরিমাণ ওজনের সাগরজলে গড়ে রয়েছে ৯৬৫'১ ভাগ জল এবং ৩৪'৯ ভাগ লবণ। জলে আছে ১০৮ ভাগ হাইড্রোজেন এবং ৮৫৭'১ অংশ অক্সিজেন। এ ছাড়া লবণের রাসায়নিক সংমিশ্রণের মধ্যে রয়েছে প্রধানতঃ সালফার, কার্বন ও বোরনের সঙ্গে ১'৯ ভাগ অক্সিজেন ও সামান্য পরিমাণ হাইড্রোজেন। দ্রব গ্যাসের মধ্যেও কিছু পরিমাণ অক্সিজেন থাকে।
একটি চার্টে সাগরজলের উপাদান ও তার সূক্ষ্ম পরিমাণ বিশ্লেষণ দেখান হল।

সমুদ্রের অপরিহার্য অংশ [প্রতি ঘন মাইলে]

অক্সিজেন	৩,৬০৪,০০০,০০০ টন
হাইড্রোজেন	৪৫৪,৪০০,০০০ টন
ক্লোরাইন	৭৯,৯১০,০০০ টন
সোডিয়াম	৪৪,২০০,০০০ টন
ম্যাগনেসিয়াম	৫,৪৭০,০০০ টন
সালফার	৩,৭৮৬,০০০ টন
ক্যালসিয়াম	১,৬৭৯,০০০ টন
পটাসিয়াম	১,৫৯৯,০০০ টন

সমুদ্রের অপরিহার্য অংশ [প্রতি ঘন মাইলে]

ব্রোমাইন	২৭৩,২০০ টন
কার্বন	১১৭,৯০০ টন
স্ট্রোনটিয়াম	৩৩,৬৬০ টন
বোরোন	২০,১৮০ টন
সিলিকন	১২,৬২০ টন
ফ্লোরাইন	৫,৪৭০ টন
আর্গন	২,৫২৫ টন
নাইট্রোজেন	২,১০০ টন
লিথিয়াম	৮৪০ টন
রুবিডিয়াম	৫০৫ টন
ফসফরাস	২৯৫ টন
আইডিন	২১০ টন
ইনডিয়াম	৮৪ টন
জিঙ্ক	৪২ টন
লোহা	৪২ টন
অ্যালুমিনিয়াম	৪২ টন
মলিবডেনাম	৪২ টন
বেরিয়াম	২৬ টন
সীসা	১২ টন
টিন	১২ টন
তামা	১২ টন
আর্সেনিক	১২ টন
প্রোটেকটিনিয়াম	১২ টন
সিলেনিয়াম	১২ টন
ভ্যানেডিয়াম	৮·৪ টন
ম্যাঙ্গানিজ	৮·৪ টন
টিটানিয়াম	৪·২ টন
থোরিয়াম	২·৯ টন
ক্যাজিয়াম	২·১ টন
এ্যান্টিমনি	২·১ টন
কোবাল্ট	২·০ টন
নিকেল	২·০ টন

সমুদ্রজলের উপাদান (প্রতি ঘন মাইলে)

শিরিয়াম	১'৬ টন
ইট্রিয়াম	১'২ টন
রূপা	১'২ টন
ল্যাঙ্গানাম	১'২ টন
ক্রাইপটন	১'২ টন
নিয়ন	১'২ টন
বিসমাথ	১.৮৮৫ পাউণ্ড
টাঙ্গস্টান	৯৪০ পাউণ্ড
জেনন	৯৪০ পাউণ্ড
জারাম্যানিয়াম	৫৬৫ পাউণ্ড
ক্যাডমিয়াম	৫১৮ পাউণ্ড
ক্রোমিয়াম	৪৭০ পাউন্ড
স্ক্যানডিয়াম	৩৭৭ পাউন্ড
পারদ	২৮০ পাউন্ড
গ্যালিয়াম	২৮০ পাউন্ড
টেলারিয়াম	৯৪ পাউন্ড
নিওবিয়াম	৪৭ পাউন্ড
হিলিয়াম	৪৭ পাউন্ড
সোনা	৩৮ পাউন্ড
র‍্যাডিয়াম	'০০০৩ পাউন্ড
র‍্যাডন	'০০০০০০৯ পাউন্ড

সমুদ্রের ভয়ঙ্কর প্রাণী

পৃথিবীর মোট আয়তনের দশ-সপ্তমাংশের বেশি স্থান জুড়ে সমুদ্র। স্থলে যে পরিমাণ জীবের বাস, জলে সেই আয়তনের অনুপাতে তার হিসাব করা দুরূহ। শুধু এইটুকু বলা যায়, সমুদ্রের ওপর থেকে নিচস্তর পর্যন্ত সর্বত্র জীবের বাস-অঞ্চল। এমন কি, প্রতি বিন্দু জলেও জীবনের অস্তিত্বের সন্ধান পাওয়া যাবে। বসুন্ধরা জীবধাত্রী—একথা আক্ষরিক অর্থেও সত্য। স্থলের মত জলেও কতক প্রাণী মানুষের মিত্র, কতক নিরপেক্ষ, কতক শত্রু। এই শত্রুদের চার ভাগে ফেলা হয়—

১. যারা কামড়ায়। এদের প্রধান হল হাঙ্গর।
২. যারা হুল ফোটায়। এরা মানুষের দেহে বিষ ঢুকিয়ে দিয়ে বিপদ ঘটায়।
৩. যারা বিষাক্ত। মানুষের শরীরে এদের বিষ প্রবেশ করলে অথবা এদের ভক্ষণ করলে এদের দেহস্থিত বিষাক্ত পদার্থ মানুষের অসাধারণ যন্ত্রণা বা মৃত্যু ঘটায়।
৪. যারা বিদ্যুৎবাহী। এদের দেহজাত বিদ্যুৎপ্রবাহ স্পর্শমাত্র মানুষের জীবন নাশ করতে পারে।

হাঙ্গর

ডাঙ্গায় যেমন নরখাদক বাঘ, সমুদ্রে তেমনি মানুষখেকো হাঙ্গর। এদের মত ভয়ংকর হিংস্র প্রাণী সাগরে দ্বিতীয়টি নেই। বাঘও হিংস্র এবং চতুর; বাঘের চেয়ে হাঙ্গর অনেক গুণ বড় এবং শক্তিশালী। অতি প্রাচীনকালেও মানুষ হাঙ্গরের আক্রমণ থেকে বিপদ সম্বন্ধে সচেতন ছিল। গ্রীক মনীষী অ্যারিস্টটল (৩৮৪-৩২২ খ্রীঃ পূঃ) হাঙ্গরের দেহগঠন ও স্বভাবের বিবরণ লিখেছেন। রোমান জীববিজ্ঞানী প্লিনি (খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দী) হাঙ্গরের স্বভাব বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছেন, স্পঞ্জ-সংগ্রহকারী ডুবুরিদের সাগরের গভীর অংশ অপেক্ষা

ওপর স্তরেই হাঙ্গরের আক্রমণের আশংকা বেশি। আধুনিককালের সমুদ্র-বিজ্ঞানী ও গবেষকেরা একথার সত্যতার প্রমাণ পেয়েছেন।
জীব-বিজ্ঞানীর হিসাবে ২৫0 জাতের হাঙ্গর বর্তমান। এদের মধ্যে ৩৯টি প্রজাতি নরখাদক বলে চিহ্নিত। তবু অন্য গোষ্ঠীর হাঙ্গরেরাও মানুষের ভীতি উৎপাদন করে থাকে, কারণ এই বিরাট রহস্যময় জীবের আচরণ সম্পর্কে কেউই নিশ্চিত নিরাপত্তার গ্যারান্টি দিতে পারে না।

* হাঙ্গরের দেহ

মাছ ও অন্যান্য মেরুদন্ডী প্রাণীর সঙ্গে হাঙ্গরের পার্থক্য তার দেহের গড়ন ও কাঠামোতে। হাঙ্গরের দেহাস্থি শক্ত bone নয়, কোমলাস্থি (cartilage] দিয়ে গঠিত। নমনীয় অথচ দৃঢ়, বেতের চাবুকের মত অস্থি-কাঠামোর ওপর শক্তিশালী মাংসপেশী, চওড়া বৈঠার মত সামনের দুখানা পাখনা, দীর্ঘ প্রশস্ত অর্ধচন্দ্রাকৃতি খাড়া লেজ, স্ট্রিমলাইন-করা দেহ। জলে স্বচ্ছন্দবিহারক্ষম পুঞ্জীভূত-শক্তিসম এই হিংস্র প্রাণীটি সমুদ্রের দুরন্ত সন্তান। লড়াই ক'রে জয়ী হওয়ার জন্যই যেন তার দেহের পরিকল্পনা এবং তাতে উপযুক্ত হাতিয়ার যুক্ত করা হয়েছে। তার আক্রমণের অস্ত্র অদ্ভুত রকমের দাঁত ; শত্রুকে ছিন্নভিন্ন করতে এমন মারাত্মক অস্ত্র আর কোন প্রাণীর নেই।
বেশির ভাগ প্রজাতির মুখটি মাথার নিচে বেশ খানিকটা পিছিয়ে ; নাক এবং ভারি মাথা যেন এগিয়ে গেছে। মুখের অবস্থান নিচের দিকে হওয়াতে এই ধারণার সৃষ্টি হয় যে, কামড়ানোর বা শিকার-খাদ্য ধরার সময় হাঙ্গারকে চিৎ হয়ে বা কাৎ হয়ে তা মুখে পুরতে হয়। কিন্তু তা ঠিক নয়। হাঙ্গর সাধারণতঃ জলের তলার দিক দিয়ে এসে শিকার ধরে, তখন হাঁ করলে শিকারকে ওপরের চোয়ালের নিচে একেবারে মুখের মধ্যে নিতে পারে। একবার জাঁতিকলের মত দাঁতপাটির নিচে ধরতে পারলে শিকার যত শক্তিশালীই হোক, তার নিস্তার নেই। হাঙ্গরের আরেকটি বৈশিষ্ট্য, এর চোয়াল মাথার সঙ্গে সংযুক্ত নয়, শিকারকে আয়ত্তে আনতে হাঙ্গর তার দাঁতশুদ্ধ চোয়াল এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে, ফলে যত বড় হাঙ্গর প্রায় ততবড় আকারের শত্রুকেও মুখে পুরে উদরে চালান করে দেওয়া তার পক্ষে সম্ভব। বিরাট আকারের খাদ্য পাকস্থলীতে ধরবে তো ? হাঙ্গরের সে সমস্যা নেই। তার পাকস্থলীর এমন গঠন যে, প্রয়োজনে তা প্রায় দ্বিগুণ বেড়ে যেতে পারে। আর একটি বৈশিষ্ট্য এই, পাকস্থলীকে ভাঁড়ার হিসাবে ব্যবহার। বেশি খাদ্য পাকস্থলীতে এসে গেলে তখনি সবগুলি হজম করার প্রয়োজন নেই। খাদ্যের কিছু অংশ কয়েক সপ্তাহের জন্য ফ্রিজে রাখার মত জমিয়ে রাখা যায়। বাইবেল কাহিনীতে আছে সাগরে জাহাজ ডুবি হলে

সাধু জোনাকে [St. Jonah] এক তিমি গিলে ফেলে এবং পরে তাঁকে পেট থেকে উগরিয়ে বের করে দেয়। কতক জীব-বিজ্ঞানীর ধারণা, জোনা যার উদরে স্থান পেরেছিলেন সেটি তিমি নয়, বড় হাঙ্গর।

হাঙ্গরের ক্ষিদে এবং ভোজন ক্ষমতা কেমন, তার পরিচয় তথ্য জানা গেছে। কোন বস্তু সামনে পেলেই হল, তা জীবিত কি মৃত, প্রাণী কিংবা নিষ্প্রাণ অখাদ্যবস্তু হাঙ্গরের সেসব বাদ-বিচার নেই। অস্ট্রেলিয়ার এক জাহাজঘাটার কাছে বিকৃত এক হাঙ্গরের পাকস্থলীতে পাওয়া গেল এক শুয়োরের আধা-শরীর, মেষের কয়েকখানি পা, এক বুলডগের সামনের পা দুখানি সহ মাথা, তার গলায় বাঁধা দড়ি; কিছু ঘোড়ার মাংস এবং জাহাজের খোল ঘসার যন্ত্র। আড্রিয়াটিক সাগরে ধৃত এক হাঙ্গরের উদর থেকে বের হয় তিনটি ওভার কোট [কোটের মালিকরা ছিল না], একটি বর্ষাতি, একটি মোটরের লাইসেন্সযুক্ত ধাতব প্লেট। হাঙ্গরের খাদ্যের উপকরণ দেখে বোঝা যায়, প্রাপ্তিমাত্রেন ভোক্তব্যং—যা পাও খেয়ে ফেল—এই যেন তার নীতি। মানুষ তো নিশ্চয়ই সুখাদ্য হবে; এছাড়া খাদ্যবস্তুতে পরিণত হয় ডলফিন, সামুদ্রিক কচ্ছপ, সিন্ধুঘোটক, পাখি, মাছ ও যে কোন স্থলচর জন্তু তা যদি জলে নামে বা জলে পড়ে যায়। হাঙ্গরের স্বাভাবিক বন্ধু কেউ নেই, তাকে কাবু করতে পারে এমন শত্রুও নেই। ঘাতক তিমি [killer whale] ও তরোয়াল মাছ [sword fish] হাঙ্গর দেখতে পেলে তাড়া করে সাহসের পরিচয় দেয় কিন্তু হাঙ্গর ছুটে পালাতে চাইলে দৌড়পাল্লায় তার সঙ্গে এরা এঁটে উঠতে পারে না। হাঙ্গরের প্রাণ যায় তার জাতভাইদের হাতে। বৃদ্ধ বা অসমর্থ হয়ে পড়লে অন্য হাঙ্গরেরা জ্ঞাতির দেহ ভোজ্যবস্তু করে নিতে দ্বিধাবোধ করে না।

* হাঙ্গরের দাঁত

হাঙ্গরের দাঁতের মত অদ্ভুত মারণ-অস্ত্র অন্য কোন প্রাণীর নেই। এগুলি যেন জীবন্ত বিষবৃক্ষ। অন্যান্য প্রাণীর দাঁত চোয়ালের সঙ্গে মূল শিকড় দিয়ে আটকানো। ক্ষয় হয়ে গেলে বা পড়ে গেলে আর কোন নতুন দাঁত গজায় না, সে স্থানটা ফাঁকাই থাকে। কিন্তু হাঙ্গরের দাঁত চোয়ালে প্রোথিত নয়, মাড়ির মধ্যে সারিসারি বসানো—৪ থেকে ৬ সারি, কোন কোন প্রজাতির ২০ সারি পর্যন্ত। ক্ষুরধার তীক্ষ্ম দাঁত যত বেড়ে ওঠে ততই সামনের দিকে এগিয়ে যায়। ক্ষয় হয়ে গেলে সেখানেই আবার নতুন করে গজায়।

হিসাব করে দেখা গেছে একটা টাইগার হাঙ্গর [Tiger shark] ১০ বছরের মধ্যে ২৪ হাজার দাঁত ব্যবহার করে এবং পালটে নেয়। হাঙ্গরকে 'দন্তারণ্য' প্রাণী বললে ভুল হয় না, কেননা তার দাঁত দিয়ে অরণ্য সৃষ্টি হতে পারে, যতদিন বাঁচে এ অরণ্যের বিলোপ ঘটে না।

হাঙ্গরের দাঁতগুলো সারি সারি সাজানো ; সবগুলো একই আকারের নয়, আগেপাছে গজানোর জন্য এদের সবকটির দৈর্ঘ্য সব সময় একই রকম থাকে

ম্যাকো শার্কের (**Isurus**) ওপর ও নিচের দাঁতের সারি

না। যখন দাঁত ব্যবহার করা হচ্ছে না তখন কেবল প্রথম সারির দাঁত খাড়া থাকে, অন্যগুলি একটি পর্দার (**membrane**) নিচে হেলান অবস্থায় লুকান থাকে, আক্রমণের সময় সবকটি খাড়া হয়ে ওঠে। কোন দাঁত ভেঙে গেলে বা ক্ষয় হয়ে পড়লে ২৪ ঘন্টার মধ্যে সেখানে নতুন দাঁত গজিয়ে ওঠে। নতুন দাঁত দেহের সঙ্গে সমতা রেখে আগেরটির চেয়ে আকারে হয় বড়। অনুমান করা হয়, প্রাণিজগতে হাঙ্গরই প্রথম দাঁতের অধিকারী হয়েছিল। প্রকৃতি যেন হাঙ্গরের দাঁত তৈরি কারখানায় নানা আকার নিয়ে গবেষণা করেছেন অনেক দিন। এদের সবগুলোই অস্ত্রহিসাবে ভয়ংকর।

Tiger Shark—বাঘা হাঙ্গরের দাঁত করাতের মত ধারালো খাঁজকাটা।

Thresher Shark—থ্রেসারের দাঁত বাঘের নখের মত বাঁকানো ও তীক্ষ্ণ ;

Sand Shark—স্যাণ্ড হাঙ্গরের দাঁত কুকুরে দাঁতের মত ধারালো ও লম্বা ;

Hammerhead Shark—হাতুড়ি-মাথা হাঙ্গরের দাঁত দেখতে ধারালো শিমুল-কাঁটার মত ;

Dogfish—ছোটজাতের হাঙ্গর। এদের দাঁত ছোট আঁকশির মত বাঁকানো। সবচেয়ে অদ্ভুত ধরণের দাঁত গ্রেট হোয়াইট হাঙ্গরের ; এক-একটা খাঁজকাটা ত্রিভুজ, উদ্যত মৃত্যুবাণ যেন।

হাঙ্গরের দাঁত

* অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ

জীবনের জন্য প্রথম প্রয়োজন অক্সিজেন। জলচর প্রাণীরা জলের ভিতর থেকেই নিজদেহের শ্বাসযন্ত্রের সাহায্যে অক্সিজেন আলাদা করে নেয়। এ যন্ত্র হল কান্‌কো। মাছ মুখ দিয়ে জল টেনে নিয়ে কান্‌কো নেড়ে ফুলকো-ছাকনি দিয়ে অক্সিজেনটুকু রেখে জল বের করে দেয়। হাঙ্গরের মাথার দিকে সামনের পাখনার ওপরে ওপর-নিচ ৫ থেকে ৭ সারি ফুল্‌কো (gill) পর-পর সাজানো। মাছের মত এদের ফুলকোর ওপর ঢাকনা নেই। অক্সিজেন বেশি পরিমাণে প্রয়োজন হয় তাই জল থেকে অক্সিজেন ছেঁকে নেবার ছাকনিযন্ত্রের সংখ্যাও বেশি। তবে মাছ যেমন কান্‌কো ঢাকনা দিয়ে জল ফুলকোর ওপর চালিয়ে দিতে পারে হাঙ্গরের সে সুবিধা না থাকায় তাকে জলের মধ্যে সদাই চলতে ফিরতে হয় যাতে জল ফুল্‌কোর ওপর দিয়ে বয়ে যায়।

মাছের সঙ্গে হাঙ্গরের অন্য একটি বিষয়ে পার্থক্য আছে। মাছের পেটের মধ্যে পট্‌কা (**air-bladder**) থাকায় তাতে বাতাস ভরে নিয়ে মাছ জলের মধ্যে অনায়াসে ভাসতে পারে। তাই তার পক্ষে জলের মধ্যে নিশ্চল হয়ে অবস্থান করায় কোন অসুবিধা নেই, কিন্তু হাঙ্গরের পটকা না থাকায় ভেসে থাকার জন্য তার অঙ্গসঞ্চালন করতে হয়, নতুবা দেহ জলের চেয়ে ভারি হওয়ায় সে ডুবে যাবে। এই কারণে জীব-বিজ্ঞানীরা মনে করেন হাঙ্গর ঘুমায় না, ঘুমালেই সলিল সমাধি। তাই সর্বদা চলাফেরায় দেহ ভাসিয়ে রাখা দরকার। তবে সমুদ্রে ডুবো পাহাড়ের গুহায় হাঙ্গরকে তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে ঝিমাতে দেখা গেছে।

* হাঙ্গরের সন্তান

সন্তান ধারণ ও পালনের সাফল্যের ওপর জীবজগতে কোন প্রজাতির অস্তিত্ব নির্ভর করে। এই ব্যাপারে প্রকৃতির পরীক্ষা-নিরীক্ষা বোধ হয় এখনও শেষ হয়নি, তাই এর মধ্যে কোন একটিমাত্র পদ্ধতি সর্বাধিক ফলপ্রদ বলে গৃহীত হয়ে অন্য পদ্ধতি বাতিল হয়ে যায়নি।

কতক হাঙ্গর স্তন্যপায়ী প্রাণীর মত জীবন্ত সন্তান প্রসব করে, কোন কোন প্রজাতির স্ত্রী-হাঙ্গর একবারে একশোটি পর্যন্ত বাচ্চার জন্ম দেয়। কতক ডিম পাড়ে, ডিম জলের মধ্যে ফোটে, সাধারণ মাছের মত নিজেরা খাদ্য সংগ্রহ করে বেড়ে ওঠে। হোয়েল শার্ক ও ক্যাট শার্ক ডিম পাড়ে তবে ডিমগুলো একটি করে পর্দার খোলের মধ্যে বন্ধ থাকে। ডিম আকারে বড় হতে হতে এক সময় পর্দাটি ফাটিয়ে দিয়ে তা থেকে বাচ্চা বেরিয়ে আসে।

হ্যামারহেড ও হোয়াইট-টিপ শার্কের দুটি করে জরায়ু নালি থাকে। ডিমগুলো জরায়ুর মধ্যে ফুটে বাচ্চা হয়। প্রথমে ডিমের কুসুম খেয়ে বাড়তে থাকে, পরে একটি বিশেষ ধরণের 'ফুল' (**placenta**) মারফৎ বাচ্চাদের রস খাওয়ানো হয়। স্যাণ্ড শার্কের জন্মবৃত্তান্ত বড়ই অদ্ভুত। স্ত্রী-শার্কের জঠরে দুটি জরায়ুনলির মধ্যে দুটি জীবন্ত শার্ক শিশুর জন্ম হয়। কতক শার্ক যেমন বিশেষ ধরণের 'ফুল' থেকে শিশুদের জন্য খাদ্য সরবরাহ করে, স্যান্ড শার্ক তার পরিবর্তে ক্রমাগত ডিম পেড়ে চলে। ডিমগুলি জরায়ু দিয়ে বাচ্চাদের মুখের সামনে খাদ্যরূপে হাজির হয়। ফলে অন্যান্য হাঙ্গরদের ৮০ বা তার বেশি ডিম ও সন্তান সংখ্যা হলেও স্যান্ডের সন্তান হয় মাত্র দুইটি। মাতৃজঠরে থাকতেই এরা মাংসাশী হয়ে ওঠে। হাঙ্গর বাচ্চাদের বৈশিষ্ট্য হল, জন্মমাত্রেই তারা বাপ-মায়ের ক্ষুদ্র সংস্করণস্বরূপ, কি চেহারায়, কি স্বভাবে। নিজেরা স্বাবলম্বী ; সমুদ্রে খাদ্যের অভাব নেই, বাসস্থান নিয়েও ভাবনা নেই। একমাত্র

চিন্তা জাতভাইদের বড় মুখগুলি থেকে নিজেদের রক্ষা করা। নিজের বাপ-মায়ের কাছ থেকেও স্নেহপ্রীতির আশ্বাস নেই। কে কাকে চেনে!

* শিকার ধরার কৌশল

যে সব প্রাণীকে খাদ্যের জন্য অন্য প্রাণী হত্যা করতে হয় তাদের প্রথম প্রয়োজন দেহের শক্তি, অন্যকে কাবু করার মত গায়ে জোর না থাকলে শিকারকে আয়ত্তে আনবে কি করে? শুধু গায়ের জোরেই হবে না, অস্ত্রও চাই। মাংসাশী প্রাণীর এই অস্ত্র হল দাঁত, নখ; সহায়ক হল তীক্ষ্ম দৃষ্টি ও শ্রবণশক্তি, আর চাই ক্ষিপ্রতা যাতে শিকার তার কবল থেকে অনায়াসে পালাতে না পারে। ডাঙার হিংস্র প্রাণী বাঘ এই সব কয়টি শক্তিতে শক্তিমান। ইস্পাতের পেরেকের মত ধারাল তার দাঁত আর নখ; বহুদূর পর্যন্ত সে দেখতে পায়, অরণ্যের সামান্যতম শব্দও তার শ্রবণযন্ত্রে ধরা পড়ে; সাবলীল ক্ষিপ্রতায় তার সমকক্ষ প্রাণী নেই অরণ্যরাজ্যে, দৈহিক শক্তিতে সে অসাধারণ। তার চেয়ে ওজনে ভারি একটি মোষকে মেরে তাকে নিয়ে ৮ ফুট উঁচু পাঁচিল সে ডিঙিয়ে যেতে পারে দেওয়ালে রেখামাত্র চিহ্ন না রেখে। ডাঙার বাঘ। হাঙ্গরকে বলা যায় সমুদ্রের শার্দুল। শিকার ধরার তার অস্ত্র কি?

বাঘের নখরদন্তের চেয়েও ভয়ংকর এবং সজীব হাঙ্গরের দন্তরাজি। ক্ষিপ্রতায় সে শুধু বাঘ নয়, অন্য সব প্রাণীকে হার মানায়। দৈহিক শক্তিতে কেবল দু'এক জাতের তিমি ছাড়া অন্যকে সে পরাস্ত করবে। বাঘের চেয়ে তার দৃষ্টিশক্তি কম কিন্তু শ্রবণস্নায়ুতন্ত্রী হাঙ্গরের দেহে শব্দগ্রাহক রাডারের মত কাজ ক'রে দূরের প্রাণীর সন্ধান তাকে জানিয়ে দেয়। হাঙ্গরের মাথার অগ্রভাগ থেকে লেজ পর্যন্ত অসংখ্য স্নায়ুসূত্র শরীর বরাবর তাঁতির কাপড়ের লম্বালম্বি 'টানার' মত চলে গেছে। সব স্নায়ুসূত্র এসে মাথা ও মুখ জুড়ে জালের আকারে ছড়িয়ে আছে। স্নায়ুগুলোর ভিতর রয়েছে তরল পদার্থ। চামড়ার ওপরকার ছিদ্রপথে সেখানে জলের কম্পন ধরা পড়ে। সেই কম্পন স্নায়ুনলের মধ্যে উত্তেজনা সঞ্চার করে এবং হাঙ্গরের মস্তিষ্কে তা জানিয়ে দেয়। হাঙ্গর যেখানে রয়েছে সেখান থেকে ৬০০ ফুট দূরত্বে জলে অস্বাভাবিক কোন আলোড়ন হলে সে খবর তৎক্ষণাৎ তার মস্তিষ্কে এসে পেঁছে। সমুদ্রের জলে ঢেউ-এর স্বাভাবিক আলোড়ন-আন্দোলন; তাতে সে চকিত হয় না কিন্তু কোন আহত জন্তু বা মানুষের হাত-পা চালানোর ফলে জলে যে স্পন্দন জাগে এই স্নায়ু-রাডারের সাহায্যে হাঙ্গর তা জেনে যায়। কোন্ দিক থেকে শব্দ আসছে এবং তা কত দূরে তাও তার কাছে ধরা পড়ে। হাঙ্গরের দেহ ঘিরে ছড়ানো এই স্নায়ুর জাল বাঘের প্রখর শ্রবণেন্দ্রিয়ের মত কাজ করে।

ল্যাটারাল-লাইনের ইঙ্গিতে চালিত হাঙ্গর শিকারের ১০০ ফুটের মধ্যে গিয়ে তাকে দেখতে পায় এবং স্থির করে কি করণীয়। বাঘ যেমন শিকারের অজ্ঞাতে তাকে দেখে কিভাবে, কোনদিক থেকে আক্রমণ করবে স্থির করে, হাঙ্গরও তেমনি তার ভোজের চারদিকে চক্রাকারে ঘুরে ভাল করে দেখে নেয় এবং আক্রমণ করা মনস্থ করলে সাধারণত শিকারের নিচের দিকে নেমে যায়।

শিকার সন্ধান করার আর একটি অঙ্গ হাঙ্গরের যা অত্যন্ত তীক্ষ্ম, বাঘের তা একান্তই অভাব। সেটি হল হাঙ্গরের ঘ্রাণগ্রন্থি। এর সাহায্যে হাঙ্গর সিকি মাইল দূর থেকে অন্য প্রাণীর গন্ধ পেয়ে যায়। ১০ লক্ষ আউন্স জলের মধ্যে এক আউন্স রক্ত পড়লে সে ঠিক তা বুঝে নেবে এবং রক্তের লোভে চঞ্চল হয়ে উঠবে। মাছের পটকা (**air bladder**) থাকায় তাতে বাতাস ধরে রেখে তারা জলের মধ্যে অনায়াসে ভেসে থাকতে পারে কিন্তু হাঙ্গরের হাওয়া-ধারক এই অঙ্গটি না থাকায় তাকে সর্বদা পাখনা বা লেজ সঞ্চালিত করে ভাসমান থাকতে হয়। হাঙ্গর যেন দিবা-নিশাচর, সদা-সজাগ, রাডার-ইলেকট্রনিক যন্ত্রসজ্জিত রাক্ষস, করাল নিয়তির মত সে সমুদ্রে খাদ্যের সন্ধানে সর্বদা বিচরণশীল।

* হাঙ্গর-গোষ্ঠী

হাঙ্গরমাত্রই বিরাটবপু বা দারুণ হিংস্র নয়। ২৫০ প্রজাতির মধ্যে ৬ ইঞ্চি থেকে ৪৫ ফুট কখনও বা ৬০ ফুট পর্যন্ত লম্বা হাঙ্গর দেখা যায়। তবে সর্বাধিক বড় দুই প্রজাতি নাতিশীতোষ্ণ সমুদ্রের বাস্কিং হাঙ্গর (**basking shark**) এবং উষ্ণমন্ডলের হোয়েল শার্ক (**whale shark**) মাংসাশী নয়, প্ল্যাংকটন এদের প্রধান খাদ্য। তবে হোয়েল শার্ক যখন প্ল্যাংকটন ছাকার জন্য ঘন্টায় ৪ লক্ষ গ্যালন জল তার বিশাল মুখগহ্বরে নিয়ে ছেকে নেয়, সে সময় প্ল্যাংকটনের সঙ্গে ছোট বড় মাছ বা অন্য প্রাণী এমন কি কাঠের বাক্স বা ধাতব বস্তু—যে কোন পদার্থই তার দুই চোয়ালের মধ্যে দিয়ে সোজা চলে যায় পাতালপুরী-সদৃশ হোয়েল-জঠরে। এ ব্যাপারে সে সর্বভুক। হিংস্র মাংসাশী হাঙ্গরদের মধ্যে বড় শ্বেত-হাঙ্গর (**great white shark**) সর্বাপেক্ষা ভয়ংকর। শুধু হাঙ্গরদের মধ্যে নয়, সমুদ্রে এর মত নিষ্ঠুর ঘাতক দ্বিতীয়টি নেই।

নদী, হ্রদ বা সাগরের যত নরখাদক প্রাণী আছে তার মধ্যে শ্বেত-হাঙ্গর সবচেয়ে মারাত্মক। নরখাদকদের গোষ্ঠীর এটিই সব চাইতে বড়। এ পর্যন্ত যতগুলি শ্বেত হাঙ্গর ধরা পড়েছে তার মধ্যে সর্বাপেক্ষা বড়টি ছিল ২১ ফুট লম্বা, ওজন ৩ টনের বেশি। দেহের শক্তি এবং ভোজন ক্ষমতায়ও এটির স্থানই প্রথম।

সারা গায়ে শিরিষ কাগজের মিহি কাঁচ ও বালি কণার মত দাঁতযুক্ত চামড়া, গড়ন অনায়াসভঙ্গিতে জলের মধ্যে দ্রুত চলার উপযোগী। শীতল ও উষ্ণ, গভীর ও অগভীর সব রকম জলে এরা শিকার ধরতে পটু। মানুষকে কোন রকম জানান না দিয়ে সম্পূর্ণ অতর্কিতে আক্রমণ এদের বৈশিষ্ট্য ! দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় সমুদ্রে জাহাজডুবিতে সৈন্যরা যখন জলে সাঁতার কেটে বাঁচার চেষ্টা করে, হাজার হাজার অসহায় মানুষ শ্বেত হাঙ্গরের আক্রমণে প্রাণ হারায়। সন্তরণকারীদের বাঁচার প্রয়াসে জলে যে আলোড়ন সৃষ্টি হয় তা শ্বেত-হাঙ্গরকে মহাভোজের আমন্ত্রণ জানিয়েছিল। একই জায়গায়, এতগুলো সুস্বাদু খাবার ! বক রাক্ষসের মত এই হাঙ্গরদের কাছে ঐরূপ অবস্থা ছিল ভোজন মহোৎসব।

শুধু সমুদ্রের গভীর অংশে নয় কোমরজলে দাঁড়ান অবস্থায় বা তীর থেকে ১0 হতে ৫0 ফুটের মধ্যে সাঁতার কাটার সময়ও অনেকে শ্বেত হাঙ্গরের বলি হয়েছে এবং এরূপ লোকের সংখ্যা অনেক। ভীষণ আকারের খাঁজকাটা ত্রিভুজের মত দাঁত দিয়ে শ্বেত হাঙ্গর প্রথমে মানুষের নিম্নাঙ্গ কেটে নেয়, তারপর বাকি অংশ চর্বন করে মণ্ড করে ফেলে। তবে এমন ঘটনাও নাকি আছে যেখানে জীবন্ত মানুষ সে আস্ত গিলে ফেলেছে তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গে আঁচড়টি পর্যন্ত না লাগিয়ে ! অবশ্য জীবিত অবস্থায় হাঙ্গরের পাকস্থলীতে প্রবেশ করলেও প্রাণ নিয়ে বেরিয়ে এসে সেই উদরপুরীর বিবরণ দেবার সৌভাগ্য কারো হয়নি।

* রাক্ষুসে আহার

বাংলার উপকথায় রাক্ষসী রাণীর গল্প আছে। দিনে সুন্দরী রমণী হয়ে রাজপ্রাসাদে থাকে। নিশীথ রাতে নিজরূপ ধারণ করে ঘোড়াশালের ঘোড়া, হাতিশালের হাতি খেয়ে আবার রাত্রিশেষে অন্তঃপুরে ফিরে আসে। শ্বেত-হাঙ্গর রাক্ষসীর চেয়েও বাহাদুর। রাক্ষসী ঘোড়াকে কড়মড় করে চিবিয়ে খায়, শ্বেত হাঙ্গর আস্তই গিলে ফেলে। উপকথা নয়, অস্ট্রেলিয়ার উপকূলে ধৃত এক শ্বেত হাঙ্গরের পেটে পাওয়া গেল এক আস্ত ঘোড়া ! কিছুদিন আগে অস্ট্রেলিয়ার উপকূলে সাঁতার কাটার সময় কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি অকস্মাৎ নিখোঁজ হয়ে যান। সন্তরণপটু লোকেদের শখ করে জলক্রীড়া করার সময় হঠাৎ তলিয়ে যাওয়া রহস্যজনক। অনেকের সিদ্ধান্ত, এই রহস্যের মূল নায়ক হোয়াইট শার্ক। ১৯১৬ সনে একটি হাঙ্গর নিউজার্সি উপকূলে স্নানরত চারজনকে খেয়ে ফেলে, একজন আহত হয়ে প্রাণে বেঁচে যায়। এই দুর্ঘটনার পর হাঙ্গর শিকারে ব্যাপক উদ্যম নেওয়া হয়েছিল, কিন্তু আসল দোষী ধরা পড়েনি। এখানেও অনুমান, শ্বেত হাঙ্গরই ছিল প্রকৃত খুনী।

* মহামৎস্যের কবলে

হাঙ্গর মৎস্যগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। মাছের মতই এরা ফুলকো দিয়ে জল থেকে অক্সিজেন গ্রহণ করে। হাঙ্গরের ফুলকো ঢাকা থাকে না, সর্বদা উন্মুক্ত।
আমেরিকার উপকূল সমুদ্রে এই মহামৎস্য সন্তরণ বিলাসীদের আতংকের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। শ্বেত হাঙ্গরের আক্রমণে এক তরুণীর কি দশা হয়েছিল তার নিখুঁত বাস্তবধর্মী মর্মান্তিক কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে Jaws শীর্ষক এক উপন্যাসে। এর সংক্ষিপ্ত ঘটনাচিত্র থেকে শ্বেত হাঙ্গরের ভয়াবহতা ও স্বভাবের পরিচয় পাওয়া যাবে।

* * *

রাত্রিকাল। অর্ধচন্দ্রাকার লেজের সামান্য একটু দোলানি দিয়ে বিরাট মৎস্যটি জলের মধ্যে নিঃশব্দে চলছিল। মুখটি ঈষৎ খোলা যাতে জলের ঝাপটা গিয়ে লাগে উন্মুক্ত ফুলকোর ওপর। এছাড়া অন্য কোনরকম গতির চঞ্চলতা ছিল না। কেবল উড়ন্ত পাখি যেমন একটি ডানা একটু নিচু করে, অন্যটি সামান্য উঁচু করে দিক পরিবর্তন করে, হাঙ্গরটিও তেমনি সামনের পাখনা একটু উঁচু বা নিচু করে উদ্দেশ্যহীন চলা বজায় রেখেছে। অন্ধকারে কিছুই দেখা যায় না, অনুভূতিগ্রহণক্ষম অন্যান্য স্নায়ুতন্ত্রী দিয়ে তার মস্তিষ্কে বিশেষ কোন বার্তা এসে পৌঁছাচ্ছিল না। হাঙ্গরটি সম্ভবত ঘুমিয়ে পড়েছিল কিন্তু জীবন রক্ষার তাগিদে সঞ্চরণে বিরাম ছিল না। কারণ, অন্যান্য সাধারণ মাছের মত তার পটকা না থাকায় এবং অক্সিজেনবাহী জল তার ফুলকোর ওপর চালিয়ে দেবার জন্য কানকো না থাকার জন্য একে বেঁচে থাকার চেষ্টায় সর্বদা নিজেকে চলমান থাকতে হয় যাতে জলের ধারা ফুলকোর ওপর দিয়ে প্রবাহিত হয়। চলা বাদ দিলে হাঙ্গর সাগরতলায় ডুবে যাবে। অক্সিজেন-অভাবে তখন তার মৃত্যু অবধারিত।
আকাশে চাঁদ ছিল না; ডাঙাও জলের মতই অন্ধকার দেখাচ্ছিল। ডাঙা আর জলের মাঝখানে দীর্ঘ সোজা এক তটভূমি সাদা দেখাচ্ছিল। তটের ওপারে ঘাসে ঢাকা উঁচু পাড়, তার ওপর একটি বাড়ি থেকে হলুদ একফালি আলো বালির ওপর এসে পড়েছে।
গৃহের সামনের দরজাটি খুলে গেল। একজন পুরুষ ও একজন নারী ঘর থেকে বেরিয়ে এসে কাঠের বারান্দার ওপর দাঁড়াল। কয়েক মুহূর্ত তারা সাগরের দিকে চেয়ে দেখল, উভয়ে উভয়কে সোহাগ আলিঙ্গন করে দ্রুত সিঁড়ি দিয়ে বালির ওপর এসে দাঁড়াল। লোকটির নেশার ঘোর রয়েছে। সিঁড়ির শেষ ধাপে

এসে সে হোঁচট খেয়ে পড়ে গেল। মেয়েটি খিলখিল করে হেসে উঠল। পুরুষটির হাত ধরে তাকে তুলল এবং একসঙ্গে দৌড়িয়ে তটভূমিতে এসে থামল।

মেয়েটি জলের ধারে গিয়ে দাঁড়াল, ঢেউ-এর প্রান্ত এসে তার গোড়ালি ভিজিয়ে দিচ্ছে। জুন মাসের মাঝামাঝি। রাত্রির বাতাস অপেক্ষা জল বেশি ঠাণ্ডা। নারী ডেকে বলল—'তুমি আসছ না তো ?'

কোন উত্তর এল না।

মেয়েটি কয়েক পা পিছিয়ে এল। তারপর দৌড়িয়ে জলের মধ্যে নেমে পড়ল। প্রথম দিকে লম্বা লম্বা পা ফেলে মনোহর ভঙ্গিতে সে দৌড়াল। একটি ছোট ঢেউ এসে তার হাঁটুতে লাগল। সে খানিকটা থেমে গেল। তারপর কোমর উঁচু একটা ঢেউ আসতেই তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। জল মাত্র কোমরের নিচ অবধি, সে থামল, চোখের ওপর গিয়ে চুল পড়েছিল, সেগুলো সরিয়ে দিল এবং হেঁটে হেঁটে চলল কাঁধ জল পর্যন্ত। তারপর সে সাঁতরাতে শুরু করল, জলের ওপর মাথা জাগিয়ে রেখে সাধারণভাবে সাঁতার ; হাত-পা ছোঁড়া কেতামাফিক নয়।

তীর থেকে একশো গজ দূরে হাঙ্গর সাগরজলের ছন্দের মধ্যে পরিবর্তন হয়েছে বুঝতে পারে। সে স্ত্রীলোকটিকে দেখতে পায়নি, তার গন্ধও টের পায়নি। তার সারা শরীর বরাবর লম্বালম্বি তরল পদার্থপূর্ণ সারি সারি সরু স্নায়ুনালী। এর মাঝে মাঝে স্নায়ুর প্রান্তবিন্দু। এগুলি জলের ভিতরকার স্পন্দন রণন তার মস্তিষ্কে পেঁছে দেয়। মৎসটি তীরের দিকে ঘুরল।

মেয়েটি তখনও তীর থেকে বাইরের দিকে সাঁতার কেটে চলেছে। মাঝে মধ্যে থামছে, পিছন ফিরে চেয়ে বাড়ির আলো দেখে নিজের অবস্থান জেনে নিচ্ছে। জোয়ার ছিল না, সে তীরভূমির এদিক—ওদিক সরে যায়নি। কিন্তু সে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। কিছুক্ষণ সে জলের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকার মত পা চালিয়ে একটু বিশ্রাম নিল, তারপর তীরের দিকে ফিরতে শুরু করল।

এবার জলের মধ্যে স্পন্দন-কম্পন জোরালো হল, হাঙ্গর তার শিকারের সন্ধান পেয়ে গেছে। লেজের সঞ্চালন দ্রুত হল, বিশাল শরীর বেগে ধেয়ে চলল, আলোড়নের ফলে জলের ভিতরকার প্ল্যাংকটন জাতীয় অণুপ্রাণীগুলো আলো বিকিরণ করে হাঙ্গরের গায়ের ওপর যেন আলোর চাদর সৃষ্টি করল।

হাঙ্গর মেয়েটির কাছে এসে পড়েছে। তার ১২ ফুট দূরত্বে ৬ ফুট জলের তলা দিয়ে সে বেগে চলে গেল। নিচের দিক থেকে জলের চাপ তাকে যেন খানিকটা উঁচু করে তুলল, তারপরেই জল একটু নিচু হল, হাঙ্গরের বিরাট দেহ জলকে এই ভাবে উঁচু নিচু করে গেল, মেয়েটি জল ফুলে ওঠার কারণ কিছুই বুঝতে পারল না। ক্ষণকালের জন্য সাঁতরানো বন্ধ করে সে ব্যাপারটা

বোঝার চেষ্টা করল। আর যখন কিছু হল না সে আবার হাত ছুঁড়ে সাঁতরাতে শুরু করল।

হাঙ্গর এবার গন্ধ পেয়ে গেছে। জলের স্পন্দন-সংকেত হয়েছে তীব্র। সে জলের ওপর-স্তরে এসে মেয়েটির চারদিকে চক্রাকারে পাক দিল, তার পিঠের ওপরকার পাখনা জলের ওপর জেগে উঠেছে, লেজের আস্ফালনে জল তোলপাড়, গতিবেগে মসৃণ কাচসদৃশ জলে শিস দেওয়ার মত হিস্-স্-স্ শব্দ উঠল। উত্তেজনায় হাঙ্গরের দেহে কম্পন খেলে গেল।

এই প্রথম মেয়েটির কেমন ভয় হল, কিন্তু এর কারণ সে বুঝতে পারল না। তার মেরুদণ্ড ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মধ্য দিয়ে চকিতে অ্যাড্রিনালিন বয়ে গেল, দেহে উত্তাপের সৃষ্টি হল, ভিতর থেকে দ্রুত সাঁতরানোর তাগিদ এল, এর কারণও সে জানতে পারল না। তার মনে হল, সে তীর থেকে ৫০ গজ মত দূরে। ঢেউগুলি তটে ভেঙে পড়ে যে সাদা রেখা সৃষ্টি করেছিল তা সে দেখতে পাচ্ছিল। বাড়ির আলোটি দেখা যাচ্ছিল এবং মনে স্বস্তি এল, কে যেন একবার জানালার পাশ দিয়ে গেল।

হাঙ্গর এবার মেয়েটির কাছ থেকে ৪০ ফুট দূরে, একপাশে। হঠাৎ সে বাঁদিকে ঘুরে জলের নিচে চলে গেল এবং লেজের দুটি দ্রুত সঞ্চালনে মেয়েটির একবারে কাছে এসে উপস্থিত হল।

প্রথমে মেয়েটির মনে হল একটি পাথর কিংবা ভাসমান কাঠের গুঁড়ির সঙ্গে তার পায়ের ধাক্কা লেগেছে, ব্যথা নয় কেবল ডান পায়ে কেমন একটা হিচকে টান মত বোধ হল। বাঁ পা জলের মধ্যে প্যাডেল করার মত চালিয়ে, মাথা জলের ওপর ভাসিয়ে রেখে, বাঁহাত দিয়ে সে ডান পা খানি ধরার চেষ্টা করল। দেখে পা নেই। সে আরো নিচের দিকে হাত চালিয়ে বোঝার চেষ্টা করল এবং হঠাৎ তার মাথা ঘুরতে লাগল, বমি-বমি ভাব তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলল। হাত দিয়ে হাতড়াতে তার আঙ্গুলে লাগল একটি হাড়ের প্রান্ত আর ছেঁড়াখোড়া মাংস। সে বুঝল, ঠান্ডা জলে তার আঙুলে যে-গরম তরল পদার্থের স্রোত লেগেছে তা তারই রক্ত। যন্ত্রণা ও ভয় একসঙ্গে তাকে চেপে ধরল। মাথা পিছন দিকে ঝাঁকি দিয়ে সে ভয়ার্ত রুদ্ধকণ্ঠে চিৎকার করে উঠল।

হাঙ্গর দূরে সরে গিয়েছিল। মেয়েটির পা না চিবিয়ে গিলে ফেলেছে। হাড়-মাংস সব একগ্রাসে উদরগহ্বরে চলে গেছে। সে আবার ফিরল। রমণীর উরুর ধমনী থেকে যে উষ্ণ রক্তস্রোত বয়ে চলছিল হাঙ্গরের কাছে তা মেঘহীন আকাশে লাইটহাউসের আলোর মত নিশ্চিত নিশানা। এবার সে আক্রমণ করল নিচের দিক থেকে। হাঙ্গরের বিরাট কোণাকার মাথা চলমান ইঞ্জিনের মত এক ধাক্কায় মেয়েটিকে জলের ওপর তুলে ফেলল। হাঁ-করা দুই চোয়ালের মধ্যে

মেয়ের শরীরের মধ্য অংশ পড়তেই এক চর্বনে হাড়মাস অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ থলথলে জেলির আকারে পরিণত হল। চূর্ণীকৃত দেহটি মুখে নিয়ে মহারাক্ষস প্রচন্ড আস্ফালনে জলস্তম্ভ তুলে তলিয়ে গেল, রক্ত ও সাগরফেনার ফোয়ারা উঠল জলের ওপর, তার মধ্যে অন্ধকারে ফসফরাসের অণুপ্রভা আগুনের ফুলকির মত ঝিকমিক করে উঠল।

জলের নিচে হাঙ্গরটি এপাশে-ওপাশে মাথা ঝাঁকাল কয়েকবার। করাতের দাঁতের মত খাঁজকাটা ত্রিভুজাকার দাঁতের ফাঁকে যে সামান্য মাংসপেশী তখনও আটকে ছিল, তা কেটে গেল, দেহটি দুই খন্ড হয়ে পড়ল। তারপর সেগুলো গিলে ফেলে আশেপাশে ছড়িয়ে পড়া টুকরো অংশ খাওয়ায় মন দিল। কাছাকাছি আরো খাদ্য রয়েছে, এ খবর তার মস্তিষ্কে ধরা পড়ছিল। জলের মধ্যে রক্তের আলপনা, এখানে ওখানে ছেঁড়া মাংসের টুকরো, আর বড় কোন অংশ অবশিষ্ট নেই। হাঙ্গরটি রক্তাপ্লুত জলের মধ্যে খানিকক্ষণ চষে বেড়াল, মুখ খোলে আর বন্ধ করে, জলের মধ্যে মাংস বা দেহতন্তুর সামান্য অংশও যদি পাওয়া যায় তা ছেঁকে তুলে নেবে। এই সময়ের মধ্যে দেহের আর বিশেষ কিছু অবশিষ্ট নেই, কেবল সামান্য কয়েকটি টুকরো ধীরে ধীরে তলিয়ে মাটিতে গিয়ে ঠেকল। সেখানে স্রোতে সেগুলো আস্তে আস্তে সরে যেতে লাগল। অল্প কিছু অংশ জলস্তরের সামান্য নিচ দিয়ে ভাসতে ভাসতে ঢেউ-এর ধাক্কায় দোলা খেতে খেতে শেষ পর্যন্ত সাগরতটে গিয়ে স্থির হয়ে পড়ে রইল।

নরখাদকের গোষ্ঠী

নরখাদক হাঙ্গরদের মধ্যে সবচেয়ে বিপজ্জনক শ্বেত হাঙ্গর ;· আকার যেমন বড়, তেমনি রাক্ষুসে তার ক্ষিদে ও হিংস্রতা। তার জ্ঞাতিগোষ্ঠীর অনেকে সকল সমুদ্রেই চরে বেড়ায় এবং সুযোগ পেলে নরমাংস খেয়ে মুখের স্বাদ বদলায়। এদের কয়েকটির বিবরণ থেকে হাঙ্গরদের বৈচিত্র্য ও স্বরূপ জানা যাবে।

* টাইগার শার্ক (**Tiger Shark, Galeocerdo**)

বাঘা হাঙ্গর নাম তার বাঘের মত হিংস্র স্বভাব ও গায়ে হলুদ-কালো ডোরা-দাগের জন্য। এদের দাগচিহ্ন বাচ্চা অবস্থায় উজ্জ্বল থাকে, বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ফ্যাকাশে অস্পষ্ট হয়ে আসে। লম্বায় এরা প্রায় ২৩ ফুট। উষ্ণ অঞ্চলের উপকূল সাগরে এরা খাদ্যের সন্ধানে হানা দেয়। এমনিতে ধীরে সুস্থে অলস মন্থরগতিতে উদ্দেশ্যহীনভাবে টহল দেয় কিন্তু শিকারের সন্ধান পেলে তার পিছু ধাওয়া করার সময় এদের অন্য রূপ। তখন যেমন ক্ষিপ্র তেমনি নাছোড়বান্দা ভাব। রিকোয়েম গোষ্ঠীর অন্যান্য হাঙ্গরের মত টাইগারের চোয়াল
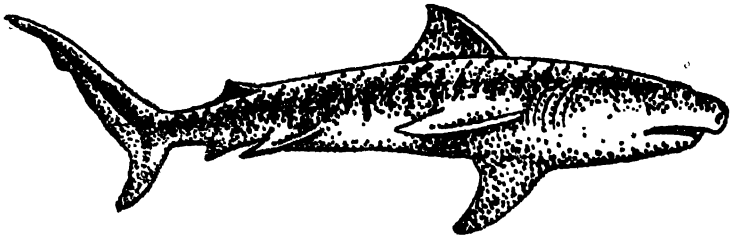
টাইগার শার্ক ; ১৮ ফুট

এমনভাবে আলগা করে জোড়া লাগানো যে, হাঁ করে মুখ অনেকখানি বড় করে প্রায় নিজের আকারের শিকারকেও গিলে ফেলতে পারে। শ্বেত হাঙ্গর দুই ইঞ্চি লম্বা দাঁত-বসানো ওপরের চোয়াল সামনে এগিয়ে দিয়ে শিকারকে বিরাট মুখগহ্বরে পুরে নেয় ; টাইগার ওপর-নিচ দুই চোয়ালই কব্জা লাগানো পাল্লার মত প্রসারিত করতে পারে। খাওয়ার ব্যাপারে এদের বাছবিচার নেই।

বিরাট আকারের স্টিং-রে থেকে ছোট মুরগীর বাচ্চা পর্যন্ত যে কোন বস্তুই এদের কাছে সমান উপাদেয়।

* স্যান্ড শার্ক (Sand Shark, Carcharias Taurus)

আটলান্টিক মহাসাগরের দুই পারে এদের দেখা যায় বেশি সংখ্যায়। পশ্চিম আফ্রিকার উপকুল থেকে ক্যানারি, কেপভার্ড দ্বীপপুঞ্জ ও পশ্চিম মেইন উপসাগর, ফ্লোরিডা ও ব্রাজিল পর্যন্ত এদের বিচরণ ক্ষেত্র। স্যান্ড টাইগারের বৈশিষ্ট্য হল—এরা পাকস্থলীতে বাতাস ধরে রেখে ভাসতে পারে। অন্যান্য হাঙ্গরের বায়ুথলি (পটকা air-bladder) না থাকায় জলে ভাসার জন্য সর্বদা পাখনা বা লেজের সঞ্চালন আবশ্যক হয়। তাই চলমান অবস্থাতেই তাদের ঘুম বা ঝিমুনি সেরে নিতে হয়। কিন্তু স্যান্ড শার্ক বায়ু ধরে রাখার ব্যাপারে নিজস্ব পদ্ধতি গ্রহণ করতে শিখেছে।

* নার্স শার্ক (Nurse Shark, Charcharias)

দশফুট মত লম্বা। ধীর গতি। অন্যান্য হাঙ্গরের সঙ্গে এদের মুখের গড়নে পার্থক্য রয়েছে। সাধারণ হাঙ্গরের মত মুখ লম্বা সুচালো নয়,
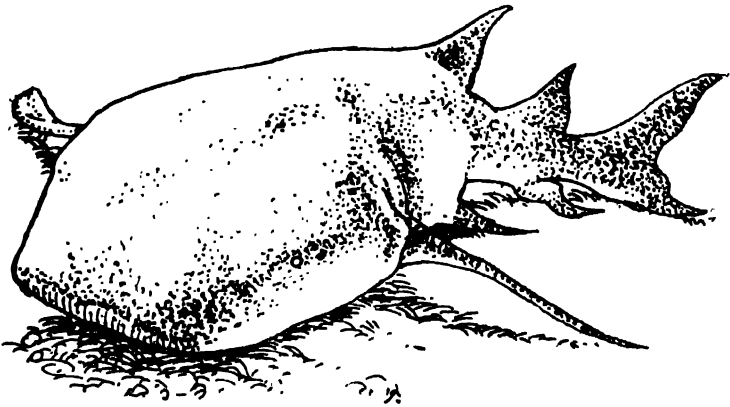
নার্স শার্ক

এদের মুখ গোল মত, দাঁতগুলি ছোট ছোট, শক্তিশালী চোয়াল কঠিন বস্তু চূর্ণ করার পক্ষে উপযোগী, মাংস ছিঁড়ে কেটে নেবার পক্ষে নয়। তাই কোন জিনিস যখন কামড়ে ধরে, তার চোয়াল বিরাট সাঁড়াশির মত এমন চেপে

বসে যে হাঙ্গরকে মেরে না ফেললে তার মুখ ফাঁক করানো যায় না। নার্স শার্ক মানুষকে ধরলে তাকে ছিঁড়ে নয়, আখের মত চিবিয়ে খাবে।

* হোয়াইট-টিপ শার্ক (White-tip Shark, Carcharhinus longimanus)

এর পাখনার ডগায় সাদা রঙ থেকে এ নাম। এরা উষ্ণ সাগরের বাসিন্দা—মেক্সিকো উপসাগর, ক্যারিবিয়ান সাগর ও প্রশান্ত মহাসাগরের উষ্ণমণ্ডল এদের পক্ষে অনুকূল জলপরিবেশ। সব হাঙ্গরের সঙ্গেই পাইলট মাছ ও রিমোরা চলে, যেন বাঘের সঙ্গে ফেউ। পাইলট মাছগুলো যেন এদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যায় আর রিমোরারা এদের গায়ে মাথা লাগিয়ে আঁকড়ে ধরে থাকে। রিমোরাদের মাথার ওপর শোষকযন্ত্র বসানো আছে যা দিয়ে হাঙ্গরের গায়ে এমনভাবে আটকে ধরে যে, এরা ইচ্ছা করে খুলে না দিলে টেনে বা ঝাঁকানি দিয়ে ছাড়ানো যাবে না। ধনীবাবুদের মোসাহেবের মত, সব সময় সঙ্গে সঙ্গে থাকবে, হাঙ্গরের
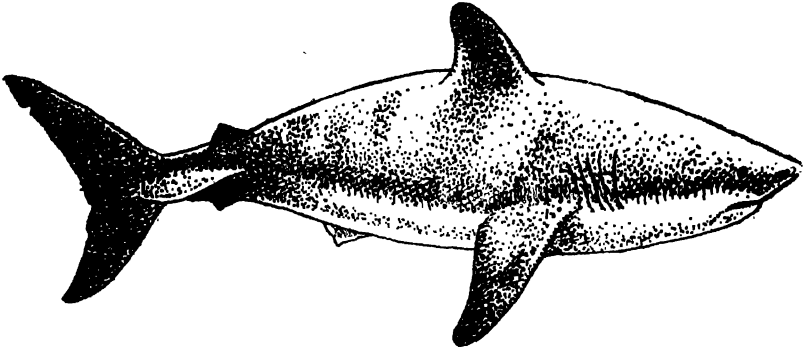
হোয়াইট-টিপ শার্ক

ভোজনের কণাপ্রসাদ লাভ করবে; প্রতিদানে প্রভুর বিরক্তি জন্মায় যেসব পরভৃৎ ক্ষুদ্রজীব তাদের খেয়ে তাঁর স্বস্তিবিধান করবে। হাঙ্গর তাই বড়দের যম হলেও ছোটদের প্রতিপালক।

* গ্রে রীফ শার্ক (Grey Reef Shark, Carcharinus)

ধূসর রঙ, নীল জলের মধ্যে নীলাভ দেখায়। এই বিরাট হাঙ্গর প্রশান্ত মহাসাগর ও ভারত মহাসাগরে চরে বেড়ায়। উপকূলের কাছাকাছি মানুষকে সাঁতরাতে দেখলে এরা নিঃশব্দে তাকে নিখোঁজ করে দেবে। এই সদা সঞ্চরমান হাঙ্গরেরাও কখনও কখনও স্থানমাহাত্ম্যে নিশ্চল হয়ে থাকে। মেক্সিকো

উপসাগরের উষ্ণ জল-অঞ্চলে ডুবো পাহাড়ের গুহায় এই অদ্ভুত দৃশ্য দেখা যায়। হিমালয়ের গুহায় সাধুসন্ন্যাসীরা ধ্যানমগ্ন শান্ত জীবনযাপন করেন। মেক্সিকোর গুহায় রীফ শার্ককেও পাথরের ওপর শুয়ে নীরবে অবস্থান করতে দেখা গেছে। এরূপ বিশ্রাম তো হাঙ্গরের স্বভাব বিরুদ্ধ, কারণ পাখনা সঞ্চালন না করে সে ভেসে থাকতে পারে না; আর জলের প্রবাহ ফুলকোর ওপর দিয়ে চালানো দরকার অক্সিজেন গ্রহণের জন্য। তাই তার জীবনরক্ষার নীতি চরৈবেতি, চরৈবেতি—চলতে থাক, চলতে থাক। তবে মেক্সিকো সাগরতল-গুহার জাদু কি? পাথরের ওপর বসে থাকলে পাখনা না চালালেও ডুবে যাওয়ার সম্ভাবনা নেই, আর জলে স্রোত থাকায় সেদিকে মুখ করে থাকলে জলের প্রবাহ আপনা থেকেই তার ফুলকোর ওপর দিয়ে প্রবাহিত হয়। এরূপ বিশ্রাম ও সঞ্জীবনীদায়ী পরিবেশ খুব কমই আছে।
গুহার মধ্যে বিশ্রামরত থাকলেও সে খুব নিদ্রিত বা অসতর্ক নয়। হাঙ্গরের চোখ দেখেই তা বোঝা যাবে। সম্ভাব্য কোন খাদ্যের প্রতীক্ষায় তার নির্মম চোখ সদা জাগ্রত। খাদ্যকণালোভী অনুচর ছোট মাছের দলও থাকবে পাশেই।

* বুল শার্ক (**Bull Shark, Carcharhinus leucas**)

পৃথিবীর প্রায় সকল সমুদ্রে বুল শার্কের দেখা মিলবে। ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলে এরা ভিন্ন ভিন্ন নামে পরিচিত। মধ্য আমেরিকার নিকারাগুয়ায় সুপেয় জলের হ্রদে যারা থাকে তারা নিকারাগুয়া শার্ক এবং সাগর থেকে যারা গঙ্গা নদীতে উঠে আসে তাদের নাম দেওয়া হয়েছে গঙ্গা শার্ক। দৈর্ঘে ১০ ফুট, ওজন ৪০০ পাউণ্ড। বুল শার্করা সাহস ও হিংস্রতায় তাদের গোষ্ঠীর বড় ভাইদের চেয়ে কোন অংশে কম নয়। গঙ্গায় স্নান করার সময় বুল শার্কের কবলে পড়েছে এমন ঘটনাও আছে। তাছাড়া গঙ্গায় তাদের সহজ খাদ্যও অনেক সময় মিলে যায়। দাহ না করে কখনো কখনো মৃতদেহ গঙ্গার পবিত্র জলে ভাসিয়ে দেওয়া হয়। বুল শার্করা জীবিত-মৃতের কোন পার্থক্য করে না; উভয়েই তাদের কাছে সমান রুচিকর। গঙ্গায় বুল শার্ক মানুষের হাতে ধরাও পড়ত। **The Days of John Company** গ্রন্থে **Calcutta Gazette**-এর ১৮ই মে, ১৮২৯ তারিখে একটি ঘটনা প্রকাশিত হয়। গঙ্গায় হুগলী ঘাটে এক বিহারী নৌকার মাল্লা জলে ডুব দিয়ে গিয়ে এক হাঙ্গরকে দড়ির ফাঁসে আটকিয়ে ধরেছিল। এটি ছিল ৬ ফুট ৯ ইঞ্চি লম্বা, বেড় ৩ ফুট ৭ ইঞ্চি। এটি ছিল **Bull Shark**। এই ঘটনায় তখন কলকাতায় চাঞ্চল্য জেগেছিল।

* হ্যামারহেড শার্ক (Hammerhead Shark, Sphyrna)

দুই মাথাওয়ালা হাতুড়ির মত মাথা, হ্যামারহেড শার্ক আকৃতিতে সমুদ্রের অন্য সকল প্রাণী থেকে স্বতন্ত্র। ১৮ ফুট লম্বা, ১০০০ পাউণ্ড ওজন এই হাতুড়িশির হাঙ্গর হিংস্রতায় অপর নরখাদক অপেক্ষা কম নয়। মাথাটি অদ্ভুত রকমের, বিরাট একখানা কাঠের পুরু তক্তার মত। তার দুই প্রান্তে দুই চোখ ও নাসিকার ছিদ্র। হাঙ্গরের নাসিকা শ্বাস-প্রশ্বাস চালানোর জন্য নয়, এখানে তার ঘ্রাণগ্রন্থি স্থাপিত যার সাহায্যে প্রায় সিকি মাইল দূর থেকেই সে খাদ্যের গন্ধ বিশেষ করে রক্তের গন্ধ পেয়ে যায়। চোখ দুই প্রান্তে থাকার ফলে তার সামনের এবং পাশের অনেকখানি অঞ্চল তার দৃষ্টির আওতায় আসে।
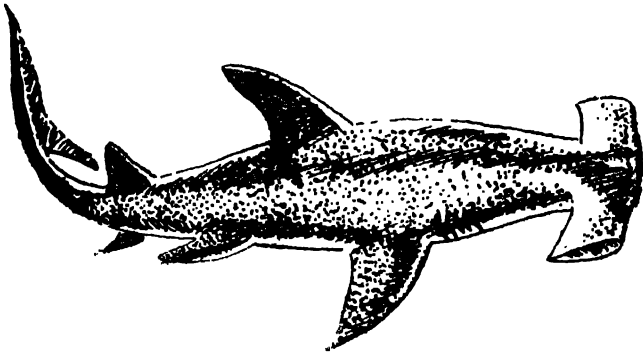
হ্যামারহেড শার্ক (Hammerhead Shark), ১৮ ফুট

স্বচ্ছ নীল জলের মধ্যে একে ধীরে ধীরে চলতে দেখলে মনে হবে নির্মল আকাশে হেলিকপ্টার।

* থ্রেসার শার্ক (Thresher shark, Alopias vulminus)

থ্রেসার হাঙ্গরের দেহের গড়ন অদ্ভুত। যতখানি দেহ, প্রায় ততখানি লম্বা

থ্রেসার শার্ক (Thresher Shark), ২০ ফুট

তার লেজ। এর প্রয়োজন আছে। থ্রেসার মাছের যম, ভারি চতুর আর ক্ষিপ্র। মাছের ঝাঁক দেখতে পেলে বেগে চক্রাকারে ছুটে তাদের বন্দী করে

ফেলে। বেগে ছোটে আর লেজের ঝাপটায় জল ছিটিয়ে মাছেদের এক জায়গায় জড়ো করে। তারপর চলে রাক্ষসের মত ভক্ষণ। লেজের ঝাপটায় এপাশ-ওপাশ থেকে মাছ এনে মুখের কাছে ফেলে। বিরাট লেজ তখন তার লম্বা হাতা। আবার লেজ দিয়ে জল ছিটিয়ে সে যখন মাছের ঝাঁক একত্রিত করে তখন তার লেজ হয় চাষীর শস্য ঝাড়াই করা যন্ত্রের মত। চাষী পাকাধান মাটিতে বা তক্তার ওপর পিটিয়ে গাছ থেকে আলাদা করে এক জায়গায় জড়ো করে, এ হাঙ্গর খাদ্য একস্থানে জমা করতে তার লম্বা লেজটিকে সেই কাজে লাগায়। তাই নাম **Thresher** অর্থাৎ ঝাড়াইকারী। তার নমনীয় দেহ অনায়াসে এদিক ওদিক বাঁকাতে পারে। সামনের দুখানি বড় পাখনা দাঁড়ের মত জল টেনে হাঙ্গরকে প্রচণ্ড বেগে ছুটতে সাহায্য করে। পিঠের ওপর দাঁড়ানো নিশানের মত পাখনা আর লেজ হাঙ্গরের হালের কাজ করে। বিরাট লেজ চলায় গতিবেগ আনা ও শিকার ধরায় সহায়ক। মুখে ৩ থেকে ৬ সারি ধারাল তেশিরা দাঁত।

থ্রেসার হাঙ্গর বাঘের মত শিকারী এবং সর্বভুক। যাত্রী জাহাজের আশেপাশে ঘোরাফেরা করে। জাহাজ থেকে যা কিছু ফেলে দেওয়া হোক, এমন কি টিনের কৌটা পর্যন্ত, পেলেই তা গিলে ফেলবে। জেলেরা যখন জাল দিয়ে মাছ ধরে, থ্রেসার দেখতে পেলে জালে আটকানো মাছ জালসুদ্ধ খেয়ে ফেলবে, এমন লোভী! থ্রেসার কখনো কখনো ৪০ ফুট পর্যন্ত লম্বা হয়।

* হোয়েল শার্ক (**Whale Shark, Rhincodon**)
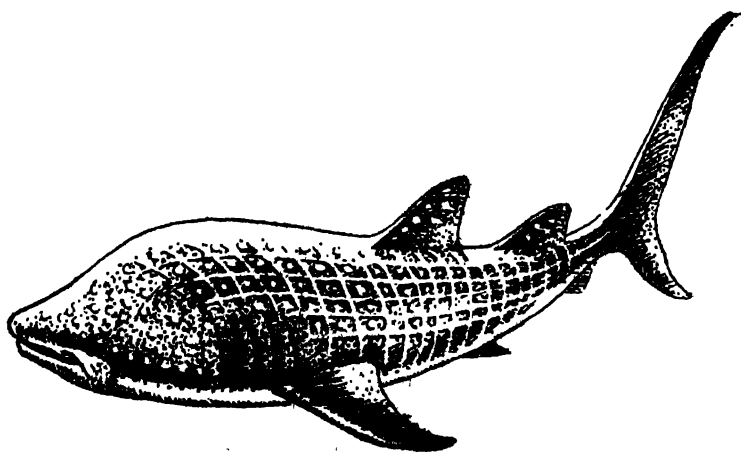
হোয়েল শার্ক (**Rhincodon**), ৬০ ফুট

হাঙর গোষ্ঠীর বড় শরিক তিমি হাঙর (Whale Shark) শান্ত, নিরীহ, নিরামিষভোজী। যেন নরঘাতক দৈত্যকুলে প্রহল্াদ। উষ্ণমণ্ডলের গভীর সমুদ্রের বাসিন্দা তিমি হাঙর আকৃতিতে মৎস্যজাতির মধ্যে সর্ববৃহৎ, দৈর্ঘে ৪০ থেকে ৬০ ফুট, ওজন ১৫ টন। এরা সংখ্যায় খুব বেশি আছে বলে মনে হয় না, এদের দেখা মেলে ক্বচিৎ। রহস্যময় এই অদ্ভুত জীবটির সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছিল বিখ্যাত সমুদ্র অভিযাত্রী থর হেয়ারডালের। এ দেখা কোন কৃত্রিম পরিবেশে নয়, হোয়েল শার্কদের নিজস্ব জলরাজ্যে, প্রশান্ত মহাসাগরের উষ্ণ মণ্ডলে। হেয়ারডালের রোমাঞ্চকর বিবরণ থেকে এই জন্তুটির পরিচয় পাওয়া যাবে।

* থর হেয়ারডালের কথা

অনেক পণ্ডিতের ধারণা ছিল অতি প্রাচীনকালে পলিনেশিয়ায় প্রাচ্যদেশীয় লোকেদের বসতি হয়েছিল। নরওয়ের জীববিজ্ঞানী থর হেয়ারডাল কিন্তু অন্য মত পোষণ করতেন। তাঁর ধারণা, পেরু থেকে শ্বেতকায় জাতির লোকেরা প্রশান্ত মহাসাগরে পাড়ি দিয়ে পলিনেশিয়ায় এসে লোক বসতি গড়ে তোলে কিন্তু এই মতের বিরুদ্ধে প্রধান যুক্তি ছিল দুই দেশের মধ্যে দুস্তর সমুদ্রের বাধা। যেযুগে যান্ত্রিক জলযান ছিল না, পালতোলা জাহাজের ওপর নির্ভর করতে হত, সমুদ্র পাড়ি দেবার জন্য কাঠের জাহাজ তৈরীর কৌশল জানা ছিল কিনা সন্দেহ, সেইযুগে সাড়েচারহাজার মাইল সাগর অতিক্রম করে পেরুর অধিবাসীদের পলিনেশিয়ায় আসা কি সম্ভব? এই যুক্তি খণ্ডন করা চলে কিনা বাস্তবে তার পরীক্ষা করতে থর হেয়ারডাল উদ্যোগী হলেন। পাঁচজন সঙ্গীসহ পেরুর পাহাড় থেকে সংগ্রহ করা বালসাকাঠের তৈরি ভেলায় পাল খাটিয়ে ৪,৩০০ মাইল সমুদ্রপথ ১০১ দিনে অতিক্রম করে পলিনেশিয়ায় উপস্থিত হন। ঐ ভেলা তৈরি করতে লোহার ব্যবহার করেননি, কারণ যে-কালে পেরুর লোকেরা সমুদ্র পাড়ি দিয়েছিল তখন হয়ত লোহার ব্যবহার জানা ছিল না। পেরুর পাহাড়ে উৎপন্ন একপ্রকার লতা দড়ির কাজে ব্যবহার করা হয়েছিল ধরে নিয়ে তিনিও ঐ রকম লতার বাঁধন দিয়েই ভেলা তৈরি করেন। হেয়ারডাল দেখাতে চেয়েছিলেন, তৎকালীন অবস্থায় পেরু থেকে পলিনেশিয়ামুখে অভিযাত্রী লোকেরা কিভাবে মহাসমুদ্র পার হয়ে এসেছিল। হেয়ারডালের অভিযানের কাহিনী তাঁর লেখা 'কনটিকি' (Kon-Tiki) গ্রন্থে আকর্ষণীয়ভাবে বিবৃত হয়েছে। হোয়েল শার্কের সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটে প্রশান্ত মহাসাগরে। সেই মোলাকাত যেমন আকস্মিক তেমনি উত্তেজনাপূর্ণ। হেয়ারডালের কথায়—

সমুদ্রতলদেশ থেকে যেসব প্রাণী আসত তাদের দেখে দেখে আমরা অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিলাম। তবু যখনি কোন নতুন জাতের প্রাণী এসে হাজির হত, তখন

আমরা বিস্মিত হয়ে যেতাম। একদিন মেঘাচ্ছন্ন রাত্রি, প্রায় দু'টা হবে ; যে হাল ধরেছিল তার পক্ষে কালো আকাশ থেকে কালো জল পৃথক করা কঠিন মনে হচ্ছিল। সে জলের তলায় অস্পষ্ট আলো দেখতে পেল। ঐ আলো ধীরে ধীরে এক প্রকাণ্ড জন্তুর আকার ধারণ করল। এর গায়ের ওপর প্ল্যাংকটনগুলো উজ্জ্বল দেখাচ্ছিল, না তা এর নিজেরই আলো বলা সম্ভব ছিল না। কিন্তু কালো জলের তলায় আলোর দীপ্তিতে এই ভৌতিক জীবের দেহ আঁকাবাঁকা মনে হচ্ছিল। কখনও মনে হয় জন্তুটি গোলাকার, কখনও বা ডিম্বাকার বা ত্রিভুজাকার ; আবার হঠাৎ দুই খণ্ড হয়ে অংশ দুটি পৃথকভাবে ভেলার নিচ দিয়ে এদিক-ওদিক চলে বেড়াতে লাগল। শেষ পর্যন্ত দেখা গেল, তিনটি বিরাট ভৌতিক দানব আমাদের চারদিকে জলের তলা দিয়ে ধীরে ধীরে চক্রাকারে ঘুরছে।

এরা আসল দানব। কারণ শুধু যে-অংশটুকু দেখা যাচ্ছিল, তাই পাঁচ বাঁও (৬ ফুট = ১ বাঁও) লম্বা। আমরা সবাই ছুটে এসে ভেলার ডেকে জড়ো হলাম এবং এই ভৌতিক নৃত্য দেখতে লাগলাম। ভেলা অনুসরণ করে এই রকম খেলা চলতে লাগল ঘণ্টার পর ঘণ্টা। আমাদের রহস্যময় নিঃশব্দ উজ্জ্বল সঙ্গীরা রইল জলের অনেকখানি নিচে, কখনও ঠিক ভেলার নিচে, কখনো বা ডানে বা বাঁপাশে। এদের পিঠের ওপরকার আলো দেখে বোঝা যাচ্ছিল ওরা তিমি নয়। কেননা শ্বাস নেবার জন্য তারা একবারও জলের ওপরে উঠে আসেনি। ওরা কি দানব রে-মাছ যা ঘুরলে ফিরলে চেহারা ভিন্ন রকম দেখায়? ওরা কী ধরণের জীব জানার জন্য আমরা যখন একেবারে জলের কাছাকাছি আলো ধরছিলাম তারা সেদিকে ভ্রুক্ষেপমাত্র করেনি। ভূত-প্রেতের মতই দিনের আলো প্রকাশ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ওরা গভীর সমুদ্রের অতলে মিলিয়ে গেল।

তিনটি আলো ছড়ানো দৈত্যের নৈশ আবির্ভাবের আসল ব্যাখ্যা আমরা করতে পারতাম না যদি দেড় দিন পরে পূর্ণ মধ্যাহ্ন দিনের আলোয় আবার তাদের দেখা না পেতাম। সেদিন ২৪ মে। আমাদের ভেলা ৯৫° পশ্চিমে, ৭° দক্ষিণে মৃদুমন্দ বাতাসে ধীরে সুস্থে ভেসে চলেছিল। দুপুর বেলা। সকালে আমরা যে দুটো বড় ডলফিন ধরেছিলাম তাদের নাড়িভুড়ি জলে ফেলে দিয়েছি। ভেলার পিছন দিকে বাঁধা দড়ি ধরে আমি জলে নেমে গা ডুবিয়ে আরাম করছিলাম, দৃষ্টি ছিল সজাগ। এমন সময় দেখি স্ফটিক স্বচ্ছ জলে মোটা বাদামি রঙের ৬ ফুট লম্বা একটা মাছ অনুসন্ধিৎসুভাবে সাঁতার কেটে আমার দিকে এল। আমি তাড়াতাড়ি ভেলায় লাফ দিয়ে উঠে পড়লাম এবং রোদে বসে দেখতে লাগলাম। মাছটি শান্তভাবে পাশ দিয়ে চলে গেল। বাঁশের কেবিনের পাশে নুট বসেছিল। হঠাৎ সে দারুণ উত্তেজিত হয়ে চিৎকার করে উঠল—হাঙর, হাঙর! সে এমনভাবে চেঁচাতে লাগল যে তার গলা

ভেঙে গেল। প্রায় প্রতিদিন আমরা ভেলার কাছ দিয়ে হাঙ্গরকে যেতে দেখি কিন্তু কখনও তো এমন উত্তেজনা প্রকাশ পায়নি! তবে কি বিশেষ কোন জীবের আবির্ভাব হল? আমরা নুটের সাহায্যে ছুটে গেলাম।

নুট সেখানে বসে তার প্যাণ্টটি জলে নামিয়ে দিয়ে ধুয়ে নিচ্ছিল। সামনের দিকে চাইতেই বিশাল বিকট এক জানোয়ারের ওপর তার দৃষ্টি পড়ল। এমন প্রকাণ্ড ও কুৎসিৎ জীব সে জীবনে দেখেনি। রীতিমত এক সাগর-দানবের মাথা। এমন কদাকার এবং বিপুল তার আয়তন যে, উপকথার সাগরের আদিম-বুড়ো উঠে এলেও আমরা এমন অভিভূত হতাম না। মাথাটি চওড়া ও চ্যাপ্টা, ব্যাঙের মাথার মত, দুপাশে দুটি ছোট চোখ, চার-পাঁচ ফুট চওড়া ব্যাঙের চোয়ালের মতই চোয়াল, দু'পাশ থেকে লম্বা ঝালর মত চামড়া ঝুলে পড়েছে। মাথার পিছনে প্রকাণ্ড শরীর শেষ হয়েছে গিয়ে সরু লম্বা লেজে, লেজের আগাটি সোজা ওপরে উঠেছে। এ দেখে বোঝা যাচ্ছিল, দানবটি তিমি নয়। গায়ের রঙ জলের মধ্যে দেখাচ্ছিল বাদামি, মাথায় ও শরীরের সর্বত্র ছোট ছোট বহু সাদা ফুটকি।

জানোয়ারটা শান্ত অলসভাবে সাঁতার কেটে আমাদের ভেলার পিছনে পিছনে আসতে লাগল। মুখে বুলডগের মত দাঁত-বের-করা হাসি, লেজ নড়ছে ধীরে ধীরে। পিঠের ওপরকার বিরাট পাখনা জলের ওপর জেগে আছে, মাঝে মাঝে লেজের কাছেকার পাখনাও জলের ওপর দেখা যাচ্ছে। তার বিরাট দেহটা যখন দুই ঢেউ-এর মাঝখানে পড়ে, ডুবো পাহাড়ের চূড়ার মত তার চওড়া পিঠের ওপর দিয়ে জল গড়িয়ে যায়। তার প্রকাণ্ড চোয়ালের সামনে বড় একঝাঁক জেব্রা-দাগকাটা পাইলট মাছ পাখার মত ছড়িয়ে সাঁতরে চলেছে, জানোয়ারটার গায়ে এঁটে বসে আছে বড় বড় রিমোরা মাছ আর অনেক পরাশ্রয়ী যারা বিনা পরিশ্রমে ভ্রমণ করছে। এদের সব নিয়ে জন্তুটিকে মনে হচ্ছিল অদ্ভুত জীব-বহনকারী ভাসমান গভীর জলের পাহাড়চূড়া।

ছয়টি বড় বড়শিতে গাঁথা ২৫ পাউন্ড ওজনের একটি ডলফিন ভেলার পিছন দিকে জলের মধ্যে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছিল হাঙ্গরদের টোপ হিসাবে। একঝাঁক পাইলট মাছ ছুটে এল ডলফিনের কাছে, নাক দিয়ে শুঁকল কিন্তু স্পর্শ করল না। তারপর তাদের প্রভু সাগররাজার কাছে খবর দিতে চলে গেল। বিশাল এক যান্ত্রিক দানবের মত সে ধীর গতিতে ডলফিনের দিকে এল। ডলফিন তার মুখের তুলনায় অতি তুচ্ছ সামান্য একটুখানি খাবার। আমরা ডলফিনটিকে আস্তে আস্তে টানি, সাগরদানবও ধীরে ধীরে এগিয়ে আসে, একেবারে আমাদের ভেলার পাশে। এর মুখ খোলার দরকারই হল না। সামান্য একটু ফাঁক করাতেই ডলফিনটি চলে গেল মুখের মধ্যে। এই সামান্য খাবারটুকুর জন্য মুখের দরজাটা পুরো খোলা এর পক্ষে সাজে না। ভেলার কাছে এসে দানবটা

ভেলার ভারি হালটার সঙ্গে পিঠ ঘসল, সঙ্গে সঙ্গে সেটি জলের থেকে শূন্যে উঠে পড়ল। আমাদের তখন এই সাগরদানবকে ভাল করে দেখার সুযোগ হল। এত কাছে থেকে একে দেখতে পারায় আমরা যেন উন্মাদের মত হাসি আর হৈ-হুল্লোড় করতে লাগলাম। এমন অদ্ভুত দৃশ্য জীবনে আমরা দেখিনি। ওয়াল্ট ডিজ্‌নি তাঁর সব কল্পনাশক্তি নিয়েও এমন রোমহর্ষক সাগরদানব সৃষ্টি করতে পারতেন না, যে তার ভয়ংকর চোয়াল নিয়ে আমাদের ভেলার পাশে হাজির।

দানবটি হোয়েল শার্ক, সবচেয়ে বড় হাঙর এবং পৃথিবীতে সর্ববৃহৎ মৎস্য। এরা অত্যন্ত দুষ্প্রাপ্য। উষ্ণমন্ডলের সমুদ্রে এখানে-ওখানে মাঝে মাঝে দু-একটির দেখা মেলে।

হোয়েল শার্কের গড় দৈর্ঘ্য ৫০ ফুট এবং জীববিজ্ঞানীদের মতে ওজন ১৫ টন। বলা হয়, ৬০ ফুট পর্যন্ত লম্বা হতে পারে। হারপুন-দিয়ে মারা একটা শিশু হোয়েল শার্কের যকৃতের ওজন ছিল ৬০ পাউন্ড এবং এক একটি চোয়ালে পাওয়া গিয়েছিল ৩০০০ করে দাঁত।

আমাদের দৈত্যটি এত বড় যে, সে যখন আমাদের চারদিকে এবং ভেলার তলা দিয়ে সাঁতরাচ্ছিল এর মাথা দেখা যাচ্ছিল এক পাশে, সারা দেহ এবং লেজের অংশ জলের ওপর জেগে ছিল অন্য পাশে। একে যখন সামনাসামনি দেখি জন্তুটাকে এমন কিম্ভুতকিমাকার, স্থূল নিরেট নির্বোধ মনে হচ্ছিল যে, আমরা হো-হো করে না হেসে পারিনি যদিও আমরা জানতাম এর এমন শক্তি যে আক্রমণ করলে বালসা-কাঠ, দড়িকাছি সব লেজের ঝাপটে ভেঙেচুড়ে নস্যাৎ করে দিতে পারে। বারে বারে এটি ভেলার নিচে ছোট চক্রাকারে পাক খাচ্ছিল ; শেষ পর্যন্ত ও কি করে দেখার জন্য আমরা অপেক্ষা করতে লাগলাম। ও যখন ভেলার এক পাশে আসে, দাঁড়ের নিচ দিয়ে চলার সময় পিঠে লেগে দাঁড়ের ফলক উঁচু হয়ে উঠে পিঠের ওপর দিয়ে পিছলে যায়।

হারপুন বল্লম নিয়ে আমরা ভেলার চারদিকে কাজের জন্য তৈরি হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম কিন্তু ঐ দানবের দেহের তুলনায় বল্লমকে মনে হল দাঁত-খড়কে। সাগর-দানব যে আমাদের ছেড়ে যাবে তার কোন লক্ষণ দেখা গেল না। বিশ্বস্ত কুকুরের মত সেটা আমাদের ভেলা প্রদক্ষিণ করে ধীরে ধীরে অনুসরণ করতে লাগল। আমাদের কেউই কখনো এমন দেখেনি, কল্পনাও করেনি এমন কিছু ঘটতে পারে। সাগরদানব আমাদের সঙ্গে চলেছে, কখনো ভেলার নিচে কখনো পাশে —এ ঘটনা এমনই অস্বাভাবিক যে আমরা এটাকে আদপেই গুরুতর ব্যাপার বলে মনে করতে পারছিলাম না।

আসলে হোয়েল শার্কটি আমাদের সঙ্গে এক ঘন্টার বেশি ছিল না কিন্তু আমাদের মনে হচ্ছিল ওটি যেন সারাটি দিনই আমাদের সঙ্গে রয়েছে। আট ফুট

লম্বা হাপুন নিয়ে এরিক ভেলার এক কোণায় দাঁড়িয়েছিল। সে এমন উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল যে, সে হাপুনটা মাথার ওপর উদ্যত করে তুলল এবং জন্তুটা যেই ধীরে ধীরে ভেলার কোণায় এসেছে অমনি সে দুই হাত দিয়ে প্রচন্ড জোরে বল্লমটি হোয়েল শার্কের মাথায় বসিয়ে দিল। প্রথম দুই-এক সেকেন্ড শার্ক বুঝতেই পারেনি কি হয়েছে। তারপর সেই নির্বোধ জানোয়ারটা ইস্পাত-মাংসপেশী দিয়ে গড়া পাহাড়ের মত মুহূর্তে সচকিত হয়ে উঠল।

হাপুনের দড়ি ভেলার প্রান্ত দিয়ে শ-শ-শ শব্দে ছুটে চলতে লাগল। দানব মাথা জলের মধ্যে দিয়ে লেজ খাড়া করে, শূন্যে জলের ফোয়ারা তুলে ডুব দিল। যে-তিনজন দড়ির কাছে দাঁড়িয়েছিল তারা ছিটকে উল্টে পড়ল। দুজন হাতে দড়ি ধরেছিল তাদের তালুর ছাল উঠে গেছে, ফোস্কা পড়ে গেছে। মোটা দড়ি দিয়ে নৌকা আটকে রাখা যেত, কিন্তু ভেলার প্রান্তে লেগে সুতার মত পটাস করে ছিঁড়ে গেল। এর কয়েক সেকেন্ড পরে বল্লমের ভাঙা হাতল দুশো গজ দূরে
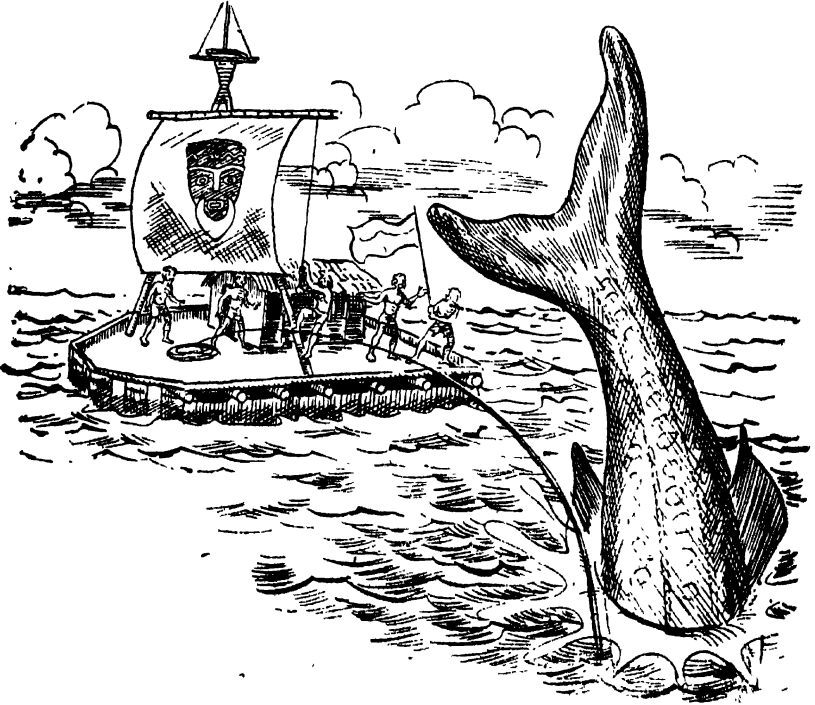
বল্লমের আঘাতে আহত দ্রুতবেগে পলায়নরত হোয়েল শার্ক

জলের ওপর ভেসে উঠল। এক ঝাঁক পাইলটমাছ তাদের প্রভুর সঙ্গ নেবার জন্য জলের ভিতর দিয়ে বেগে ছুটে গেল। আমরা অনেকক্ষণ অপেক্ষা করলাম,- হয়ত ক্রুদ্ধ সাবমেরিনের মত দানবটা ছুটে আসবে আমাদের দিকে। কিন্তু তার আর কোন হদিশ আমরা পেলাম না।

* গঙ্গায় হাঙর যুদ্ধ

জনৈক প্রত্যক্ষদর্শীর পত্র

'জনবুল' সম্পাদক সমীপেষু।

মহাশয়,

অল্প কিছুদিন আগে এই এলাকায় এক বিহারী মাল্লা যে রকম দুঃসাহস ও কৌশলের পরিচয় দিয়েছে তা লিখে রাখার মত। যখন সে অসাধারণ নির্ভীকতা ও অবিচলিত মানসিক শক্তির প্রকাশ দেখাচ্ছিল, ঘটনাক্রমে আমি সেখানে উপস্থিত ছিলাম। সত্য বলতে কি, সেখানে যা ঘটেছিল তা স্বচক্ষে না দেখলে আমি বিশ্বাসই করতাম না। আমি গঙ্গার তীরে বেড়াচ্ছিলাম। ঐ সময় গঙ্গার ঘাটে আপ্‌কাম্প্রির কতকগুলি নৌকা থেকে মাল খালাস করা হচ্ছিল। এই ব্যাপারে বেশকিছু সংখ্যক কুলী সেখানে কাজ করছিল। হঠাৎ দেখি সকলেই ভয়ে জলের কিনারা থেকে ছুটে পালাচ্ছে, আবার কৌতূহলের বশে ভয়ে ভয়ে ফিরে দেখতে যাচ্ছে। ব্যাপার কি খোঁজ করতে গিয়ে দেখি প্রকাণ্ড এক অদ্ভুত রকম দেখতে মাছ তীরের, কাছে এবং প্রায় নৌকাগুলির মাঝে সাঁতার কাটছে। আমি জানতাম এ নদীতে কুমীরের অভাব নেই, তাই প্রথমেই আমার মনে হয়েছিল প্রাণীটা বোধহয় ঐ রকম এক ভয়ংকর জীব। কিন্তু কুমীরের সঙ্গে এইসব মাঝিমাল্লাদের তো হামেশাই দেখা সাক্ষাৎ হয়ে থাকে। সঠিক বিষয়টা কি জানতে আমি দ্রুত যখন ঐ স্থানে গিয়ে উপস্থিত হলাম তখন দেখি, প্রকাণ্ড এক হাঙর কখনো জলের ওপর স্তরে সাঁতরাচ্ছে, কখনো শিকার ধরতে জলের নিচের দিকে চলে যাচ্ছে। দেখলাম বাঁশের ছইয়ের ওপর এক ব্যক্তি ধীরে ধীরে হাতে দড়ি গুছিয়ে নিচ্ছে আর হাঙরটির চলাফেরা লক্ষ্য করছে, স্পষ্টই মনে হল লোকটি হাঙরের সঙ্গে জলের মধ্যেই মোকাবিলা করতে চায়। এক প্রান্তে ফাঁস-গিঁট দেওয়া গুটানো দড়িটা ধরে, অন্য হাত উঁচু করে তুলে যেন সাঁতরাচ্ছে এমনই মনোহর দর্শনীয় শিকারীর ভঙ্গিতে সে দাঁড়াল এবং হাঙরের জন্য প্রতীক্ষা করতে লাগল। নৌকা থেকে ৬ কি ৮ গজ দূরে হাঙরটি যেমনি জলের ওপর জেগে উঠল, সেই মুহূর্তে লোকটি হাঙরের একেবারে মুখের কাছে ঝাঁপ দিয়ে পড়ল। হাঙর তৎক্ষণাৎ ঘুরে ধীরে সুস্থে তার দিকে

আসতে লাগল। লোকটি কিছুমাত্র ভয় না পেয়ে একহাতে জল কেটে দুষমনের কাছে এগিয়ে গেল। হাঙ্গরের দুই এক ফুটের মধ্যে গিয়ে ডুব দিয়ে হাঙ্গরের নিচের দিকে চলে গেল সে। হাঙ্গরও সঙ্গে সঙ্গে তার পিছু নিয়ে ডুব দিল। তারপরেই অসমসাহসী মানুষটি হাঙ্গরের অপর দিকে গিয়ে জেগে উঠল এবং একহাতে দড়ির প্রান্ত ধরে অন্য হাত দিয়ে সাঁতরিয়ে তীরের দিকে আসতে লাগল, হাঙ্গরটিও জেগে উঠল এবং তার পিছু নিল। হাঙ্গর যখন শিকার কামড়ে ধরার জন্য লোকটির নিম্নাঙ্গের ওপর ওঠার চেষ্টার করল, মাল্লা অদ্ভুত কৌশলে জল থেকে সোজা লাফিয়ে উঠেই আবার জলের মধ্যে পা নামিয়ে ঝাঁপ দেওয়ার মত ভঙ্গিতে ডুব দিল। সঙ্গে সঙ্গে হাঙ্গরটাও; আমার ধারণা হল ওরা দুজনে ধস্তাধস্তি করতে করতে জলে ডুবল। আমার বিবেচনায় প্রায় ২০ সেকেন্ড তারা রইল দৃষ্টির বাইরে। আমি তখন উৎকণ্ঠায়, ভয়ে এই ভয়ংকর লড়াইয়ের পরিণতি দেখার জন্য অপেক্ষা করছি। অকস্মাৎ লোকটিকে আবার দেখা গেল, দুই হাত তার মাথার ওপর এবং বিজয়ীর মত কণ্ঠস্বরে চিৎকার করে সে বলছে —'টান টান!' নৌকার লোকেরা সবাই তৈরি ছিল। দড়ি তক্ষুণি টেনে শক্ত করা হল এবং আস্ফালন করতে থাকলেও হাঙ্গরকে টেনে ডাঙায় তুলে শেষ করে ফেলা হল। যখন মাপ নেওয়া হল, দেখা গেল হাঙ্গরটি লম্বায় ৬ ফুট ৯ ইঞ্চি, মোটা অংশের বেড় ৩ ফুট ৭ ইঞ্চি। লড়াইয়ে বিজয়ী মানুষটির বিশেষ কোন আঘাত লাগেনি। তার বাঁ হাত কিছুটা কেটে গিয়েছিল মাত্র। এইটিই হাঙ্গরের সঙ্গে তার প্রথম মোলাকাত কিনা একথা তাকে জিজ্ঞেস করিনি কিন্তু লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত থাকা এবং সহযোগীদের সাহায্য করা দেখে মনে হল, এর আগেও এমন হিম্মৎ সে দেখিয়েছে। এই ঘটনা দেখে আমি বিস্মিত না হয়ে পারিনি। এ দৃশ্য আমি জীবনে কোনদিন ভুলব না।

জনৈক প্রত্যক্ষদর্শী

(ক্যালকাটা গেজেট, বৃহস্পতিবার, ২৮ মে, ১৮২৯
The Days of John Company, p. 382")

যাদের লেজে বিষ

* স্টিং রে (Sting Ray, Condrichthyes)

হাঙর ভয়ংকর এই কারণে যে, তার কবলে পড়লে মানুষ নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে, হয় আস্ত তার গহ্বরসদৃশ উদরে, আর না হয় দাঁতের পেষণে হাড়মাংস মন্ডে পরিণত হবে। হাঙরদের মতই নমনীয় অস্থি দিয়ে গঠিত দেহ স্টিং রে মানুষকে তেড়ে

স্টিং রে (Sting Ray)

আক্রমণ করে না কিন্তু তাদের প্রাণের ভয় জাগিয়ে দিলে তারা মারাত্মক হয়ে উঠতে পারে। তখন তাদের অস্ত্র হাঙরের মত দাঁত নয়, বিষ মাখানো বল্লম, এটি হল লেজ।

স্টিং রে জলের তলায় কাদাবালির মধ্যে প্রায় অদৃশ্য হয়ে চুপটি করে শুয়ে থাকে। গায়ের রঙও এমন যে, পরিবেশের সঙ্গে মিশে থাকার ফলে সহজে চোখে পড়ে না। স্নান করতে নেমে কেউ বা সাগরতলে ডুবুরি যদি এদের ওপর পা ফেলে তবে এরা লেজের মাংসপেশী শক্ত করে, লেজের আগায় বসানো কাঁটাওয়ালা বল্লম আক্রমনকারীর দেহে সজোরে ঢুকিয়ে দেবে। লেজের আগার দিকে আছে বিষগ্রন্থি, তা থেকে বিষ গিয়ে মিশবে মানুষের রক্তে। লেজের বল্লমে দাঁতের মত খাঁজকাটা থাকায় মাংস ছিঁড়ে রক্তে বিষ চালিয়ে দেওয়ার সুবিধা। গ্রীক মহাকাব্যের বীরনায়ক ইউলিসিস নাকি যে বল্লমের আঘাতে নিহত হয়েছিলেন, তা তৈরী হয়েছিল স্টিং রে-র হুলসমেত মেরুদণ্ড দিয়ে।

স্টিং রে নিজের শক্তি সম্বন্ধে সচেতন বলেই বোধ হয় দ্রুত পালিয়ে প্রাণ বাঁচানোর চেষ্টা করে না। বিষধর সাপের ক্ষেত্রেও এরূপ নির্ভীক আচরণ ও মন্থরতা দেখা যায়। কিন্তু নির্বিষ সাপেরা সাধারণত ক্ষিপ্রগতি ; গতিই তাদের জীবন রক্ষার প্রধান উপায়।

স্বচ্ছ জলের মধ্যে চ্যাপ্টা স্টিং রে-কে বালির ওপর নিশ্চল হয়ে থাকতে দেখলে মনে হবে বড় একখানা মোরাদাবাদী ট্রে, রঙিন, কারুকার্যকরা ; লেজটি যেন লম্বা হাতল। কিন্তু সাবধান ! 'ট্রে' কিন্তু চেয়ে আছে। পাকা সফেদা ফলের মত চোখদুটি পিঠের ওপর বসানো। মুহূর্তে লেজটাকে যেকোন দিকে ঘুরিয়ে 'শক্তিশেল' হানতে পারে।

কখনো কখনো স্টিং রে বালির মধ্যে শরীরটা আধাআধি ঢুকিয়ে গায়ের রঙ বালির রঙের সঙ্গে মিশিয়ে চুপটি করে থাকে, মানুষ ধরার জন্য নয়, তার নিজের শিকার ধরার জন্য। মানুষ যদি অসতর্ক হয়ে তার গায়ের ওপর পা ফেলে সে তাকে ভুলের জন্য শিক্ষা দিয়ে দেবে।

প্রবাল উদ্যানের মধ্যে বিচিত্র রঙের ও বিচিত্র আকারের প্রবাল আর তার মধ্যে বিচরণরত নানাধরণের রঙিন মাছ ও অন্যান্য প্রাণী রয়েছে। এরা স্টিং রে-র ভক্ষ্য। ধাওয়া করে ধরার চেয়ে স্টিং রে ছদ্মবেশ ধারণ করে খাদ্যকে বোকা বানায়। ছোট প্রাণীগুলো রে-কে প্রবালগুচ্ছ ভেবে নিঃসংকোচে তার কাছে আসে, মুখের কাছে যায়। তখন খোলা চোয়ালটি ক্ষণতরে বন্ধ করলেই ভোজ্যবস্তু উদরে গিয়ে স্থান পায়। কিন্তু যে ডুবুরিরা প্রবাল সন্ধানে সাগর-রাজার এই বিচিত্র উদ্যানে হাজির হয়, তাদের প্রতি পদক্ষেপেই সতর্ক হয়ে লক্ষ্য করতে হয়। স্টিং রে এখানে বহুরূপীর সাজ নিয়ে স্থানের সঙ্গে নিজেকে বেমালুম মিশিয়ে রাখে। প্রবালকুঞ্জের রে-রা রঙিন প্রবালের পাশে বা পাহাড়ের গায়ে শুধু চোখটি সজাগ রেখে নীরবে অবস্থান করে। তাদের খোলা মুখকে ছোট মাছেরা মনে করে পাহাড়ের ফাটল বা প্রবাল ঝাড়ের মুলসুড়ঙ্গ। কৌতুহলী মাছ চল্লিশ দস্যুর রত্নগুহার মত এদের মুখের মধ্যে প্রবেশ করলে সঙ্গে সঙ্গে মুখ-গুহার দরজা বন্ধ হয়ে যায়। চি-চিং ফাঁক করবে কে ? আগন্তুককে একেবারে উদরের পাতালপুরীতে পাঠানোর পর দরজা-পাল্লা আবার খুলে যায়, পরের অভ্যাগতের জন্য চলে প্রতীক্ষা।

স্টিং রে-রা যেমন আত্মগোপন-কৌশলী এদেরই এক জাতভাই তেমনি বড় ও দর্শনীয় তার চলাফেরা। এটি বিশাল ম্যান্টা-রে।

* জায়ান্ট ম্যান্টা-রে (Giant Manta Ray)

অগভীর জলে এবং সমুদ্রপৃষ্ঠের ওপরতলে এদের চলতে দেখলে মনে হবে বিরাট চিত্রিত ডানাওয়ালা পাখি সাবলীল ভঙ্গিতে জলের মধ্যে উড়ে চলেছে।

সামনের দিকের পাখনাদুটি বড় হয়ে ছড়িয়ে পড়ায় এদের হাঙ্গরের ডানার মত অঙ্গ বলে মনেই হয় না। অথচ এরা হাঙ্গরগোষ্ঠীভুক্ত। ২০ থেকে ২৫ ফুট চওড়া, ওজন ৩ হাজার পাউন্ড। বিরাট চ্যাপ্টা দেহ, যেমন ক্ষিপ্রগতি তেমনি লাফানোর ক্ষমতা। হাইজাম্পে তাদের সমকক্ষ কেউ নেই। জলের ওপর ১৫
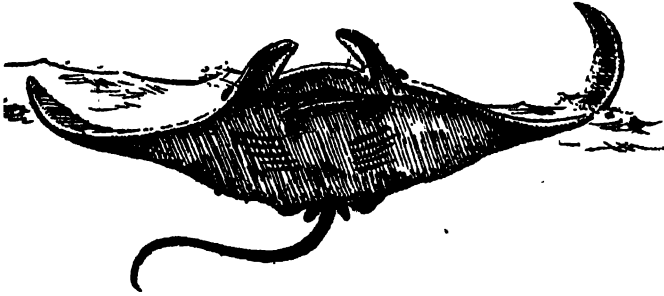
জায়ান্ট ম্যান্টা-রে (**Giant Manta Ray**)

ফুট লাফিয়ে উঠে কিছুদূর হাওয়ায় ভেসে চ'লে জলের ওপর যখন চওড়াভাবে পড়ে, বোমা ফাটার মত আওয়াজ শোনা যায়। ঐভাবে যদি মানুষের ওপর এসে পড়ে তার মৃত্যু নিশ্চিত কিন্তু মানুষ এদের খাদ্য নয়। অদ্ভুত মনে হবে, এই বিরাটকায় প্রাণীর খাদ্য কুচোচিংড়ি জাতীয় প্রাণী, বড় কিছুই না।

ম্যান্টার জলক্রীড়া দেখার মত। বিশাল সাগর-পাখির মত আধাজল-আধাশূন্য লাফ দিয়ে নানা ভঙ্গিতে ছুটে চলা ও মাঝে মাঝে শূন্যে লাফিয়ে কখনো থপাস্ করে কখনো বা থালার মত কাৎ হয়ে এক ডানা জলের মধ্যে চালিয়ে দিয়ে ঝলাৎ করে ডুবে যাওয়া। অনেকের ধারণা, ম্যাণ্টা-রে শূন্যে ও জলের ওপর লাফিয়ে তার এলাকার ওপর অধিকার ঘোষণা করে। একজন প্রত্যক্ষদর্শী একটি ম্যান্টা-গৃহিনীকে শূন্যে লাফিয়ে সন্তান প্রসব করতে দেখেছেন। 'জলস্থ' নয়, 'ভূমিষ্ঠ' নয়, 'শূন্যস্থ' বলা চলে। এটা আকস্মিক ব্যাপারও হতে পারে। সব ম্যান্টা-জননীই যে শূন্যে সন্তানের জন্ম দেয়, তা বলা যায় না। শূন্যে লাফিয়ে ওঠার কারণ শুধু আনন্দের অভিব্যক্তি নয়। ম্যান্টার বিশাল চওড়া সমতল ডানার তলদেশে রিমোরা মাছেদের বিনা টিকিটের যাত্রী হয়ে চলার খুব সুবিধা। তাই ম্যান্টার দেহে রিমোরা শোষক মাছেরা ঝাঁক ধরে আটকে থাকে। মাঝে মাঝে ঝাঁকানি দিয়ে এদের ফেলে দেওয়া দরকার হয়ে পড়ে।

ম্যাণ্টা-রে-দের মাংসপেশীতে অসাধারণ শক্তি। একবার ২২ ফুট চওড়া ডানাওয়ালা এক ম্যান্টা দেহে ৪টি হাপুর্ন বল্লম ও ৬টি বুলেট বিঁধান অবস্থায় ২৫ ফুট লম্বা এক মোটর বোট ১০ মাইল টেনে নিয়ে গিয়েছিল।

উষ্ণমন্ডলের সমুদ্র ম্যান্টাদের বিচরণক্ষেত্র। যেহেতু এরা ডলফিনদের মত নিরীহ এবং সাগরের ওপরতলের বাসিন্দা এদের নিয়ে মানুষ অনেক সময় নিষ্ঠুর খেলা খেলে। মেক্সিকোর জেলেরা দড়িলাগানো হারপুন ম্যান্টার গায়ে বিঁধিয়ে তাকে সাগরঅশ্ব বানিয়ে তাকে দিয়ে বেগে ছোট ডিঙি টানায়। অনেক সময় ট্যুরিস্টদের কাছে এই নতুন ধরণের সাগরদৌড় আকর্ষণীয় হয় বটে, তবে এটা নিষ্ঠুর খেলা বই ত কিছু নয়।

* স্পটেড ঈগল-রে (**Spotted Eagle Ray**)

গায়ে অসংখ্য ফুটকি চিহ্ন, বিশাল পাখনা, ডানাদুটি সুশ্রী ভঙ্গিতে দুলিয়ে এই রে যখন জলের মধ্যে ধীরে ধীরে চলে তখন দেখলে মনে হবে এর স্পটেড ঈগল-রে নাম সার্থক, এ যেন বিশাল জলের ঈগল, শিকার সন্ধানে বেরিয়েছে। চাবুকের মত প্রসারিত এর লেজ জলের মধ্যে হালের কাজ করে। স্পটেড ঈগল-রে-র মুখটি লম্বা, চোয়াল বেশ শক্তিশালী। শামুক, ঝিনুক ও অন্যান্য খোলসযুক্ত
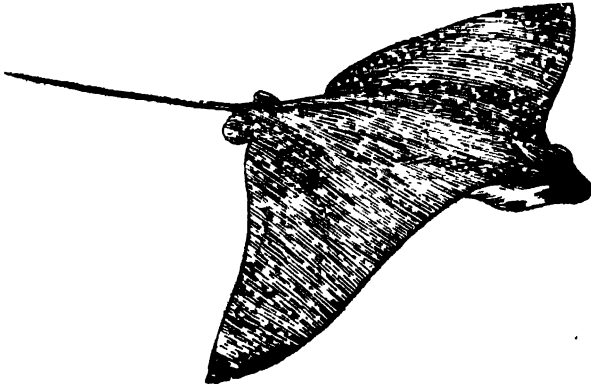
স্পটেড ঈগল-রে (**Spotted Eagle Ray**)

প্রাণী এদের প্রধান খাদ্য। শক্ত চোয়াল শক্ত খোলস ভাঙার উপযোগী।

* থর্নি স্কেট (**Thorny Skate**)

সাগর উপকূলে অল্প গভীরে বালুর ওপর নিশ্চল হয়ে শুয়ে থাকে। ভূমির রঙের সঙ্গে এমনভাবে মিশে থাকে যে, সহসা চোখে পড়বে না। এদের পিঠ থেকে কাঁটাগুচ্ছ বেরিয়ে এদিক ওদিক ছড়িয়ে থাকে। স্নান করতে নেমে কেউ

এদের ওপর পা ফেললে সঙ্গে সঙ্গে মনে হবে তীক্ষ্ন তীর বিঁধে গেছে গায়ের
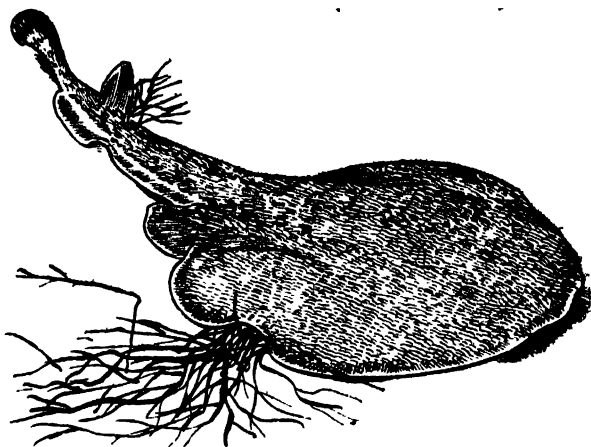
থর্নি স্কেট (Thorny Skate)

মধ্যে। ভাল রকম আহত হলে প্রাণ সংশয়। অল্পস্বল্প হলেও যন্ত্রণা ও ঘা সারতে বেশ সময় নেবে।

* করাত মাছ [Saw fish]
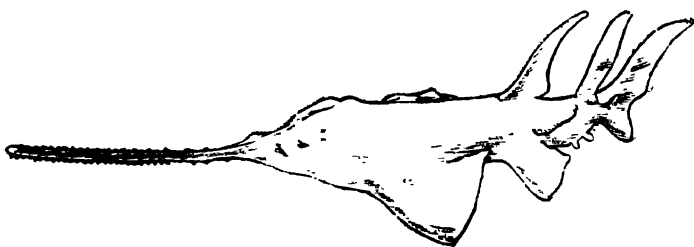
করাত মাছ [Saw fish]

সামনে প্রসারিত একটি চ্যাপ্টা ফলক, ৬ ফুট লম্বা। তাতে দুই ধারে খাঁজকাটা দুই সারি দাঁত। ঠিক যেন একখানা করাত। মাথার কাছে চওড়া, আগার দিকে সামান্য সরু হয়ে গেছে।

করাতমাছ লম্বায় ২০ ফুট পর্যন্ত হয়। পশ্চিম ভারতীয় সাগরে এর চেয়ে বড় প্রাণীও ধরা পড়েছে। করাত এদের শিকার ধরার মারাত্মক অস্ত্র। মাছের

ঝাঁকের মধ্যে ঢুকে করাতমাছ দুদিকে দাঁতবসান করাত এদিক-ওদিক চালালে মাছ কেটে দুখন্ড হয়ে যাবে, আর কতক জখম হয়ে চলায় অক্ষম হয়ে পড়বে। তখন করাত মাছেদের ভোজনের উৎসব। মাছের ঝাঁকের সন্ধানে এরা ফেরে। মাছ ধরতে জেলেরা জাল ফেললে অনেক সময় করাতমাছ তাতে আটকে পড়ে। করাতমাছ বড় হলে জাল ছিঁড়ে বেরিয়ে যায়, আর ছোট হলে জেলের হাতে আটক হয়। জেলেদের কাছে করাতমাছ রীতিমত শত্রু। কারণ তারা যেমন মাছ খেয়ে এবং মাছেদের ঝাঁক তাড়িয়ে নিয়ে মাছ ধরায় ব্যাঘাত করে তেমনি জাল ছিঁড়ে ফেলে আর্থিক ক্ষতিও করে প্রচুর।

করাতমাছ ও স্পটেড ঈগল-রে বঙ্গোপসাগর থেকে ব্রহ্মপুত্র, মেঘনা, পদ্মা নদীতে উঠে আসত। আমাদের ছেলেবেলায় আমাদের গ্রামের মাঝিদের কাছ থেকে বাচ্চা করাতমাছের করাত [১ ফুট মত লম্বা] ও রে-মাছের কাঁটাজড়ানো লেজ পেতাম। ঐ মাঝিরা পদ্মায় মাছ ধরতে যেত এবং অদ্ভুত কিছু পেলে আমাদের জন্য নিয়ে আসত। করাতমাছের 'করাত' দিয়ে তারা শণের সুতার আঁশ ছাড়িয়ে মসৃণ করার 'চিরুনি' বানাত, শণের সুতায় বুনত মাছধরা জাল। রে-মাছের লেজ, সারা গায়ে তার ছোট ছোট কাঁটা, স্প্রিং-এর চাবুকের মত। বাস্তবিক তা দিয়ে ঘোড়ার চাবুক তৈরি করা হয়েছিল।

বিরাট আকারের করাতমাছ, যার চওড়া পাখনা ডানা তাকে জলের মধ্যে প্রচন্ড বেগে চলতে শক্তি যোগায়, হঠাৎ দেখলে মনে হবে আধুনিক জঙ্গীবিমান, শত্রুকে আঘাত হানতে চলেছে। মধ্যযুগে কাঠের জাহাজ যখন পাল খাটিয়ে সাগর পাড়ি দিত, নাবিকদের ভয় ছিল দুইটি দৈত্য মাছকে—এদের একটি করাতমাছ অন্যটি তরোয়াল মাছ।

* তরোয়াল মাছ [Sword fish, Xiphias gladius]

তরোয়াল মাছ দেখতে যোদ্ধার মতই। ওপরের ঠোঁটটি তরোয়ালের মত লম্বা, শক্ত ও ধারালো। আগার দিকটা সরু হয়ে গেছে। উষ্ণমন্ডলের সমুদ্র এদের বিচরণক্ষেত্র। এরা লম্বায় ২০ ফুট পর্যন্ত হয়, ওজন প্রায় এক হাজার পাউন্ড। তরবারিসদৃশ অস্ত্র নিয়ে এরা কাঠের জাহাজ পাশ থেকে আক্রমণ করে ফুটো করে দিতে পারে। সমুদ্রে কাঠের জাহাজের খোলে জল ঢুকতে শুরু করলে যে নাবিকরা বিপন্ন হত তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই। মানুষকে ধরার জন্য যে তারা জাহাজ আক্রমণ করত তা নয়। হয়ত এরা জাহাজকে মনে করত বড় তিমি। তবে এমন ঘটনাও ঘটেছে যেখানে তরোয়াল মাছ তরোয়াল

জাহাজের তক্তায় ঢুকিয়ে দিয়ে বের করে নিতে পারেনি, ভেঙে রয়ে গেছে জাহাজের গায়ে। সাগরে কোন প্রাণী তার স্বাভাবিক অস্ত্র হারিয়ে টিকতে পারে না। ভগ্ন-অস্ত্র তরোয়াল মাছও করাতমাছের আক্রমণে আত্মরক্ষার হাতিয়ার না থাকায় নিহত হয়ে অপরের ভোজ্য হয়েছে—এরূপ ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছে মধ্যযুগের কাঠের পালতোলা জাহাজের নাবিকেরা।
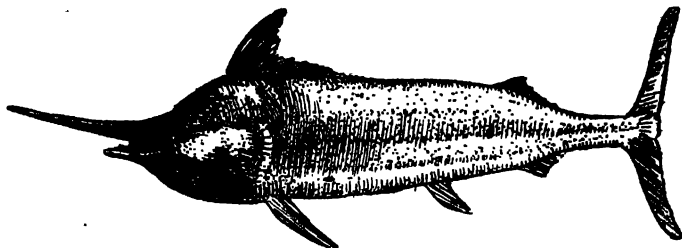
তরোয়াল মাছ [Sword-fish]

তরোয়াল এদের বড় শত্রুর বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার অস্ত্র, ছোটদের বধ করে বা আহত করে খাদ্যসংগ্রহের অঙ্গ। এরা নিজেরাও কিন্তু মানুষের প্রিয় ভোজ্য। গরমকালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পূর্ব উপকূলে আটলান্টিক মহাসাগরে এদের প্রচুর সংখ্যায় দেখা যায়। এদের শিকার করার জন্য শিকারীরা মোটরবোট ও হার্পুণ নিয়ে হাজির হয়। কাঠের নৌকা এরা অনায়াসে তরোয়াল দিয়ে ফুটো করে ডুবিয়ে দিতে পারে।

সবুজাভ নীল মাথা ও পিঠ, সর্বাঙ্গে ইস্পাতের উজ্জ্বল দীপ্তির মত ঝিকিমিকি। শক্তিশালী গড়ন তীব্রবেগে জলের মধ্যে চলার উপযোগী!

তরোয়াল মাছের একগোষ্ঠী দেখা যায় ভারত মহাসাগরে। দীর্ঘ তরোয়াল ছাড়াও পিঠের ওপর প্রায় সারা পিঠজোড়া উঁচু পাখনা এদের বৈশিষ্ট্য, যা দূর থেকে নৌকোর পালের মত দেখায়। আর আনন্দে চলার ভঙ্গিটি চোখে পড়ার মত। ২০ ফুট লম্বা দেহ, কেবলমাত্র লেজের পাখনার ওপর ভর দিয়ে ৪৫ ডিগ্রি কোণ করে উঠে দাঁড়িয়ে, লেজের ঝাপটায় ফর-ফর করে চলে। সে এক মজার দৃশ্য। মনে হবে আধুনিককালের যুদ্ধের এক ক্ষেপণাস্ত্র অ্যান্টেনা উঁচিয়ে শূন্যে ওঠার জন্য ছুটে চলেছে। আবার দুপুরের রোদে জলে ভেসে ভেসে ঘুমানোটাও অদ্ভুত। পিঠের ওপরকার ঝকঝকে নীল পাখনা জাগিয়ে ঢেউ-এর দোলায় দোল খায়। উজ্জ্বল নীল পাখনা-পাল সূর্যকিরণে ময়ূরের পেখমপুচ্ছের মত ঝিকমিক করে।

এমনিতে শান্ত কিন্তু বড়শি কিংবা হার্পুণ দিয়ে বিঁধিয়ে ধরতে গেলে এরা

পালতোলা মাছ (**Sail-fish, Istiophorus**)

দারুণ চঞ্চল হয়ে ওঠে। জলের ওপর লাফিয়ে উঠে এদিক ওদিক বেগে ছুটতে থাকে এবং হয়ত আক্রমণকারীর নৌকার পেটে তার বল্লম চালিয়ে দেবে।

সেইলফিসের টর্পেডো আকারের দেহের ওপরের দিকটা গাঢ় নীল। নিচের অংশ ঝকঝকে রুপালি সাদা, দুইপাশে ল্যাভেণ্ডার রঙের খাড়া বিন্দুচিহ্ন। পালখানার গোড়ার দিকে গাঢ় বেগুনি। ওপরের দিকে উজ্জ্বল নীল। ওদের গোষ্ঠীর অন্যান্য মাছের মত সেইলফিস ঘণ্টায় অনুমান ৬০ মাইল বেগে কিছুটা পর্যন্ত ছুটতে পারে। বেগে সাঁতার কাটার সময় পালখানা পিঠের ওপর খাঁজের মধ্যে ভাঁজ করে নামিয়ে রাখে ; ভেসে ভেসে ঢেউয়ের দোলায় চলার সময় এবং শিকারীর হার্পুণে বিদ্ধ হলে মুক্ত হওয়ার জন্য লড়াই করার সময় পাল তুলে দিয়ে সে তার বিক্রম দেখায়।

জলে সাবধান

কথায় বলে গভীর জল, গহন বন, আঁধার রাত—এখানে কখন কোন্ দিক থেকে কি বিপদ আসে কে বলতে পারে? জলের অজানা বিপদ সম্বন্ধে যে হুঁশিয়ারি, তা উপেক্ষা করা যায় না। সাগরে বা নদীতে সতর্ক না হয়ে স্নান করতে নামলে বিপদ ঘটতেই পারে। ধারালো দাঁতওয়ালা ব্যারাকুডা মাছ আছে যারা মুহূর্তে মানুষের গায়ের মাংস কেটে নিতে পারে; রে বা জেলি মাছ আছে যাদের স্পর্শ সারাদেহে তীব্র যন্ত্রণা ছড়িয়ে দিতে পারে; হাঙর আছে যা তার যেকোন অঙ্গ কেটে নিতে কিংবা তাকে পুরোপুরি খেয়ে ফেলতে পারে। এগুলি পরিচিত বিপদের উৎস। কিন্তু এছাড়া ডাঙায় বিদ্যুৎবাহী তারের স্পর্শে যেমন বিপদ হয়ে থাকে, জলেও যে তেমনি সম্ভাবনা লুকিয়ে থাকতে পারে, মানুষ সে বিষয়ে খুব সচেতন থাকে না। কারণ প্রায়ই এদের সাক্ষাৎ মেলে না, আর এরা কোথায় যে চুপ করে লুকিয়ে রয়েছে তা আগে থেকে জানাও যায় না।

যে মাছগুলো নিজদেহে বিদ্যুৎ উৎপন্ন করে তাদের আকার খুব বড় হয় না, চেহারাও কিম্ভূতকিমাকার। অপর প্রাণীরা যেখানে গায়ের জোরে, দাঁতের জোরে অথবা বিষাক্ত হুলের শক্তিতে শত্রুকে কাবু করে, ইলেকট্রিক-রে-জাতীয় মাছেদের অস্ত্র সেখানে কোন দৃষ্টিগ্রাহ্য অস্ত্র নয়, অদৃশ্য বিদ্যুৎ প্রবাহ, সমুদ্রের লোণা জল যার পরিবহণের উত্তম মাধ্যম। প্রাচীনকালে যখন বিদ্যুতের স্বরূপ এবং ব্যবহার সম্বন্ধে মানুষের সঠিক জানা ছিল না, তখন সামুদ্রিক জীবের এই 'অজ্ঞাত শক্তি' প্রয়োগ চিন্তাশীল মানুষকে বিস্মিত করেছিল।

ছোট আকারের মাছ, কিন্তু কি এক অদ্ভুত শক্তি প্রয়োগ করে অন্য প্রাণীকে অবশ করে ফেলতে পারে—এই কৌশল গ্রীক দার্শনিক-বিজ্ঞানী অ্যারিস্টটল পর্যবেক্ষণ করেছিলেন। দেহের শক্তি নয়, দাঁতের দংশন নয়, হুল বা বিষ নয়, এমন কি স্পর্শ না করেই অপর পক্ষকে অভিভূত করার যে শক্তি, তার মূল কী? এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর তাঁর জানা ছিল না। তিনি ধারণা করেছিলেন, প্রাণীটি হয়ত অদৃশ্য 'এক ধরণের বিষ বা সূক্ষ্ম রাসায়নিক বস্তু' নিক্ষেপ করে। কিন্তু তিনি আসল কারণ বুঝতে পারেননি। গ্রীক কবি ওপিয়ান অনুমান করেছিলেন, 'ঐ মাছ হয়ত হঠাৎ বিষাক্ত মন্ত্র বা জাদু নিক্ষেপ করে'

যাতে আক্রান্ত প্রাণী বিবশ হয়ে পড়ে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে ইটালিয়ান বৈজ্ঞানিক লুইগি গ্যালভানি প্রমাণ করলেন, স্নায়ুতন্ত্র বৈদ্যুতিক তরঙ্গে সাড়া দেয়। দেহে বিশেষ রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপন্ন করা যায়। এ বিষয় মানুষ জানার আগেই প্রাণী জগতে জলচর কতক জীব সে কৌশল উদ্ভাবন করেছিল।

* ইলেকট্রিক রে [Electric Ray]

ইলেকট্রিক রে স্টিং রে এবং স্কেটদের শরিক ; গড়নও তেমনি চ্যাপ্টা। এদের এক প্রজাতি আটলান্টিক মহাসাগরের পূর্ব অঞ্চলে ও ভূমধ্যসাগরে বাস করে, নাম টর্পেডো মাছ, দুই ফুট মত দীর্ঘ। এদের দেহে ৫০ ভোল্ট বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়। তা দিয়ে ছোট মাছ ও শামুক, ঝিনুক, কাঁকড়া ইত্যাদি অনায়াসে অবশ করে খাদ্যরূপে ব্যবহার করে। টর্পেডো রে মাঝদরিয়ায় শিকার ধরাই পছন্দ করে। ৫০ ভোল্ট বিদ্যুৎ নিয়ে খোঁচা দেওয়ার মত ব্যথা ছাড়া এরা মানুষের বিশেষ ক্ষতি করতে পারে না।

টর্পেডো রে

টর্পেডো রে-র এক প্রজাতি [Torpedo nobiliana] আটলান্টিক ও ভূমধ্যসাগরের ২০০ ফুট গভীরতায় বাস করে। এদের উৎপাদিত বিদ্যুৎ প্রবাহের শক্তি ২০০ ভোল্ট। গভীর জলে থাকলেও এরা মাঝে মাঝে তীরের কাছাকাছি মানুষের হেঁটে চলা সীমানার মধ্যেও চলে আসে। ৬ ফুট লম্বা, ২০০ পাউন্ড ওজনের টর্পেডো নবিলিয়ানা তার লেজের স্পর্শে বিদ্যুৎ চালিয়ে দিয়ে মানুষকে নিমেষে অজ্ঞান করে ফেলতে পারে।

ইলেকট্রিক রে-র অন্য দুটি প্রজাতি হল চোখওয়ালা ইলেকট্রিক রে [Eyed Electric Ray]। এর হাল্কা বেগুনি রঙের দেহে অসংখ্য চোখের মত ফুটীক দাগ।
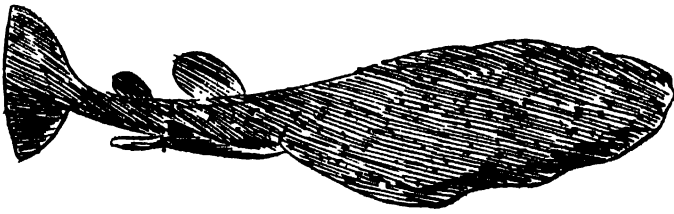
চোখওয়ালা ইলেকট্রিক রে [Eyed electric Ray]

অন্যটি মার্বেল ইলেকট্রিক রে [Marbled electric Ray]। মাথা ও পেট মোটা, লেজ ছোট। জলের মধ্যে দেখলে মনে হবে ছোট একখানি 'জেপলিন' ধীরে ধীরে চলছে। গায়ের রঙ ফ্যাকাশে বাদামী, মার্বেল পাথরের মত। ইলেকট্রিক রে মাছেদের দেহগঠনের বৈশিষ্ট্য সহজেই চোখে পড়বে। দৈর্ঘের তুলনায় সামনের দিকটা বেশি মোটা। সামনের পাখনা এবং লেজ মাছের গতি আনে। সামনের দুটি বড় এবং পেটের নিচেকার পাখনা দুটি সাধারণত ছোট থাকে। কিন্তু ইলেকট্রিক রে-র সামনের পাখনা খুবই ছোট এবং দুর্বল। দেখেই মনে হবে দ্রুত গতির দিকে এদের লক্ষ্য নেই। সামনের পাখনার
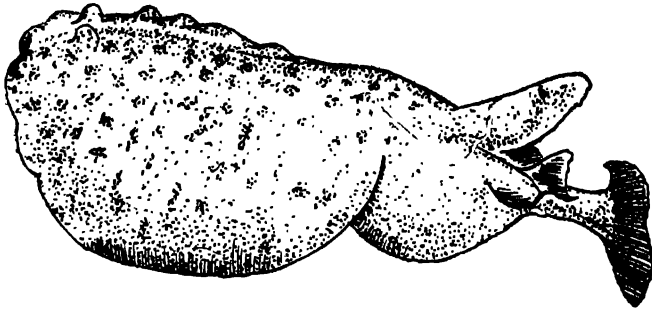
মার্বেল ইলেকট্রিক রে [Marbled electric Ray]

গোড়াতে দুইদিকে দুইটি অঙ্গ আছে যাকে বলা যায় ডায়নামো। এখানে ইলেকট্রিক মাছেদের আসল শক্তি বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়। এই ডায়নামোকে স্থান দিতে সামনের দিকটা অস্বাভাবিক রকম মোটা হয়ে পড়েছে। কাজেই গতির পরিবর্তে শক্তিসঞ্চারক অঙ্গের ওপর নির্ভর করে ইলেকট্রিক রে ছোট লেজ ও ছোট পাখনা দিয়ে ধীরে ধীরে চলে। সে জানে শিকারকে অবশ করে পলায়নের ক্ষমতা লোপ করে দিতে পারলে ধীরে-সুস্থে চললেও শিকার হাতছাড়া হবে না।

• **ইলেকট্রিক ঈল [Electric Eel, Electro phorus clectricus]**

ছোট ইলেকট্রিক রে-মাছেরা আকারে ছোট, তাদের ছোট ছোট শিকার ধরলেই চলে। আর ছোটদের পরাভূত করতে অল্প ভোল্টের বিদ্যুৎই যথেষ্ট। কিন্তু বিদ্যুৎশক্তিই যাদের আত্মরক্ষা ও খাদ্যসংগ্রহের একমাত্র অস্ত্র তাদের দেহ বড় হলে দেহের প্রয়োজন মেটাতে বেশি খাদ্য দরকার হয়। কাজেই তাদের বেশি ভোল্টের বিদ্যুৎশক্তি দরকার। ইলেকট্রিক ঈল তার দেহের মধ্যে যেন বিদ্যুৎ উৎপাদন-কেন্দ্র স্থাপন করে নিয়েছে। সারাদেহে ছড়িয়ে রয়েছে ৬ হাজার বৈদ্যুতিক কোষ, মস্তিষ্কের সঙ্গে এদের সংযোগ রয়েছে স্নায়ুতন্ত্রের মাধ্যমে। ইলেকট্রিক ঈলের চেহারায় রুইকাতলা ও গোল্ডফিসের সাদৃশ আছে কিন্তু সেটা কেবল বাইরের দৃশ্য-আভাসে। সারা গায়ে ছোট ছোট গর্ত ; সেগুলো যেন অনুভূতি-গ্রাহক অ্যানটেনা যার ভিতর দিয়ে বাইরের বিদ্যুৎক্ষেত্রের অবস্থা ওর মস্তিষ্কে উপনীত হয়। সে তখন আশেপাশের প্রাণীর অবস্থান সম্পর্কে অবহিত হয়ে অস্ত্র-

ইলেকট্রিক ঈল (Electric Eel)

প্রয়োগ করবে কিনা নির্ধারণ করতে পারে। তার দেহে যে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয় তা দিয়ে ৩ ফুট দূর থেকেই একটা বস্তুকে অনড় অবশ করে ফেলতে পারে, তারপর তাকে গিলে ফেলার সময় শিকারের হাত-পা পর্যন্ত নড়ানর ক্ষমতা থাকবে না।

আমেরিকার স্বল্পতোয়া নদী ও শান্ত জলাশয়ে গিয়ানা থেকে আর্জেন্টিনা পর্যন্ত অঞ্চলে ইলেকট্রিক ঈলের সাক্ষাৎ মিলবে। এর দীর্ঘ দেহে বৈদ্যুতিক কোষ,

মস্তকে তার পরিচালন-কেন্দ্র। এরা নিশাচর। দিনে কোথাও নিষ্ক্রিয় হয়ে অবস্থান করে, রাত্রিতে খাবার সন্ধানে তৎপর হয়ে ওঠে। ধীরে ধীরে চলে। মস্তকে যে তড়িৎ প্রবাহ সৃষ্টি হয় তা দিয়ে আশে পাশের বস্তু ও অন্য ঈলের অবস্থান সে বুঝতে পারে। তার দেহস্থিত তড়িৎকোষ কতকটা রাডারের কাজ ক'রে খাদ্যের সন্ধান দেয়। বৈদ্যুতিক 'শক' চালিয়ে দিয়ে শত্রুকে কাবু করে ফেলে।

ইলেকট্রিক ঈল কিভাবে তার খাদ্যপ্রাণীকে আক্রমণ করে এবং ভোজন সমাধা করে তার বিবরণ দিয়েছেন জেরাল্ড ডুরেল তাঁর কৌতূহল উদ্দীপক **Encounter with Animals** বইতে। তিনি লিখেছেন :

সম্ভবত বিদ্যুৎ উৎপাদনকারী সবচেয়ে বিখ্যাত প্রাণী হল বৈদ্যুতিক ঈল, যদিও এ প্রাণীটি আসল ঈল (বাইন মাছ) নয়, ঈলের মত দেখতে এক প্রজাতির মাছ। এই লম্বা, কালো প্রাণীগুলো দক্ষিণ আমেরিকার পাহাড়ী ও সমভূমির নদীতে বাস করে। লম্বায় ৮ ফুট এবং মানুষের উরুর মত মোটা হয়ে থাকে। এদের সম্বন্ধে অনেক অতিরঞ্জিত কাহিনী প্রচলিত আছে তবে একথা ঠিক যে, বড় একটা ঈল নদী পার হওয়ার সময় একটা ঘোড়াকে বৈদ্যুতিক শক দিয়ে উল্টিয়ে ফেলে দিতে পারে।

আমি যখন ব্রিটিশ গিয়ানায় প্রাণী সংগ্রহ করছিলাম তখন আমার ইচ্ছা হল ব্রিটেনে নিয়ে যাওয়ার জন্য কিছু ইলেকট্রিক ঈল ধরি। যেখানে আমরা ক্যাম্প ফেলেছিলাম তার কাছে নদীতে ঈল ছিল প্রচুর। কিন্তু এরা থাকত পাষাণময় নদীপাড়ের নিচে গভীর গর্তের মধ্যে। বানের জল যখন নদীর পাড় ছাপিয়ে যেত তখন জায়গায় জায়গায় সরু সুড়ঙ্গ মত সৃষ্টি হত যার ভিতর দিয়ে নিচের পাথর-চাঁই-এর ফাঁকে ফাঁকের গর্তের সঙ্গে বায়ুচলাচল ঘটত। এইরূপ মাটির তলাকার প্রতিটি গর্তে একটি করে ঈল বাস করত। এই গর্ত-সোজাসুজি মাটির ওপর দাঁড়িয়ে জুতো দিয়ে জোরে জোরে পা ঠুকলে নিচ থেকে বিরক্ত ঈলের ক্রুদ্ধ ঘড়-ঘড়ানি শোনা যেত, মনে হত যেন পায়ের তলায় এক বিরাট শুয়োর মাটি চাপা পড়ে ফুঁসছে।

অনেক চেষ্টা করেও এখান থেকে ঈল ধরতে পারলাম না। পরে একদিন আমার সঙ্গী দুজন ভারতীয়কে নিয়ে কয়েক মাইল দূরের এক গ্রামে গেলাম। সেখানে অনেক জেলের বাস। গ্রামে কতকগুলি পাখি ও প্রাণী কিনলাম, তার মধ্যে ছিল একটা পোষা গাছসজারু। ঐ সময় এক ব্যক্তি একটা ভাঙাচোরা-গোছের মেছোঝুড়িতে করে একটা ইলেকট্রিক ঈল নিয়ে হাজির। আমার আনন্দ দেখে কে! দর কষাকষির পর ঈল সমেত সবগুলি প্রাণী কিনে নৌকায় করে আমাদের গন্তব্যস্থান উদ্দেশে রওনা হলাম। সজারুটি নৌকার সামনের

দিকের গলুই-এ বসে প্রাকৃতিক দৃশ্য উপভোগ করছে, মনে হল ; তার সামনেই ঝুড়িতে ছিল ঈলটি। আমরা আধা-আধি পথ এসেছি, এমন সময় ঈল তার ঝুড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ল।

এদিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করল সজারু। সে মনে হয় ঈলটাকে সাপ মনে করেছিল। তাই গলুই থেকে লাফিয়ে নেমে সোজা আমার মাথার ওপর উঠে নিরাপদ হওয়ার চেষ্টা করল! সজারুর কাঁটার আলিঙ্গন থেকে নিজেকে বাঁচাতে আমি যখন ব্যস্ত, তখন হঠাৎ নজরে পড়ল, ঈল ঝুড়ি থেকে মুক্ত হয়ে এঁকেবেঁকে মোচড় খেতে খেতে আমার দিকেই আসছে। আমি তখন এমন এক কাণ্ড করে ফেললাম, যা হতে পারে বলে আমার কোন ধারণাই ছিল না। সজারুটাকে বুকে চেপে ধরে আমি বসা-অবস্থা থেকেই শূন্যে লাফিয়ে উঠলাম এবং ঈল চলে যেতে সরু ডিঙিখানা উল্টে না দিয়ে আবার সেখানেই বসে পড়লাম। এক তরুণ চাষীছেলে একবার টর্পেডো মাছের ওপর পা ফেলে কী যন্ত্রণা ভোগ করেছিল তা আমার স্পষ্ট মনে ছিল এবং ইলেকট্রিক ঈলের ছোঁয়া খেয়ে আমারও যাতে সেই অভিজ্ঞতা না হয় সেজন্য মন ছিল অত্যন্ত সজাগ। সৌভাগ্য এই, আমাদের কেউই এর শক্ পায় নি। আমরা যখন নিজেদের বাঁচিয়ে ঈলকে আবার ঝুড়িতে তোলার কসরৎ করছিলাম, তখন সে ক্যানোর একপাশ বেয়ে উঠে জলে পড়ে গেল। সত্যি বলতে কি, একে চলে যেতে দেখে আমরা কেউই অখুশি হইনি।

একবার এক চিড়িয়াখানায় একটা বড় জলাধারে-রাখা ইলেকট্রিক ঈলকে খাওয়ানো দেখেছিলাম। শিকারকে কাবু করার যে কায়দা সে দেখাল, তা মনে রাখার মত। সেটা প্রায় ৫ ফুট লম্বা। ৮ থেকে ১০ ইঞ্চি লম্বা মাছ সে অনায়াসে আয়ত্ত করে ফেলত। তার খাবার ছিল তাজা মাছ। মুহূর্তের মধ্যে মাছটির জীবন শেষ হত বলে খাওয়া দেখতে বিবেকের ব্যথা অনুভব করতে হয়নি। ঈলই বোধ হয় কখন তার খাওয়ার সময় জানত। ঐ সময় হলেই সে বাকিংহাম রাজপ্রাসাদের প্রহরীর মত জলাধারের একপ্রান্ত হতে আরেক প্রান্ত পর্যন্ত নিয়মিত টহল দিতে থাকত। ট্যাংকে একটি মাছ ছেড়ে দেবামাত্র সে স্তব্ধ হয়ে থেমে পড়ত এবং লক্ষ্য করত মাছটি কিভাবে কাছাকাছি আসছে। এক ফুট মত দূরত্ব সীমানার মধ্যে এসে পড়লেই তার সারা দেহ থরথর করে কাঁপতে লাগল, মনে হল শরীরে যেন ডায়নামো চালু করে দেওয়া হয়েছে। মাছটিও স্তব্ধ, কিছু ঘটনা ঘটতে যাচ্ছে তা বোঝার আগেই মাছটির প্রাণ চলে গেছে। এরপর খুব ধীরে ধীরে মাছটি উল্টে গিয়ে পেট ওপর দিকে তুলে চিৎ হয়ে ভাসতে লাগল। ঈল তখন সামান্য একটু এগিয়ে এল, মুখ খুলে জোরে জল শোষণ করতে লাগল। যেন একটি লম্বা ভ্যাকুয়াম ক্লীনার [পরিষ্কার করার শোষক যন্ত্র]। মাছটি ঈলের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল।

* মোরে ঈল [Moray Eel]
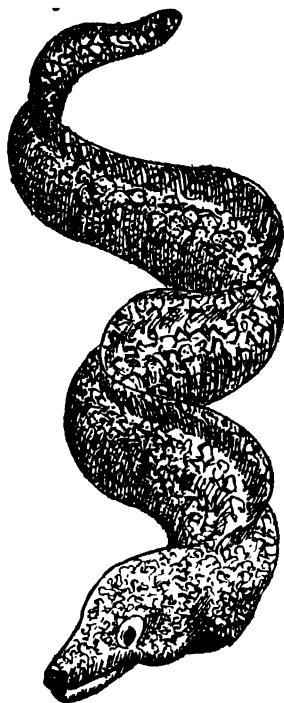
মোরে ঈল [Moray Eel]

ছোট বড় নানা জাতের ঈলমাছ নদী ও সমুদ্র উভয় স্থানেরই বাসিন্দা। এরা সবাই বিপজ্জনক নয় তবে কংগার জাতীয় ঈল লম্বায় হয় প্রায় ৮ ফুট, ওজন ১৫০ পাউণ্ড। এরা বিষধর না হলেও এদের কামড়ের এমন জোর এবং দাঁত এমন শক্ত যে মানুষকে দাঁতে চেপে ধরলে এর মাথা কেটে না ফেলে কামড় ছাড়ানো যাবে না। শুধু মাথা কাটলেই হবে না, সাঁড়াশি দিয়ে টেনে চোয়াল খুলতে হবে।

ঈলদের মধ্যে মোরে ঈলের নরমাংসের প্রতি লোভের কথা রোমান কবি হোরেস উল্লেখ করেছেন। রোমানরা মোরে ঈল বাড়িতে চৌবাচ্চায় পুষত, অবাধ্য ক্রীতদাসদের শাস্তিস্বরূপ মোরে ঈলের চৌবাচ্চায় ফেলে দিয়ে তাদের দিয়ে খাওয়াত। মোরের মাংস নাকি ছিল ভারি উপাদেয় খাদ্য।

প্রায় একশো প্রজাতির মোরে ঈল দেখা যায়। এদের বেশির ভাগ বিশ্বের

উষ্ণ ও নাতিশীতোষ্ণ সাগরের প্রবাল দ্বীপের গায়ে ও আশেপাশে বাস করে। প্রবাল সংগ্রহ করতে যে ডুবুরিরা প্রবালকুঞ্জের মধ্যে যায়, তাদের মোরে ঈল সম্পর্কে বিশেষ সতর্ক থাকতে হয়। প্রবাল পাহাড়ের ফাটলে, আনাচে-কানাচে, গর্তে গুহায় মোরে সাপের মত কুণ্ডলী পাকিয়ে চুপটি করে থাকে। এরা সাধারণত মানুষকে আক্রমণ করে না, এদের খাদ্য হল ছোট মাছ, শামুক ঝিনুক এবং কখনো কখনো ছোট আকারের অক্টোপাস। কিন্তু হঠাৎ ভয় পেয়ে গেলে মানুষ বা অন্য যে কোন প্রাণীকেই আক্রমণ করতে এরা দ্বিধা করে না। দাঁতে বিষ না থাকলেও এদের দংশন অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক।

ঈলের অদ্ভুত স্বভাব

কতক জলচর জীব আছে যারা সারা জীবন সমুদ্রেই থাকে, মিঠা জলের নদীতে কখনই যায় না। তেমনি আবার কতক আছে যারা আজীবন নদীরই বাসিন্দা, সাগরের লোনা জল তাদের মোটেই পছন্দ নয়। কিন্তু ঈলদের কয়েকটি গোষ্ঠী সাগর ও নদী উভয়ের সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রাখে। ইউরোপ ও আমেরিকার মিষ্টি জলের নদীতে জীবনের বেশির ভাগ সময় কাটালেও তারা ডিম পাড়তে এবং শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করতে যাবে সমুদ্রতীর্থে। অনেক ভারতীয় হিন্দুর বিশ্বাস, কাশীতে দেহত্যাগ করলে পুনর্জন্ম হয় না, এ জন্মের পরই মুক্তিলাভ ঘটে। ঈলদেরও এমনি কোন দুজ্ঞেয় রহস্যময় আকর্ষণ আছে কিনা কে জানে! এই ঈলরা আটলাণ্টিক মহাসাগরের 'সারগাসো সাগর' নামে জলজ উদ্ভিজ্জপূর্ণ সমুদ্র-অংশে জন্মগ্রহণ করে। এটি যেন তাদের নার্সিংহোম। মজা হল এই যে, ইউরোপ আমেরিকার যে বিভিন্ন নদীতে তাদের পিতামাতার বাস ছিল সন্তানরা সারগাসো সাগর থেকে সেই সব অঞ্চলের স্বগৃহে ফিরে যায়। এ যেন মাতুলালয়ের আঁতুড়কুটির থেকে নিজগৃহে প্রত্যাবর্তন। ইউরোপীয় ঈলদের পক্ষে নার্সিংহোম থেকে আপন ঘরে ফিরতে সময় লাগে প্রায় ৩ বছর। মার্কিন মুলুকের ঈলরা সময় নেয় এক বছরের কিছু কম। কেন এই পৈতৃক ভূমির (বা জন্মস্থানের) প্রতি আকর্ষণ এবং কেমন করেই বা তারা পথ চিনে নেয়, এ রহস্যের সমাধান এখনো হয়নি। এর সঙ্গে যুক্ত দ্বিতীয় রহস্যটি হল, জীবনযাত্রা শেষে প্রাণত্যাগের জন্য জন্মক্ষেত্রে ফিরে আসা।

পাখিদের মধ্যে এক জাতের পায়রা দূরদূরান্তর থেকে স্বগৃহে ফিরে আসে যে প্রকৃতিগত চেতনার সাহায্যে তাকে বলা হয়েছে **homing sense**, ঘরে ফেরার প্রবৃত্তিগত জ্ঞান। দেখা গেছে, এই 'হোমার পায়রা' (**homer pigeon**)-কে আমেরিকার বাড়ি থেকে ইউরোপে এনে ছেড়ে দিলে সে অনায়াসে আটলাণ্টিক পাড়ি দিয়ে গৃহে ফিরে যায়; ভারতে প্রমাণিত হয়েছে, কলকাতার হোমার

৬

পায়রা বোম্বেতে নিয়ে মুক্ত করে দিলে নির্ভুলভাবে কলকাতার ভবনে ফিরে এসেছে।

শিশু ঈলদের সারগাসো সাগরে জন্মের পর পথ চিনে নদী-বাড়িতে ফেরার মত ঘটনা দেখা যায় পাখিদের দেশভ্রমণে। কতক পাখি বছরের নির্দিষ্ট সময়ে এক মহাদেশ থেকে অন্য মহাদেশের নির্দিষ্ট অঞ্চলে শীতকাল কাটাতে যায়। শীতের শেষে সেখান থেকে ফিরে নিজেদের স্থায়ী বসতি-অঞ্চলে ডিম পাড়ে, সন্তান পালন করে। পর বছর এই সন্তানরা পিতামাতার আগেই শীত যাপনের অঞ্চলে গিয়ে হাজির হয়। এখানেও বিজ্ঞানীদের মনে এই প্রশ্ন দেখা দেয়, অনভিজ্ঞ সন্তানরা নতুন দেশের নতুন অঞ্চল কী করে চিনে নেয়? কোন অদৃশ্য শক্তির গুণে পিতামাতার জ্ঞান অভিজ্ঞতা কি তাদের মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছে?

ইউরোপ-আমেরিকার সাধারণ ঈলের স্বভাব নিয়ে দীর্ঘদিন গবেষণা করে ডেনমার্কের বিজ্ঞানী ডাঃ যোহানেস স্মিড্ট প্রমাণ তথ্য পেয়েছেন যে, শীতের শেষে এরা সারগাসো অভিমুখে রওনা হয় এবং যেখানে জন্ম সেখানেই মৃত্যুবরণ করে। প্রকৃতির রাজ্যে কত বিস্ময় যে লুকানো আছে!

দাঁতাল দানব

বিজ্ঞানীরা সমুদ্রের মেরুদণ্ডী ভয়ংকর প্রাণীদের দুইভাগে ভাগ করেছেন— এক, কোমলাস্থিওয়ালা, যাদের অস্থি অনমনীয় নয়, যেমন হাঙ্গর ও রে মাছ। দুই, শক্ত হাড়ওয়ালা, যাদের অস্থি শক্ত, যেমন মাছ, কুমীর, সাপ ইত্যাদি। চলাফেরার সময় এদের দেহ নমনীয় মনে হয় হাড়গুলি সন্ধিযুক্ত বলে। হাঙ্গর প্রভৃতি কার্টিলেজিনাস অর্থাৎ নমনীয় অস্থিওয়ালা প্রাণী তাদের বিশাল দেহ ও হিংস্র স্বভাবের জন্য মানুষের কাছে বেশি ভীতিকর হলেও শক্ত হাড়ওয়ালা অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র প্রাণীও বিপদের কারণ হয়ে থাকে। এই রকম বিপজ্জনক দন্তুল প্রাণী হল ব্যারাকুডা, কয়েক প্রজাতির ঈল, দানব গ্রাউপার ও পিরানহা।

- ব্যারাকুডা (**Barracuda, Sphyraena barracuda**)
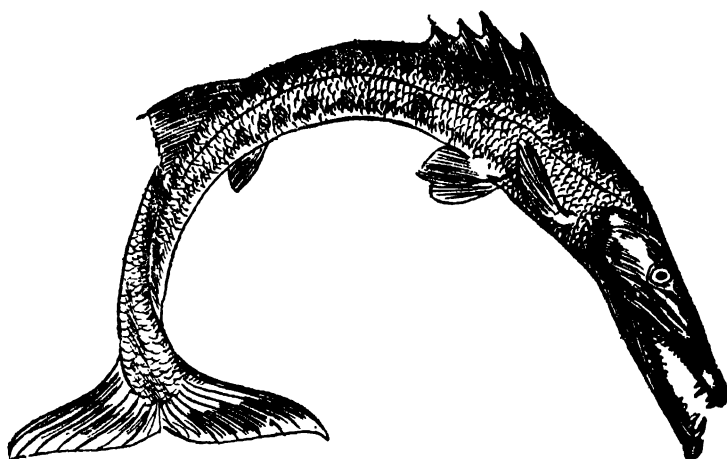
ব্যারাকুডা (**Barracuda**)

শক্ত-অস্থি মাছের মধ্যে সবচেয়ে ভয়ংকর ব্যারাকুডার আক্রমণ। চার থেকে ছয় ফুট লম্বা। যে ধরণের মাছ সাধারণত আমাদের খাদ্য, দেখতে প্রায় সেই রকম। মাথাটা বাদ দিয়ে দেহের অন্য অংশের দিকে তাকালে ভয়ের কিছুই চোখে পড়বে না। চোখ, মুখ, দাঁত এঁকে দিয়েছে দানবের ভয়াবহতা। লম্বা

মুখ, তাতে বাঘের দাঁতের মত ঝকঝকে ধারাল ছোট-বড় দাঁতের সারি আর গোলাকার নির্মম শীতল চোখ মানুষের মনে ত্রাসের সৃষ্টি করে। এরা অত্যন্ত ক্ষিপ্রগতি। কখন কোন দিক থেকে আক্রমণ আসতে পারে মানুষ তা বুঝতে পারে না। দাঁত বসিয়ে দিলে হয় কোন অঙ্গ কেটে নেবে, আর না হয় এমন গভীর ক্ষত করে দেবে যে, রক্তপাতের ফলেই মৃত্যু ঘটার সম্ভাবনা। জলের মধ্যে ডুবুরিদের সঙ্গে দেখা হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। এরা যখন সোজা মানুষের দিকে আসতে থাকে তখন শুধু এদের ঠোঁটের আগাটাই চোখে পড়ে। চোয়ালে ক্ষুরধার সুচালো দাঁত। ধাঁ করে এসে এক কামড়ে কিছুটা মাংস কেটে নিয়ে চম্পট দেওয়া এদের স্বভাব। ডাঙার গেরিলা সৈনিকের মত 'অতর্কিতে হানা দিয়ে কিছু কেড়ে নিয়ে পালাও, আবার সুযোগ মত হানা দাও'—এই যেন ওদের নীতি।

* ব্যারাকুডার কাণ্ড

সমুদ্রতল একটি বিস্ময়কর জগৎ। এখানে রয়েছে কত বিচিত্র আকারের বিচিত্র স্বভাবের প্রাণী। ফরাসী সমুদ্রবিজ্ঞানী জ্যাক-ইয়াস কুস্তো এই রহস্যময় জগতে প্রবেশ করে বহু অজানা তথ্যের সন্ধান দিয়েছেন, সাগরপুরীর জীবজন্তু ও তাদের বাড়িঘরের বাস্তব চিত্র দেখিয়েছেন ফটোগ্রাফ ও টেলিভিশনের মারফৎ। কুস্তোই প্রথম ব্যক্তি যিনি ভূমিচর মানুষকে জলচরদের জীবনের রোমাঞ্চকর ঘটনার সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন।

কুস্তো তাঁর সমুদ্র অভিযানের জাহাজ ক্যালিপ্সো (**Calypso**) নিয়ে ভারত মহাসাগরে আসামপ্সান (**Assumption Reef**) দ্বীপের কাছে অবস্থানের সময় জলের তলায় জাহাজের গায়ে ব্যারাকুডার দস্যুবৃত্তি লক্ষ্য করেছিলেন। তাঁর **Living Sea** গ্রন্থে সামুদ্রিক জীবের সম্বন্ধে যেসব বিচিত্র তথ্য প্রকাশ করেছেন তার মধ্য থেকে ব্যারাকুডার কথা এখানে তুলে দিই।

ক্যালিপ্সোর দশ ফুট নিচের জলের মধ্যে থাকার সময় আমরা লক্ষ্য করলাম একটামাত্র ব্যারাকুডা, লম্বায় চারফুট মত, কিছুটা দূরে দূরে চোরের মত ঘুরঘুর করছে, কিন্তু কাছে আসছে না। আমরা দেখলাম তিন ডজন রিমোরা মাছ পিছন দিকে জাহাজের গায়ে আঁকড়ে ধ'রে রয়েছে।

রিমোরা মাছের মাথার ওপর আছে বায়ুশোষক ব্যবস্থা যার ফলে কোন শক্ত কিছুর সঙ্গে মাথা চেপে ধরলেই সে তার সঙ্গে আটকে গেল। নিজে ইচ্ছা করে না খুললে সে জাহাজ চলার সময় সঙ্গে সঙ্গে চলবে। রিমোরা মাছেরা বিরাট রে, হাঙর প্রভৃতি প্রাণীর গায়ে নিজেদের আটকিয়ে নিয়ে বাসের গায়ে ঝুলে বা ট্রেনের মাথায় বসে থাকা যাত্রীদের মত সাগর-ভ্রমণ করে।

এগুলো এক হাঙ্গরের অতিথি হয়ে সমুদ্রে জীবনযাত্রা চালাচ্ছিল। আমরা সেই হাঙ্গরটিকে মরার পর রিমোরারা আমাদের জাহাজের গায়ে আশ্রয় নিয়ে জাহাজ থেকে ফেলে-দেওয়া খাদ্যবস্তুতে জীবনধারণ করছে। এইভাবে এরা দুই হাজার মাইল অতিক্রম ক'রে এসেছে। অ্যাসামপ্সান দ্বীপের কাছে থাকার সময় আমরা রিমোরাদের একটা তালিকা তৈরী করলাম এবং লক্ষ্য করলাম প্রতিদিন একটি দুটি করে কমে যাচ্ছে। আমাদের বিস্মিত প্রশ্ন হল—এরূপ হচ্ছে কেন ?

যখন এদের সংখ্যা কমতে কমতে এক ডজনে এসে দাঁড়িয়েছে তখন ফালকো প্রত্যেকদিন ভোরে জলে নেমে ডুবে দেখতে লাগল এইভাবে রিমোরাদের অন্তর্ধানের কারণ কি। তার এই অনুসন্ধান সফল হল এবং এমন তথ্য জানা গেল যা আমরা হাজার হাজার ঘণ্টা জলের মধ্যে কাটিয়ে দেখতে পাই নি।

ফালকো প্রাতরাশ টেবিলে এসে হাজির হল, গায়ে জল ঝরছে। বলল— ব্যারাকুডা একটা রিমোরাকে ধরে নিয়ে গেল, দেখলাম। আমি একশো ফুট দূরে ছিলাম, ব্যারাকুডা জাহাজের পিছন দিকে ধেয়ে গেল এবং একটা রিমোরা তুলে নিল। আমি ছুটে গেলাম। ব্যারাকুডা রিমোরাকে দুই খণ্ড করে কেটে অর্ধেকটা গিলে ফেলেছে বাকি অর্ধেক মুখে আড়াআড়ি করে ধরে চলে গেল। এতক্ষণে বোঝা গেল 'ক্যালিপ্সো' একটা ব্যারাকুণ্ডার বিছানা ও খাবার যোগান দিচ্ছিল। ফালকোকে বললাম—তোমার আরকলেট আন। সে তার বর্শা-বন্দুক নিয়ে ডুব দিল এবং এক গুলিতে ব্যারাকুডাকে খতম করল।

ব্যারাকুডার তিনটি বিষয় মানুষের পক্ষে অস্বস্তিকর—তাদের শয়তানিভরা ভয়-জাগানো মুখ ; মানুষ যখন সাঁতরায় তার পায়ের কাছে-কাছে চলার অভ্যাস এবং নরখাদক বলে তার কুখ্যাতি। শেষেরটি আগের দুটি স্বভাব থেকে অনুমান করা হয়ে থাকে। অ্যাসামপ্সানে কাজ করার সময় একদিন আমি ৬০ ফুট জলের নিচে একটি চমৎকার প্রবাল-হোটেলে যেসব অতিথিরা এসেছিল তাদের চলচ্চিত্র (film) তুলছিলাম। রীলটা শেষ হয়ে গেলে ক্যামেরাটি আমার সহকারীর মারফৎ ওপরে পাঠিয়ে দিয়ে যতক্ষণ আমার সিলিণ্ডারে বাতাস থাকে ততক্ষণ এদিক-ওদিক একটু ঘুরে বেড়াতে গেলাম।

আমার সহকারীর দিক থেকে ফিরে আমি মাঝারি আকারের ব্যারাকুডা-প্রাচীরের সামনে পড়ে গেলাম। ডুবুরির মুখোশের ভিতর দিয়ে ওপর-নিচ এপাশ-ওপাশ তাকিয়ে দেখলাম। গাড়ির ঘোড়ার চোখের ঠুলির মত মুখোশ কেবল সামনের দিক ছাড়া অন্যদিকের দৃষ্টি আড়াল করে রাখে। ব্যারাকুডার দল মনে হল সমুদ্রের তলা থেকে জলের ওপর পর্যন্ত দেওয়াল তৈরি করেছে। একাকী এবং নিরস্ত্র আমি ; আমার ভয়ের কম্প চেপে রাখতে পারলাম না।

ব্যারাকুডার প্রতি আমরা বিশেষ গুরুত্ব দিইনি এবং ডুবুরিদের পক্ষে তারা যে ভয়ের কোন ব্যাপারই নয়, একথা আমি পত্রিকাতেও লিখেছি। এখন এদের সঙ্গে মুখোমুখি হয়ে বিপদ সম্বন্ধে আমি নিশ্চিন্ত হতে পারলাম না। অনেকে একত্র দলবদ্ধ হয়ে থাকার ফলে মনস্তাত্ত্বিক দিক থেকে তারা বেপরোয়া হওয়ার দরুণ অকস্মাৎ ক্ষতিকর কোন কিছু করে ফেলতে পারে।

আমি নিজেকেই ভীত না হয়ে একটা ডুবো পাহাড়ের আশ্রয় নিতে বললাম। আমি ঘুরে গেলাম। ব্যারাকুডার পর্দা পাহাড়টাকে আড়াল করে রেখেছিল। বুক ধুক ধুক করতে লাগল; আমি সম্পূর্ণ পাক ঘুরলাম; চতুর্দিকেই এই বন্য প্রাণীদ্বারা আমি আবদ্ধ হয়ে পড়েছি। তারাও তিন-চারটির গভীরতায় উদ্দেশ্যমূলকভাবেই আমার চারদিকে ঘুরছে। তাই তাদের মধ্য দিয়ে আমি আর কিছুই দেখতে পাচ্ছিনে। ওখান থেকে বেরিয়ে আসার আর কোন পথ নেই। আমি নিঃশব্দে একটি কুয়োর মধ্যে ডুব দিয়ে সোজা তলার দিকে গেলাম, বাতাস যেটুকু অবশিষ্ট আছে টিকিয়ে রাখার চেষ্টা করলাম। ব্যারাকুডা দিয়ে গঠিত বৃহৎ রুপালি ড্রাম (সিলিণ্ডার) আমার অক্সিজেনবাহী পাত্র থেকে যে বুদবুদ উঠছিল তাকে কেন্দ্র করে কয়েকবার পাক ঘুরল। অবশেষে বিপরীত দিকে পাক ঘুরে পর্দাটার পাক খুলে সমুদ্রের পশ্চিম দিকে চলে গেল।

ব্যারাকুডার দল কুস্তোকে বিপজ্জনক 'চক্রব্যূহের' মধ্যে ফেলেছিল। তিনি যদি ঐ প্রাচীর ভেদ করে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করতেন, তবে তাঁর জীবন বিপন্ন হত নিশ্চিত। বুদ্ধি স্থির রেখে, গ্যাস-সিলিণ্ডার থেকে বায়ু নির্গমন বন্ধ করে দেওয়ার ফলে ব্যারাকুডারা তাঁর হদিস করতে পারেনি; নিঃশব্দে নিচের দিকে চলে যাওয়ায় ঘেরাওকারীরা তাঁকে হারিয়ে ফেলেছিল। তাই তিনি রক্ষা পান।

ব্যারাকুডা সম্পর্কে মানুষের ভীতি অনেককাল আগে থেকেই রয়েছে। ১৬৬৫ সালে প্রকাশিত লর্ড ডি রচেফোর্টের প্রকৃতিবিজ্ঞান বইতে বলা হয়েছে, নরমাংসলোভী প্রাণীদের মধ্যে 'বেকুনে' অত্যন্ত দুর্দ্ধর্ষ। পশ্চিম ভারতীয়দের কাছে ব্যারাকুডা 'বেকুনে' নামে পরিচিত। এরা বেকুনেকে হাঙ্গরের চেয়েও বেশি ভয় করে।

* পিরান্‌হা (Piranha)

দেখতে ছোট, কতকটা আমাদের দেশের খলসে পুটির মত, কিন্তু এদের সূচের মত ধারাল দাঁত আর দলবেঁধে আক্রমণ করার কথা জেনে মানুষ ওদের নাম শুনলেই ভীত হয়ে পড়ে। সাগরে যেমন ব্যারাকুডা, দক্ষিণ আমেরিকার

নদীগুলিতে তেমনি পিরান্হা আতঙ্কস্বরূপ। এদের মোট ২০ প্রজাতির মধ্যে ৪ গোষ্ঠী মানুষকে আক্রমণ করে বলে জানা যায়। এদের দাঁত এমন তীক্ষ্ম যে, ৪০০ পাউণ্ড ওজনের একটি শুয়োর চোখের সামনে কয়েক মিনিটের মধ্যেই এমনভাবে খেয়ে ফেলবে যে, তার সাদা চকচকে হাড়গুলি ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না। দক্ষিণ আমেরিকার যেসব নদীতে পিরানহার বসতি, সেখানকার বাসিন্দারা ভয়ে জলে নামে না।
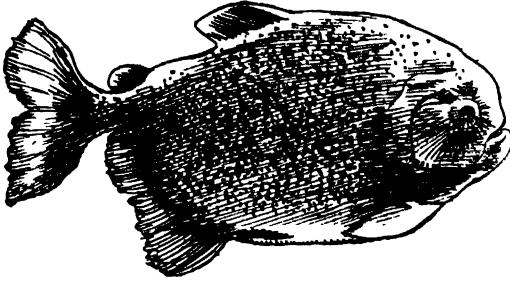
পিরান্হা (**Piranha**)

দক্ষিণ আমেরিকার মহাদেশের ক্ষুদ্র অথচ ভয়ংকর প্রাণী শুধু মানুষ-নয়, সব জীবজন্তুরই ভীতি উৎপাদন করে। ব্রেজিলের তৃণ অঞ্চলে এমন ড্রাইভার জাতের পিঁপড়ে আছে যারা পাঁচ-ছয় মাইল দীর্ঘ, দুই মাইল চওড়া স্থান জুড়ে অভিযান চালায় এবং তাদের যাত্রাপথে যেকোন প্রাণী পড়ুক তাকে নিশ্চিহ্ন করে মৃত্যুর মত দুর্বার গতিতে এগিয়ে চলে। এদের ভয়ে বন্য জীবজন্তু পাগলের মত ছুটোছুটি ক'রে পালায়। দলের মধ্যে হরিণ বা গরুর মত কোন প্রাণী পড়লে কয়েক মিনিটের মধ্যেই তাকে খেয়ে কংকালে পরিণত করবে। পিরান্হারা যেন জলের ড্রাইভার পিঁপড়ে। পিরান্হাদের চোয়াল স্থানীয় অধিবাসীদের ভাষায় 'কাঁচি'। ডাক্তারী অস্ত্র স্ক্যাল্পেলের মত ধারাল পিরান্হার দাঁত দিয়ে কাটার যন্ত্র তৈরি হয়।

* গ্রাউপার (**Grouper**)

জলের মধ্যে হঠাৎ দেখলে মনে হবে আমাদের পরিচিত কৈমাছ বিশেষ কোন খাদ্যগুণে বা জাদুবলে বিরাট আকার ধারণ করেছে। একটু ভাল করে লক্ষ্য করলে পার্থক্য বোঝা যাবে। প্রথমেই নজরে পড়বে এর অদ্ভুত ধরণের চোখের গড়ন। সাধারণ মাছের চোখ থাকে তার গায়ের সমতলে কিন্তু গ্রাউপারের চোখ মোটরগাড়ির হেডলাইটের মত শরীর থেকে উঁচুতে বসান। চোখের তারায় শীতল হিংস্রতার প্রকাশ। এর অন্য বৈশিষ্ট্য হল, বিরাট মুখগহ্বর।

হাঁ করলে মনে হবে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড গ্রাস করতে পারে। ভারি চোয়াল উঁচু করে এ যখন জল শুষতে থাকে জলের সঙ্গে মুখের সামনে যা আসে সবই উদর-কোঠায়·চলে যাবে। একজন আস্ত মানুষকে এক ঢোকে গিলে ফেলতে এর মোটেই
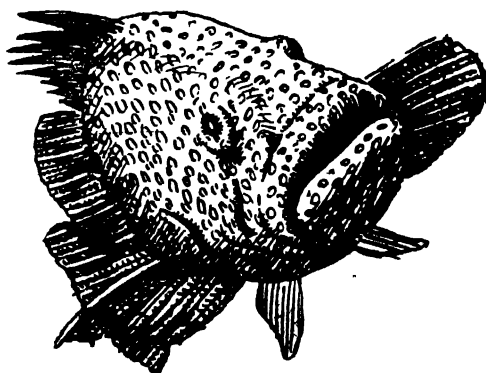
জায়াণ্ট গ্রাউপার (Gian Grouper)

আটকায় না। পাতালপুরীর দৈত্যের মত গ্রাউপাররা প্রবাল দ্বীপের গায়ে গুহার অন্ধকারে, প্রবালগুচ্ছের আড়ালে, সাগরতলে পড়ে থাকা ডুবো জাহাজের ফাঁকে' 'ফোকরে লুকিয়ে থাকে। লক্ষ্য মাছ, সমুদ্রকচ্ছপ বা অন্য প্রাণী ধরা। মুক্তাসন্ধানী ডুবুরি আচম্বিতে গ্রাউপারের সামনে পড়লে তাকে আর শুক্তির ঝুরি নিয়ে ওপরে উঠে আসতে হবে না, তার স্থান হবে গ্রাউপারের শীতল পাকস্থলিতে।

গ্রাউপার এক হাজার পাউণ্ড পর্যন্ত ওজন হয়ে থাকে। গায়ের রঙ নীলাভ সবুজ, নীল, লাল-নীল হলুদ-কালোতে রঞ্জিত নানাভাবে চিত্রিত। নীল গ্রাউপারদের সর্বাঙ্গে কালো বিন্দু, দেখলে মনে হয় নীল জমির ওপর কালো-ফুটকি সিল্কের ছাপা শাড়িতে গা ঢেকে রেখেছে। শান্ত আকর্ষণীয় পোষাকের সঙ্গে স্বভাবের কোন মিল নেই। অনেক সময় ডুবুরিরা সাগরজলে নেমে নিখোঁজ হয়ে যায়। এইরকম গুম করার জন্য ন্যায়সঙ্গতভাবেই দায়ী করা হয় গ্রাউপারদের।

* সার্জন ফিস (Surgeon fish)

নাম শল্যচিকিৎসক মাছ। এ নামের কারণ ছোট মাছটির পিঠের ওপরকার ও পেটের দিককার ডাক্তারের অপারেশন করার স্ক্যালপেলের মত ধারাল কাঁটার

ঝালর। কাঁটাগুলি কাৎ হয়ে গায়ের সঙ্গে লেগে থাকে। উত্তেজিত হলো সোজা খাড়া হয়ে ওঠে। তখন একে কেউ আক্রমণ করলে তার মুখ অক্ষত থাকবে
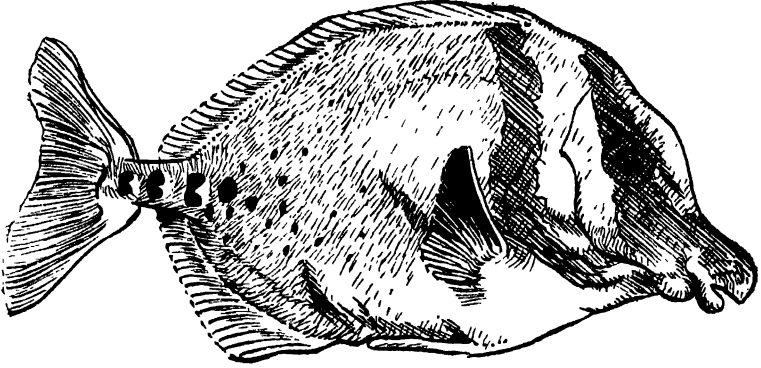
সার্জন ফিস (Surgeon fish)

না আর যদি গিলে ফেলে তবে তা হবে দো-ধার ক্ষুর গিলে ফেলার সামিল। এরূপ অস্ত্র বহন করার ফলে সার্জন ফিস আকারে ক্ষুদ্র হলেও অনেকেই একে সমীহ করে চলে। হালকা নীল রঙ, মুখের ওপর কালো দাগ, লেজের দিকে ফুট্‌কি বিন্দু। প্রবাল দ্বীপের উষ্ণ জল অঞ্চল ও প্রবাল উদ্যান এদের প্রিয় বিচরণ ক্ষেত্র।

* টোডফিস (Toadfish)

চেহারায় ব্যাঙের সাদৃশ্য আছে কিন্তু স্বভাবে ও পরিবেশে নয়। সার্জনফিসের মতই এর পিঠের ওপর কাঁটা, আত্মরক্ষার অস্ত্র। সার্জনফিসের কাঁটায় বিষ নেই, টোডফিসের কাঁটার বিষ মানুষের দেহে বিঁধলে প্রাণহানি হয় না কিন্তু আহত স্থান ফুলে যায় এবং ব্যথা হয় অসাধারণ। টোডফিস সার্জনের মত কাঁটা উঁচিয়ে চলাফেরা করে না, পাহাড়ের গায়ে ফাটলে, বালি কিংবা কাদামাটির মধ্যে খাদ্যপ্রাণীর প্রতীক্ষায় লুকিয়ে থাকে। মানুষ অসতর্কভাবে তার পিঠে পা দিলে সঙ্গে সঙ্গে হুল ফুটিয়ে দেবে। যারা পাথরের আড়ালে বা ফাটলে লুকিয়ে থাকে তারা দেহের রঙ পাল্‌টাতে ওস্তাদ। যখন যেমন পরিবেশ তখন সেখানকার পারিপার্শ্বিকেব সঙ্গে নিজেকে এমনভাবে মিশিয়ে নেয় যে, তাদের চেনাই মুশকিল।

সামুদ্রিক প্রাণীদের খাদ্যসংগ্রহের ব্যাপারে বিবিধ কৌশল লক্ষ্য করার মত। কেউ সারাক্ষণ খাদ্যের সন্ধানে টহল দিচ্ছে, গায়ের জোরে অন্যকে কাবু করে

উদরপূরণ করছে ; কেউ অন্যের ভুক্তাবশিষ্ট পেয়েই খুশি ; কেউ ছদ্মবেশ ধারণ করে আছে যাতে তাকে চিনতে না পেরে কাছে আসে এবং তার কবলে পড়ে। নিজে খাবার জোগাড় করা এবং তাকে অন্যেরা খাদ্যবস্তুতে পরিণত না করে সেদিকে লক্ষ্য রেখে আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করা—এ দুটি প্রাথমিক অভীষ্ট। এর সঙ্গে যুক্ত আছে বংশবৃদ্ধি ও সন্তানসন্ততি রক্ষার উদ্যম। মাছেদের সবাই সন্তান পালনের দিকে সমান যত্নবান নয়। কিন্তু টোডফিস রীতিমত দায়িত্বশীল, বিশেষ করে দায়িত্বশীল পিতা। ডিমগুলি পুরুষের জিম্মায় দিয়ে স্ত্রী-টোডেরা নিশ্চিন্ত। পুরুষ তা অন্যের গ্রাস থেকে আগলে রাখে, আততায়ীর বিরুদ্ধে তার অস্ত্র বিষমাখানো কাঁটাবল্লম।

* অক্টোপাস (Octopus, Eledone)

আমাদের মধ্যে খুব কম লোকই জীবন্ত অক্টোপাস দেখেছে কিন্তু এদের ভয়াবহতা সর্বজনবিদিত। তার কারণ, গভীর সমুদ্রের এই প্রাণীর অদ্ভুত গড়ন ও তার সম্বন্ধে নানা রকম রোমাঞ্চকর কাহিনী। কোন প্রাণীর শুধু মাথা আর পা আছে , পা একখানা দুখানা নয়, আট দশখানা—একথা ভাবতেই কেমন একটা ভৌতিক ব্যাপার বলে মনে হয়। অক্টোপাস ও স্কুইড গোষ্ঠীকে জীবনবিজ্ঞানের ভাষায় বলা হয় সেফালোপড (Cephalopod)। এ শব্দটি দুটি গ্রীক শব্দের সমন্বয়ে গঠিত—Cephalo (মাথা) এবং pod (পদ) ; বলা যায় 'শিরঃপদ'। অক্টোপাস ও স্কুইডকে দেখলে এ নামকরণের সার্থকতা বোঝা যায়। মাথার সঙ্গে লাগান পা। অক্টোপাসের পা আটখানা, স্কুইডের দশখানা। আসলে দেহের অন্যান্য অঙ্গপ্রতঙ্গও ঐ মাথার মত দেখতে অঙ্গের মধ্যে আছে তবে কোথায় মাথা শেষ এবং দেহের শুরু বোঝা যায় না। যদি এক বিরাট মাকড়সার মাথা থেকে হাতির শুঁড়ের মত লম্বা ৮ খানা পা বেরিয়ে আসত তবে তা থেকে অক্টোপাসের রূপের কিছুটা আভাস পাওয়া যেত।

কতক অক্টোপাস আছে যাদের পিঠের ওপর ছড়ানো কুলোর মত পর্দা, চারদিক ঘিরে বাহুগুলো মোটা থেকে সরু হয়ে গেছে। পর্দার নিচে টিয়াপাখির ঠোঁটের মত শক্ত মুখ, ঘোলাটে নিষ্ঠুর ঘুম-ঘুম দুটি চোখ। মুখের ভিতর সরু কাঁচের টুকরার মত ধারাল জিভকণা, উল্টা করে বসান, যার ফলে কোন প্রাণীকে বাহুর বাঁধনে চেপে ধ'রে ঠোঁট দিয়ে শক্ত অংশ চূর্ণ করা এবং নারকেল কোরান বঁটির মত জিভ দিয়ে মাংস কুরে নেওয়ার সুবিধা। আর অক্টোপাসের বাহু ? আধুনিক বিজ্ঞানের কাছেও তা রীতিমত বিস্ময়।

অক্টোপাসের বাহু হাতির শুঁড়ের মত কোমল মাংসপেশীতে গঠিত। দেহে কোথাও অস্থি নেই—মাছের মত শক্ত হাড় বা হাঙ্গরের মত কোমল অস্থিও নয়—

কিন্তু সেজন্য এর শক্তি বিন্দুমাত্র কমেনি। প্রতিটি বাহুতে প্রায় ১২০ জোড়া করে সারি সারি বায়ুশূন্য শোষক-বাটি (Vacuum cup)। মাংসপেশী দিয়ে এগুলো এমনভাবে নিয়ন্ত্রিত যে, কোন বস্তু বাহু দিয়ে চেপে ধরলে কোন মতেই তা ছাড়ানো যাবে না, বাহু ছিঁড়ে যেতে পারে কিন্তু বাহুর বাঁধন শিথিল হবে না।
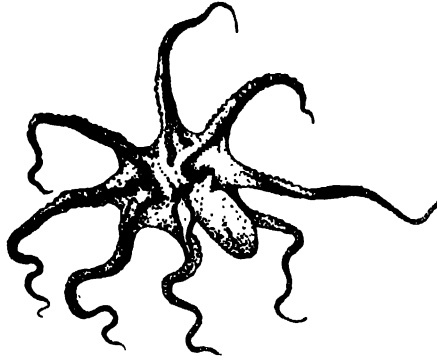
অক্টোপাস (Octopus)

অক্টোপাস একবার যদি শত্রুকে বাহুপাশে বেঁধে মুখের কাছে আনতে পারে তবে তাকে কাবু করার রাসায়নিক অস্ত্র প্রয়োগ করবে। তার মুখের ভিতর আছে বিষের থলি। প্রতিপক্ষের দেহের মধ্যে খানিকটা বিষ ঢেলে দিলে সে অবশ হয়ে পড়বে। তাতেও যদি শত্রু ঘায়েল না হয় এবং অক্টোপাসের শক্ত বাঁধন ছিঁড়ে ফেলে তাকেই খতম করতে উদ্যত হয়, তখন অক্টোপাস প্রয়োগ করে আধুনিক রণক্ষেত্রের কৌশল। এর মাথার নিচে টিউবের মধ্যে আছে গাঢ় কালো রঙ। যুদ্ধে বেগতিক দেখলে পিচকারির মত টিউব থেকে কালো রঙ ছিটিয়ে দিয়ে জলের মধ্যে 'ধূম্রজাল' সৃষ্টি করে। তার আড়াল দিয়ে পালাবার সময় বাহুর বন্ধন হঠাৎ খুলে দিয়ে জেট ইঞ্জিনের মত তীরবেগে জল ঠেলে পিছনদিকে ছিটকে গিয়ে লুকায়। হতভম্ব শত্রু বুঝতে পারে না পরাজিত পক্ষ কোন দিকে পালাল।

অক্টোপাসের আর একটি কৌশল হল রঙ পাল্টিয়ে শত্রুর চোখে ধুলা দেওয়া। সাধারণ অক্টোপাসের (Octopus Vulgaris) দেহে এমন বর্ণকোষ আছে যা দিয়ে সে মুহূর্তে গায়ের রঙ বদলাতে পারে। যেখানে দেখা যাচ্ছিল কালো বাদুড় সদৃশ প্রাণী, এক নিমেষেই তাতে হয়ে গেল লাল, গোলাপী বা সবুজ পদ্মপাতার রঙ। শত্রুপক্ষ এতে থতমত খেতেই পারে!

সমুদ্রে অক্টোপাস ও স্কুইডের নানা প্রজাতি ও নানা আকার দেখা যায়। এক

ইঞ্চিরও ছোট থেকে ২০০ ফুট লম্বা—যেন লিলিপুট থেকে দৈত্য। সমুদ্রে এদের সংখ্যাই সর্বাধিক এবং এরা কম করেও ৪০ কোটি বছর ধরে নিজেদের সংখ্যা-প্রাধান্য বজায় রেখেছে।

অতি প্রাচীনকাল থেকেই সাগরের এই অদ্ভুত জন্তুটির ভয়ংকর স্বভাব লেখকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। হোমার, প্লিনি, 'মবি ডিক'-এর লেখক হেরম্যান মেলভিন অক্টোপাসের সঙ্গে মানুষের লড়াই-এর বিবরণ দিয়েছেন। ফরাসী লেখক ফিক্টর হুগো অক্টোপাস ও এক তরুণের মধ্যে জীবনমরণ সংগ্রামের কাহিনী বর্ণনা করেছেন। এই সব বিবরণ পড়তে পড়তে পাঠকের বুকের স্পন্দন থেমে আসে। তবে এতদিন মনে করা হত, লেখকের উদ্দাম কল্পনা ভয়ংকর কাহিনী বর্ণনায় অতিরঞ্জনের জন্য দায়ী। কিন্তু পরবর্তীকালে এমন সব তথ্য পাওয়া গেছে যা থেকে বোঝা যায়, সমুদ্রে এমন ভয়ংকর জীব আছে যার সম্পূর্ণ পরিচয় এখনো মেলেনি। তবে যেটুকু মিলেছে তাতেই এদের মুখোমুখি হতে আধুনিক মানুষের হৃৎকম্প হবে।

এরোপ্লেনের জেট ইঞ্জিন পিছন দিকে ধাক্কা মারে, ফলে প্লেন সামনের দিকে চলে। জল-জেটের ধাক্কায় অক্টোপাস ছুটে চলে, জলের ওপরেও ছিটকে উঠতে পারে। থর হেয়ারডাল 'কনটিকি অভিযানের' সময় ভেলাতে করে প্রশান্ত মহাসাগর পার হন। ঐ সময় 'বিড়াল সাইজের' এক অক্টোপাস ভেলার ওপর এসে পড়েছিল। জলের বাইরে তার চলার শক্তি ছিল না, বেঁচে থাকাও সম্ভব ছিল না।

শত্রুর সঙ্গে লড়াই করার অস্ত্র আক্টোপাসের ভাণ্ডারে অনেকগুলো। শোষকবাহুর নাগপাশ, শক্ত ঠোঁট ও ছুরির মত ধারাল জিভ, অবশ করার বিশেষ থলি, জলের মধ্যে কুয়াশা সৃষ্টি করে ইন্দ্রজিতের মেঘের আড়ালে লুকাবার মত কালো কালির কৌশল, জেট-স্পীডে পালাবার ক্ষমতা। এ সবের ওপরে রয়েছে তার ছিন্নবাহু ফিরে পাওয়ার আশীর্বাদ। যুদ্ধে বাহু ছিঁড়ে গেলে কয়েকদিন অক্টোপাস বাসার মধ্যে বিশ্রাম নেয়, হাসপাতালে 'ইনটেনসিভ কেয়ার' কক্ষে পরিচর্যায় অবস্থানের মত। অল্পদিনের মধ্যে ছিন্ন বাহু মেরামত হয়ে যায়, নতুন অংশ গজিয়ে ওঠে শক্তিতে যা আগের চেয়ে কোন ক্রমেই ঊন নয়।

* অক্টোপাসের আকার।

অক্টোপাস আকারে স্কুইডের মত না হলেও তার বাহু ২৫-৩০ ফুট পর্যন্ত হয়ে থাকে। বৃহত্তম অক্টোপাস (Octopus doffeine) সাগরের দানবস্বরূপ। এর এক-একটি বাহুর দৈর্ঘ প্রায় ৩২ ফুট! আর এদের ক্ষুদ্রতম প্রজাতি দৈর্ঘে মাত্র ১½ ইঞ্চি, বাসস্থান ভারত মহাসাগর।

দানব অক্টোপাসের সম্বন্ধে নানারকম ভয়ংকর কাহিনী প্রচলিত আছে। এরা

নাকি ভীষণ হিংস্র, দীর্ঘ বাহু দিয়ে নৌকা ও আরোহীদের টেনে জলের তলায় নিয়ে যায়।

অক্টোপাস সাধারণত গোপনচারী প্রাণী, মানুষের কাছাকাছি আসতে চায় না। তবে এদের আক্রমণে বিষের ক্রিয়ায় মানুষ মারা পড়েছে, এমন ঘটনা বিরল নয়। অস্ট্রেলিয়ার সাগরকুলে জলের তলায় পাহাড়ী গুহায় এক প্রজাতির নীল-চক্র-ওয়ালা অক্টোপাস (blue-ringed Octopus) আছে, যারা মাত্র ৪ ইঞ্চি লম্বা কিন্তু এদের বিষ এমন তীব্র যে আক্রান্ত মানুষ দুই ঘণ্টার মধ্যে শ্বাসকষ্ট ভোগ করে মারা পড়ে। কখন কখনো অল্প পরিমাণ বিষ দংটস্থানে প্রবেশ করায় আহত ব্যক্তি পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে পড়ে।
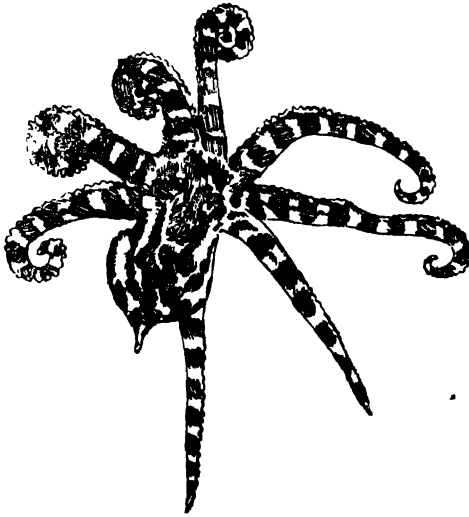
নীল-চক্রওয়ালা অক্টোপাস (Blue-ringed Octopus)

* বংশবৃদ্ধি

জীবজগতের বেশির ভাগ প্রাণীর মত অক্টোপাস-গৃহিণীও সন্তান পালনের প্রধান দায়িত্ব পালন করে। সাধারণ অক্টোপাস শীতের শেষ থেকে বসন্তের প্রথম দিক—এই সময়ের মধ্যে ডিম পাড়ে। জলের মধ্যে পাহাড়ের গুহায় ফাটলের মধ্যে ডিম-গুলো ছোট ছোট নিশানের মত পাথরের গায়ে ঝুলিয়ে রাখে। ডিমের সাইজ ⅛ ইঞ্চি থেকে ¼ ইঞ্চি। ক্রমে বড় লার্ভার আকার হয়ে এগুলো সাদা শিমের গুচ্ছের মত হয়, সংখ্যা ৫০ হাজার থেকে দেড় লাখ। ডিম ফুটতে সময় লাগে ৪ থেকে ৮ সপ্তাহ।

এই পুরো সময়টা মা-অক্টোপাস ডিমগুলো পাহারা দেয়, জল আলোড়ন ক'রে ডিমগুলো পরিষ্কার ক'রে দেয়. বাসা ছেড়ে কখনই দূরে যায় না। ডিম থেকে যখন বেরিয়ে আসে তখনই বাচ্চাদের অবয়ব ঠিক বড়দের মতই, কেবল আকারে ছোট এই যা। বাচ্চা অক্টোপাসগুলো ঝাঁকে ঝাঁকে জলের ওপরে ভেসে ওঠে। তখন ওদের খাদ্য সাগরস্রোতে ভাসমান মিহি জলজপ্রাণী প্ল্যাংকটনের সঙ্গে ওরা কয়েক সপ্তাহ চ'রে বেড়ায়। এ সময় ওরা প্ল্যাংকটন খেয়ে বড় হয়ে উঠতে থাকে। এই সময় সাগরের নানা জীবের আক্রমণে ওদের বেশির ভাগ প্রাণ হারায়। তা না হলে সপ্তসমুদ্র অক্টোপাসেরাই পূর্ণ করে ফেলত। একটু বড় হলেই অবশিষ্টরা সাগরতলে গিয়ে আশ্রয় নেয়। তখন তাদের আত্মরক্ষার ক্ষমতাও অনেক বেড়ে গেছে।

কয়েক জাতের অক্টোপাস দিনে সাগরতলের বাসায় থাকে, রাত্রিতে জলের ওপর স্তরে উঠে আসে। **Argonauta** জাতের স্ত্রী-অক্টোপাস বাসায় ডিম পাড়ে না। কাগজের মত পাতলা থলিতে ডিম রেখে না ফোটা পর্যন্ত তা সঙ্গে করে বয়ে বেড়ায়।

* অক্টোপাশের সঙ্গে লড়াই

বিশ্ববিখ্যাত ফরাসী লেখক ভিক্টর হুগো **Toilers of the Sea** গ্রন্থে অক্টোপাসের সঙ্গে এক তরুণের যুদ্ধের লোমহর্ষক বিবরণ দিয়েছেন। নোতর ডাম ডি প্যারী, লা মিসারেবলস ও টয়লার্স অব দি সী ভিক্টর হুগোর গুরুত্বপূর্ণ সাহিত্যকীর্তি বলে স্বীকৃত।

লুই নেপোলিয়ন যখন ফ্রান্সে দ্বিতীয় সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন, গণতন্ত্রপ্রেমী ও মানবদরদী হুগো তার প্রতিবাদে প্রথমে ইংলিশ চ্যানেলের মধ্যে জার্সি এবং পরে গার্ণসি দ্বীপে স্বেচ্ছা-নির্বাসন জীবনযাপন করেন। গার্ণসি-তে থাকার সময় তিনি 'টয়লাসা অব দি সী' লেখেন।

এর বিষয়বস্তু হল ঃ একখানা স্টীমবোট ডুবে গিয়েছিল। তার মালিক ঐ স্টিমারের ইঞ্জিনটি সাগর জল থেকে তুলে আনতে পারবে যে ব্যক্তি, তার জন্য এক অভিনব পুরস্কার ঘোষণা করেন। তিনি সর্বসাধারণকে ঘোষণা দ্বারা জানিয়ে দিলেন ঃ যে ব্যক্তি ইঞ্জিনটি উদ্ধার করতে পারবে তার সঙ্গে তাঁর সুন্দরী কন্যার বিবাহ দেবেন।

এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করল গিলিয়াট নামে এক মৎস্যজীবীর পুত্র।

* * *

গিলিয়াট ডুবো জিনিসের সন্ধানে একদিন জলমগ্ন এক পাহাড়ের গুহায় গিয়ে উপস্থিত হল ; সেখানে এক শত্রুর সাথে তার দেখা।

যে গুহাটায় সে আগের মাসে এসেছিল এবারও সেখানটায় গিয়ে হাজির হল। তফাৎ এই, এর আগের যাত্রায় সে জলের মধ্যে পাহাড়ের যে এবার সে সাগরের দিক থেকে অংশটা তোরণের মত হয়ে আছে, লক্ষ্য করেছিল, সেখানে সে এবার এসেছে। ভাটার সময় জল কমে গেলে ওখানে যাওয়া চলে।

গুহার মধ্যে আবছা অন্ধকার। কিছুক্ষণের মধ্যে চোখ ঐ স্থানের অবস্থার সঙ্গে অভ্যস্ত হল। তার দৃষ্টি ক্রমে স্পষ্ট হতে লাগল ; সে বিস্মিত হয়ে গেল। সে আবার আলো-ছায়ার রাজপুরীতে এসে পড়েছে। সে দেখতে পেল সেই উঁচু ছাত, সেই স্তম্ভগুলো, আগের সেই লাল-হলুদ রক্তের দাগ, দেওয়ালের গায়ে শেওলা তাতে যেন মণিমুক্তা, আর ঐ শেষপ্রান্তে সেই মন্দিরের মত ঘর তার সামনে বেদীর মত পাথরখণ্ড। এসব জিনিসের দিকে এবার সে বিশেষ নজর দিল না কিন্তু আগেরবারের দেখা স্থানের ধারণা মনের মধ্যে ছিল। সে দেখল সব আগের মতই আছে। কোন পরিবর্তন হয় নি।

সামনের দিকে একটা দেওয়ালের ওপর তার নজর পড়ল। সেখানে একটা ফাটল রয়েছে। ওর ভিতর দিয়েই সে প্রথমবার এখানে এসেছিল। কিন্তু এখন সে যেখানে দাঁড়িয়ে, সেখান থেকে ওটা নাগালের অনেক বাইরে।

তোরণের কাছে তার চোখ পড়ল অন্ধকারমত খুপড়ি-গুহা, যেন গুহার মধ্যে গুহা। এটি দূর থেকেই সে দেখেছিল। এখন সে এর কাছাকাছি গিয়ে দাঁড়াল। যেটি সবচেয়ে কাছে, সেটি জলের ওপর জেগে উঠছে এবং সহজেই যাওয়া যায়। এর চাইতেও কাছে, তার হাতের নাগালের মধ্যেই রয়েছে একটা সমান্তরাল ফাটল। তার মনে হল ওখানে হয়ত কাঁকড়া আশ্রয় নিয়েছে। ওর মধ্যে হাত যতখানি সম্ভব ঢুকিয়ে দিয়ে সে অন্ধকারে হাতড়াতে লাগল।

হঠাৎ কে যেন তার হাত চেপে ধরল। তার সারাদেহে একটা অদ্ভুত, অবর্ণনীয় আতঙ্কের শিহরণ খেলে গেল।

কেমন একটা জীবন্তবস্তু, সরু খসখসে, চ্যাপ্টা, ঠাণ্ডা কাদাকাদা মত—তার খালি হাত গভীর তলার দিক থেকে তাকে পেঁচিয়ে ধরেছে। ওটি তার বুকের দিকে উঠে আসতে লাগল। এর চাপ দড়ি দিয়ে কষে বাঁধার মত। ক্রমাগত কষে ধরছে স্ক্রুর প্যাঁচের মত। এক মুহূর্তও নয়, এরই মধ্যে রহস্যজনক একটা বস্তু কব্জি ও কনুই প্যাঁচ দিয়ে কাঁধে পেঁাছেছে, একটা সরু ডগা বগলের নিচে চলে গেছে।

গিলিয়াট পিছিয়ে আসার চেষ্টা করল কিন্তু তার নড়ার ক্ষমতা ছিল না। সে যেন ঐ জায়গার সঙ্গে পেরেক দিয়ে গাঁথা পড়ে গেছে। তার বাঁ হাতখানা মুক্ত ছিল, সে ঐ হাতে ছুরিখানা ধরল। এতক্ষণ ছুরিটা সে দাঁতে চেপে রেখেছিল। ছুরিখানা হাতে রেখেই সে হাত পাথরে ভর দিয়ে নিজের ডান হাত ছাড়িয়ে নেবার প্রাণপণ চেষ্টা করল। কিছুই হল না, কেবল যে তাকে ধরেছে সে যেন

বিরক্ত হয়ে তাকে আরো জোরে কষে ধরল। এটি চামড়ার মত নরম, ইস্পাতের মত শক্তিশালী, রাত্রির মত শীতল!

দৈত্যের চোয়ালের ফাঁক দিয়ে ফাটলের ভিতর থেকে জিভের মত আর একটি আকার বেরিয়ে এল, ধারাল, লম্বা এবং সরু। তারপর হঠাৎ এটি আরো লম্বা ও সরু হয়ে তার গায়ের ওপর দিয়ে গিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরল। সঙ্গে সঙ্গে ভীষণ যন্ত্রণায় তার মাংসপেশী সংকুচিত হয়ে গেল। এমন যন্ত্রণা সে কখনও অনুভব করে নি। তার মনে হল, কতকগুলি গোল চ্যাপ্টা ধারাল মুখ তার চামড়ার ওপর কামড়ে ধরে রক্ত চুষে নিতে চাইছে।

তৃতীয় একটি বাহু পাথরের গর্ত থেকে বেরিয়ে তার গায়ের ওপর দিয়ে তার পাঁজরা প্যাঁচ দিয়ে দড়ি দিয়ে কষে বাঁধার মত বেঁধে ফেলে সেখানেই লেগে রইল।

যন্ত্রণা যখন চরমে ওঠে তখন আর অনুভূতি থাকে না। সেখানে তখন যথেষ্ট আলো ছিল। যে বীভৎস অঙ্গপ্রতঙ্গগুলি তাকে আটকে ফেলেছিল, সেগুলো সে স্পষ্ট দেখতে পেল। চতুর্থ একটি বাহু তীরের মত বেগে তার পেটের দিকে ছুটে এসে তাকে জড়িয়ে ধরল।

যে পিছল ফিতার মত বাহুগুলি তার দেহ পেঁচিয়ে কষে বেঁধে ফেলেছিল এবং অনেকগুলি শোষকবিন্দু দিয়ে আটকে রেখেছিল তার বাঁধন খুলে ছিঁড়ে বেরিয়ে আসা অসম্ভব হয়ে পড়ল। প্রত্যেকটা শোষকবিন্দু অসাধারণ যন্দ্রণা উৎপাদন করছিল। মনে হল অসংখ্য ছোট ছোট মুখ একই সঙ্গে খেতে শুরু করেছে।

গর্তের ভিতর থেকে একটি পঞ্চম লম্বা, সরু কাদাকাদা মত ফিতার মত বস্তু বেরিয়ে এল। এটা অন্যগুলির ওপর দিয়ে তার বুক চেপে ধরল। চাপ যতই বাড়ে, তার কষ্টও ততই বেড়ে যায়। তার দম ফেলাই কষ্টকর হয়ে দাঁড়াল।

এই জীবন্ত দড়িগুলির আগার দিকটা সুচালো কিন্তু হাতলের দিকে যেমন তলোয়ার ক্রমশ চওড়া হয়ে যায় এগুলোও ঠিক তেমনি। বোঝা যাচ্ছিল, সবগুলি একই কেন্দ্রের সঙ্গে যুক্ত। তারা তার গায়ের ওপর দিয়ে সুড়সুড় করে চলতে থাকে। যেখানে যেখানে শোষক মুখ বসে, সেখানে লাগে অদ্ভুত চাপ। এই মুখগুলো থেকে থেকে স্থান পালটায়।

হঠাৎ একটা গোলাকার চ্যাপ্টা আঠালো বস্তুপিণ্ড ফাটলের তলা থেকে বেরিয়ে এল। এটা মধ্যস্থল, এর সঙ্গে পাঁচটি দড়ি দুক্ত, গাড়ির চাকার মধ্যকার কুঁদার সঙ্গে যেমন আড়া যুক্ত থাকে তেমনি। এই বীভৎস জানোয়ারের অপর দিক থেকে আর তিনটি আঁকড়ে বাহু বেরিয়েছে। এর আগাগুলো রয়ে গিয়েছিল পাথরের তলায়। এই কাদা কাদা পিণ্ডটার মাঝখানে দেখা গেল দুটো চোখ।

চোখদুটি গিলিয়াটের চোখের ওপর নিবদ্ধ। সে শয়তান-মাছটিকে চিনতে পারল।

যারা দেখেনি তাদের পক্ষে শয়তানের অস্তিত্বে বিশ্বাস করা কঠিন। এর সঙ্গে তুলনায় প্রাচীনকালের সহস্রফণা জন্তু নেহাৎ তুচ্ছ মনে হবে।

আমরা অনেক সময় স্বপ্নে যে কাল্পনিক ভয়ংকর বস্তুর আভাস পাই তাকেই কবি ও লেখকেরা ভীতিময় প্রাণী বলে তাঁদের বইয়েতে বর্ণনা করেন কিন্তু ঈশ্বর কখন কখনো বাস্তব জীবনে তার চেয়ে অনেক বেশি ভয়ংকর প্রাণী সৃষ্টি করেন।

ভয় জাগানোই যদি স্রষ্টার লক্ষ্য হত, শয়তান-মাছ অপেক্ষা আর কোন যোগ্য প্রাণীর কথা চিন্তা করা যেত না।

তিমির বিশাল দেহ আছে, শয়তান মাছ তার তুলনায় ক্ষুদ্র; জলহস্তীর বর্ম আছে, শয়তান-মাছ তা থেকে বঞ্চিত; জারারাকা হিস্ হিস্ শব্দ করে, শয়তান মাছ মূক; গণ্ডারের শিং আছে, শয়তান-মাছের তা নেই; বিছার বল্লম আছে, শয়তান-মাছের হুল-বল্লম নেই; বুথুসের নখ আছে, শয়তানের সে সব কিছু নেই; বানরের লম্বা লেজ আছে, শয়তান-মাছের লেজ নেই; হাঙ্গরের ধারাল ডানা আছে, শয়তান-মাছের ডানা নেই; সজারুর কাঁটা আছে, শয়তান-মাছের কাঁটা নেই; তরোয়াল-মাছের তরোয়াল আছে, শয়তান-মাছের তরোয়াল নেই; টর্পেডোর বৈদ্যুতিক স্ফুলিঙ্গ আছে, শয়তান-মাছের তা নেই; টোডের বিষ আছে, শয়তান-মাছের বিষ নেই; সিংহের নখর আছে, শয়তান-মাছের নখর নেই; গ্রিফনের চঞ্চু আছে, শয়তান-মাছের তা নেই; কুমিরের চোয়াল আছে, শয়তান-মাছের দাঁত নেই।

শয়তান-মাছের দেহগঠন মাংসপেশীযুক্ত নয়, নেই কোন ভীতিকর কণ্ঠ, নেই বুকের পাটা, নেই শিঙ, নেই হুল, নেই নখর, নেই পুচ্ছ যা দিয়ে কিছু ধরতে পারে বা আঘাত করতে পারে; না আছে পাখনা, না আঁকড়েযুক্ত ডানা, না খোঁচা দেবার মত কোন ধারাল অঙ্গ, না তরবার, না বৈদ্যুতিক শক্ দেবার ক্ষমতা, না বিষ, না বাঁকানো ছুরির মত নখ, না ঠোঁট, না দাঁত—তবু যতসব জীব আছে তার মধ্যে সে সবচেয়ে ভয়ংকর অস্ত্রে সজ্জিত।

তবে এই শয়তান মাছ কী? এটা সাগরের রক্তচোষা।

কোন সাঁতারু যদি কোন স্থানের সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হয়ে উন্মুক্ত সাগরে গিয়ে উপস্থিত হয়, সেখানে হয়ত শান্ত জলের তলায় রয়েছে সমুদ্রের মনোরম দৃশ্য; কিংবা জনমানবহীন পাথরখণ্ডে গিয়ে পৌঁছে যেখানে নানাজাতের জলজ উদ্ভিদ ও শামুকজাতীয় ছোট ছোট প্রাণীর প্রাচুর্য, সেই রকম স্থানে পাহাড়ের গুহায় এর দেখা মিলবে। যদি ভাগ্যক্রমে এমনি স্থানে গিয়ে পৌঁছাও, কৌতূহলী না হয়ে

সেখান থেকে পালাও। আগন্তুক সেখানে বিস্ময়বিমুগ্ধ হয়ে প্রবেশ করে কিন্তু আতঙ্কে সেস্থান ছেড়ে পালায়।

উন্মুক্ত সাগরের পাহাড়ের মধ্যে ভীতিপ্রদ ভৌতিক প্রাণীটির বাস। ফ্যাকাশে রঙ, জীবটি জলের মধ্যে আন্দোলিত হয়। মানুষের বাহুর মত মোটা, লম্বায় প্রায় পাঁচ ফুট। এর দেহের ওপরটা এবরো-থেবরো। এর আকৃতি ডাঁট ছাড়া বন্ধকরা ছাতার মত। এই এলোমেলো বস্তুপুঞ্জ তোমার দিকে ধীরে ধীরে এগিয়ে আসে। হঠাৎ খুলে যায়; আটখানা বাহু হঠাৎ একটি মুখ আর দুটি চোখ ঘিরে খুলে যায়। এই বাহুগুলি জীবন্ত, তাদের গতি এঁকেবেঁকে-চলা আগুনের শিখার মত। যখন খুলে যায়, মনে হয় সেটি যেন চার-পাঁচ ফুট ব্যাসের এক চাকার আড়া। কী ভয়ংকর এর বিস্তার। শিকারের ওপর এ ঝাঁপিয়ে পড়ে। শয়তান-মাছ শিকারকে বেঁধে ফেলে।

যাকে আক্রমণ করে তাকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলে। এর তলার দিকটা হলদে, ওপরে মেটে রঙ। এটি বোধ হয় ছাই দিয়ে তৈরী করা হয়েছিল। এর আকৃতি মাকড়সার মত, কিন্তু এর বর্ণ গিরগিটির মত। উত্তেজিত হলে একে দেখায় বেগুনী। এর সবচেয়ে ভয়ংকর বিশেষত্ব এর কোমলতা।

এর প্যাঁচ শ্বাসরোধ করে, এর স্পর্শ অবশ করে ফেলে। এই রকম প্রাণীর খপ্পরে পড়েছিল গিলিয়াট কিছু সময়ের জন্য। দানবটি পাহাড়ের গুহার বাসিন্দা! ঐ স্থানের ভয়াল অধিপতি, যেন জলদানব। গুহার যা জাঁকজমক, সৌন্দর্য সব একা এরই।

আগের মাসে যেদিন গিলিয়াট এই গুহায় প্রবেশ করেছিল, ঢেউ-এর দোলায় এর কালো আভাস সে দেখতে পেয়েছিল। এইটিই তার বাড়ি। দ্বিতীয়বার প্রবেশ করে সে যখন কাঁকড়ার সন্ধান করছিল, সে ফাটলটি দেখতে পেয়ে ভেবেছিল কাঁকড়ারা হয়ত ওখানে লুকিয়ে আছে। শয়তান-মাছ ঐখানে লুকিয়ে শিকারের প্রতীক্ষা করছিল। ঐ গোপনস্থানের অবস্থান কি কল্পনা করা সম্ভব?

অমঙ্গলের প্রেতাত্মার মত তার কুদৃষ্টির প্রভাবে সেখানে কোন পাখি ডিম পাড়ে না, কোন ডিম ফুটে বাচ্চা হয় না, সেখানে কোন ফুল ফুটতে সাহস পায় না, কোন স্তনে দুধ আসে না। কোন হৃদয়ে প্রেম জাগে না, কোন আশা বিকশিত হয় না।

গিলিয়াট ফাটল দিয়ে গভীরে হাত ঢুকিয়ে দিয়েছিল, দানব সেটা চেপে ধরেছিল মকড়সা যেমন মাছি ধরে আটকে রাখে, এটিও তেমনি গিলিয়াটকে শক্ত করে ধরে রেখেছিল।

তার কোমরের বেল্ট পর্যন্ত জল, খালি পা তলায় পিছল গোলাকার পাথরের

ওপর-রাখা। তার ডান হাত জন্তুর লম্বা চ্যাপ্টা বাহু দিয়ে প্যাঁচানর ফলে অবশ এবং তার শরীর এই ভয়ংকর ফিতার বাঁধনের পর বাঁধনের ভাঁজে প্রায় অদৃশ্য।

শয়তান-মাছের আটটি বাহুর মধ্যে তিনটি পাহাড় আঁকড়ে ছিল, পাঁচটি গিলিয়াটকে বেঁধে ফেলেছিল। এইভাবে সে পাথর শক্ত করে ধরে অন্যদিকে মানুষ শিকারটিকে পাথরের গায়ে আটকে রেখেছিল। দুশো পঞ্চাশটি শোষক-মুখ তাকে চুষতে শুরু করেছিল। সে এমন বাহুর বন্ধনে পড়েছিল যার আঙুলগুলি প্রায় একগজ করে লম্বা, তার ভিতরের দিকে যেন মাংস কুরে খাওয়ার জীবন্ত ফোস্কা।

আগেই বলেছি, এই শয়তান-মাছের বাঁধন ছিঁড়ে বেরিয়ে আসা অসম্ভব। মুক্ত হওয়ার চেষ্টায় বাঁধন আরো ক'ষে বসে; যতই মুক্ত হওয়ার জন্য দাপাদাপি করা হয়, ফিতার বাঁধন আরো বেশি করে শক্ত হয়ে চেপে ধরে। কিন্তু গিলিয়াটের একটিমাত্র উপায় ছিল—তার ছুরি।

তার বাঁ হাতখানা কেবল মুক্ত ছিল। পাঠক জানেন কেমন জোরে সে তার বাঁ হাত ব্যবহার করতে পারত। বলা চলে তার ডান হাতা ছিল দুখানা।
তার হাতে ছিল খোলা ছুরি।

শয়তান-মাছের অ্যানটেনা (হাত) কাটা যাবে না, ওগুলি চামড়ার মত, ছুরি দিয়ে দুই খণ্ড ক'রে কাটা অসম্ভব, ধার থেকে পিছলে যায়। আক্রমণ করতে বাহুগুলি এমনভাবে জড়িয়ে ধরেছে যে, ওদের কাটতে গেলে গিলিয়াটের নিজের মাংসই কেটে যাবে।

জন্তুটি দুর্ধর্ষ তবে এদের ঠেকানর একটি উপায় মৎস্য-শিকারীদের জানা ছিল। সার্কের জেলেরা জানে আর জানে তারা যারা এদের সাগরে এই ধরণের কাজ করতে দেখেছে। শুশুকেরাও জানে। তারা কাট্‌লফিসের মাথা কেটে ফেলে। সাগরে তাই প্রায়ই পেন-ফিস পলিপস্‌ ও কাট্‌লফিসের মুণ্ডহীন দেহ দেখা যায়। কেবল মাথা কেটেই পলিপ্‌ বধ করা যায়, অন্য কোন উপায়ে নয়। গিলিয়াটের এসব বিষয় অজানা ছিল না।

সে আগে এই সাইজের শয়তান-মাছ দেখেনি। তার প্রথম মোলাকাতই হল বড় গোষ্ঠীর একটির সঙ্গে। অন্য কেউ হলে ভয়েই ভেঙে পড়ত।

ক্রুদ্ধ ষাঁড়ের সঙ্গে যেমন, তেমনি শয়তান-মাছের সঙ্গে লড়াইতে ঠিক একটি উপযুক্ত মুহূর্ত কাজে লাগান চাই। ষাঁড় যখন তার ঘাড় নিচু করে তখনই সেই সময়, শয়তান-মাছের ক্ষেত্রে উপযুক্ত সময় হল যখন সে মাথা এগিয়ে দেয়। গতি অত্যন্ত দ্রুত। সেই মুহূর্ত যে হারায়, তার জীবন শেষ।

আমরা যে বিষয়টি বর্ণনা করলাম তা ঘটে কয়েক মুহূর্তের মধ্যে। গিলিয়াটের দেহে আড়াইশো শোষক জিহ্বার চাপ চলছিল।
জানোয়ারটা ধূর্ত। সে প্রথমে শিকারকে বিহ্বল করে ফেলতে চায়। একবার ধরে, খানিক থামে।
গিলিয়াট ছুরিখানা হাতে চেপে ধরল, শোষণও বাড়ল।
সে জন্তুটাকে চেয়ে দেখল, ওটাও তাকে দেখছে।
হঠাৎ পাথর থেকে শয়তানটা তার ষষ্ঠ বাহুটা ঢিলা দিল এবং তার দিকে ধাঁ করে এগিয়ে দিয়ে তার বাঁ হাত চেপে ধরল। ঠিক এই সময় প্রচণ্ড এক ঝাঁকুনি দিয়ে সে তার মাথাটি এগিয়ে দিল। আর এক সেকেণ্ড, তাহলেই তার মুখ এসে গিলিয়াটের বুক কামড়ে ধরত। দেহের দুপাশ দিয়ে রক্ত ঝরছে, দুই হাতই প্যাঁচে আবদ্ধ, তার মৃত্যু ছিল অবধারিত।
কিন্তু গিলিয়াট সজাগ ছিল। সে অ্যানটেনা বাহুকে এড়িয়েছে, এবং যে মুহূর্তে দানব তার বুক কামড়ে ধরতে এগিয়েছে ঠিক সেই সময় বাঁ হাতে-ধরা ছুরি দিয়ে হানল আঘাত। দুদিকে দুটা ঝাঁকানি হল—একটা শয়তান-মাছের, সে পিছাল, আঘাতকারী গিলিয়াটও সরে এল তার পিছন দিকে। বিপরীতমুখী দুটি গতিই হল একই সঙ্গে যেন বিদ্যুতের ডবল ঝিলিক।
সে ছুরির ফলা চ্যাপ্টা, কদাকার, কাদাকাদা পদার্থের মধ্যে বসিয়ে দিয়েছে এবং শূন্যে যেমন চাবুক পাক দিয়ে চক্রাকারে ঘুরান যায়, তেমনি ছুরিখানা ঐ বস্তুর চোখদুটোর চারদিকে একটানে গোল বৃত্তাকারে ঘুরিয়ে মানুষ যেমন দাঁত টেনে তোলে তেমনি তার মাথাটি উপড়ে তুলে ফেলল।
যুদ্ধ শেষ। বাঁধনগুলি ঢিলে হয়ে গেল, ধীরে ধীরে ফিতে খুলে পড়ার মত দানব ঝুপসে পড়ল। অবলম্বনহীন হয়ে চারশো শোষক যন্ত্র তৎক্ষণাৎ মানুষটির গা থেকে খসে পড়ল। সেই বস্তু স্তূপ জলে তলিয়ে গেল।
লড়াইতে গিলিয়াটের দম শেষ হয়ে এসেছিস। সে বুঝতে পারল একটি কাদা কাদা মত আকারবিহীন স্তূপ তার পায়ের কাছে পাথরের ওপর পড়ে রয়েছে। তার মাথাটি একদিকে, দেহের বাকি অংশ পাথরের ওপাশে। আবার যদি বাহুগুলি তাকে বেঁধে ফেলে এই ভয়ে সে খানিকটা পিছিয়ে গেল।
কিন্তু দানব একেবারে খতম।
গিলিয়াট ছুরিখানা বন্ধ করল।

* স্কুইড (Squid Lycoteuthis diadema)

সমুদ্রে প্রায় ৩০০ প্রজাতির স্কুইড আছে। এরা সবাই লোনাজলের বাসিন্দা এবং সবাই শিকার ধ'রে খায়। খাদ্য হল মাছ, কাঁকড়া, শামুক এমন কি

স্বগোষ্ঠীর বাচ্চারাও এদের লোভের শিকার হয়ে থাকে। অক্টোপাসের সঙ্গে এদের পার্থক্য—এদের ১০ খানা বাহু, অক্টোপাসের আটখানা ; এদের দুখানা অন্যগুলির চেয়ে কিছুটা বেশি লম্বা এবং তাদের আগার দিকটা বৈঠার মত চ্যাপ্টা। অক্টোপাসের মত স্কুইডের বাহুতে সারি সারি শোষকবাটি ; শিকার চেপে ধরলে তার কবল থেকে রেহাই পাওয়া সহজ নয়। অক্টোপাস যেমন মূর্তিমতী রাক্ষসীর মত পাহাড়ে জলময় গুহায় শিকারের আশায় অপেক্ষা করে, স্কুইড তেমন নয়। সে বেগে ছুটে শিকার ধরে। স্কুইড জেট-পদ্ধতিতে চলে। শরীরের মধ্যে জল টেনে নিয়ে জল থেকে সে অক্সিজেন পায়, আবার

স্কুইড (Squid)

সেই জল বেগে বের করে দিয়ে সে চলার গতি লাভ করে। এইভাবে জলের চাপ বাড়িয়ে স্কুইড ঘণ্টায় ২০ মাইল বেগে ছুটে চলতে পারে। পালানর সময় অক্টোপাসের মত স্কুইড জলের মধ্যে এক রকম কালো কালির মত পদার্থ ছিটিয়ে দিয়ে ধূম্রজাল সৃষ্টি করে। তাছাড়া গায়ের রঙ পাল্টাতেও এরা ওস্তাদ। যেটি ছিল মেটেরঙের, মুহূর্তের মধ্যে হয়ত সেটি হয়ে যাবে গোলাপী বা লাল কিংবা বেগুনি।

জায়াণ্ট স্কুইড সমুদ্রের দৈত্যস্বরূপ। শুধু যে স্পার্ম হোয়েলের সঙ্গে এরা তুমুল সংগ্রাম করে তাই নয়, সুযোগ পেলে মানুষ ধরতেও পিছপা হয় না। যে যুগে পালতোলা কাঠের জাহাজ সাগর পাড়ি দিত, দীর্ঘবাহু এইসব কবন্ধ দানব ছিল নাবিকদের আতঙ্ক। কারণ প্রাণী অপ্রাণী বিবেচনা ছিল না, চলমান বস্তুমাত্রই ছিল তাদের আক্রমণের লক্ষ্য। সে লক্ষ্য বিশাল আকারের হলেও এরা পিছিয়ে আসত না। সমুদ্রের প্রাণীদের মধ্যে স্পার্ম হোয়েল হল স্কুইডের পরম শত্রু। এরা যেমন হিংস্র তেমনি শক্তিমান এবং সমুদ্রের বৃহত্তম জীবদের অন্যতম। স্পার্ম হোয়েল স্কুইড ভক্ষণে উৎসাহী, স্কুইডও ভীত নয়। কাজেই মহাসমুদ্রে এই দুই বীরবাহুর যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী। সাগর তোলপাড় করে যখন 'কণ্ঠ পাকড়ি ধরিল আঁকড়ি দুইজনা দুইজনে' সে মহারণ

প্রত্যক্ষ করা মানুষের পক্ষে প্রায় অসম্ভব, তবু আহত যোদ্ধাদের ক্ষতচিহ্ন দেখে প্রতিপক্ষের বিক্রম ও দেহের বিশালতা সম্বন্ধে অনুমান করা যায়।
পঞ্চাশ ফুট দীর্ঘ একটি সাধারণ স্কুইডের আঁকড়ে বাহুর শোষক-বাটির চক্রাকার দাগ হয় ৩ থেকে ৪ ইঞ্চি চওড়া। তিমিকে আঁকড়ে বাহু দিয়ে চেপে ধরলে এরূপ গোলাকার দাগ চিহ্ন থেকে যায়। এ ধরণের দাগ অনেক স্পার্ম হোয়েলের দেহে পাওয়া গেছে। মনে হয় এসব ক্ষেত্রে ৫০ ফুট স্কুইড যোদ্ধা ৬৫ ফুট স্পার্ম হোয়েলকে পরাস্ত করতে পারেনি, হয়ত তাকে শেষ পর্যন্ত পালিয়ে বাঁচতে কিংবা ভোজ্যবস্তুতে পরিণত হতে হয়েছে। কিন্তু এমন স্পার্ম হোয়েল ধরা পড়েছে যার গায়ে স্কুইডের শোষক-বাটির দাগ ১৮ ইঞ্চি চওড়া অর্থাৎ যে আঁকড়ে-বাহু এই দাগ সৃষ্টি করেছে তা মোটা ছিল বট্‌লপাম গাছ মাঝখান দিয়ে লম্বালম্বি চিরে ফেললে যেমন হয় তার চেয়ে বেশি ছাড়া কম নয়। বিজ্ঞানী হিসাব করে বলেন, এরূপ মহাদানব স্কুইড অন্ততপক্ষে ২০০ ফুট লম্বা ছিল। [দ্রষ্টব্য **Ocean Life, Martin and Heather Angel**]

* বাস্তব হিসাব

কতখানি ব্যাসের গোলাকার শোষক-দাগ হলে সে বাহু কতখানি দীর্ঘ হওয়ার সম্ভাবনা, এ হিসাব করেছেন জীববিজ্ঞানী। এ ছাড়া স্কুইড ও অক্টোপাসের যে বাস্তব দেহ পাওয়া গেছে তা থেকে এদের দৈত্যাকৃতি জানা যায়।
১৮৮৮ সালে নিউজিল্যাণ্ডের উপকুলে একটি স্কুইড ঢেউ-এর দোলায় এসে পড়েছিল। তার বাহুগুলি ছিল ৩৫ ফুট দীর্ঘ, দেহ সমেত মোট দৈর্ঘ ৫৭ ফুট। এমন প্রমাণ পাওয়া গেছে যে, গভীর সমুদ্রে এর চেয়ে বড় আকারের স্কুইড আছে, তবে এদের সঙ্গে মানুষের মোলাকাত হওয়ার সম্ভাবনা নেই বললেই হয়।
অদ্ভুত উপায়ে এক অক্টোপাসের বিশালত্ব জানা যায়। একটা স্পার্ম তিমি ধরে জলগৃহে (aquarium) রাখা হয়েছিল। অত্যধিক আহারের ফলে হোক বা পাকস্থলীর গোলমালেই হোক সে ৪২ ফুট লম্বা দুখানা অক্টোপাসের পা বমি ক'রে দেয়। জলগৃহের মালিক ত অবাক। বিজ্ঞানীরা পা দুখানার মাপজোক হিসাবনিকাশ করে সাব্যস্ত করলেন, এ পায়ের মালিক অন্ততঃ পক্ষে ৬৬ ফুট দীর্ঘ এবং তার ওজন ৮৫,000 পাউন্ডের বেশি ছাড়া কম নয়।
অক্টোপাস ও স্কুইডের সঙ্গে স্পার্ম হোয়েলের অহি-নকুল সম্পর্ক। সুযোগ পেলেই একে অন্যকে আক্রমণ করবে এবং পরাজিত হলে তার স্থান হবে বিজয়ীর উদরপুরীতে। এ স্পার্ম হোয়েলটি এমনি কোন এক মহাসমরে বিজয়গৌরব এবং মহৎ ভোজ্য লাভ করেছিল।

* স্কুইডের কীর্তি

জীবজগৎ সম্বন্ধে যেসব বই লেখা হয়েছে তাতেও স্কুইডকে বিশ্বের সর্বাধিক মারাত্মক প্রাণী বলে উল্লেখ করা হয়। বিজ্ঞান বিষয়ক লেখক উইলিয়ম ক্রোমি তাঁর **Living World of the Sea** গ্রন্থে বলেন, স্কুইড হল পৃথিবীর বৃহত্তম, ক্ষিপ্রতম এবং ভয়ংকরতম অ-মেরুদন্ডী প্রাণী। আদিকালের অতিকায় প্রাণীদের তুলনায় স্কুইডের স্থান কোথায়? এ প্রশ্ন আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, সবচেয়ে বড় গোষ্ঠীর স্কুইডের পাশে প্রাগৈতিহাসিক যুগের ভীতি জাগানো ডাইনোসরগুলো রোগাপটকা বিড়াল বলে মনে হবে।
স্কুইড যে নরখাদক তারও প্রমাণ আছে। ১৯৪১ সালের মার্চ মাসে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় একখানা ব্রিটিশ সৈন্যবাহী জাহাজ আটলান্টিক মহাসাগরে ডুবে যায়। একজন সৈনিক জীবনরক্ষী ভেলা ধরে জলে ভাসছিল। হঠাৎ তার মনে হল কে যেন তার পা চেপে ধরেছে। তার জনা বার সঙ্গীর চোখের সামনে এক বিরাট স্কুইড আঁকড়ে পা দিয়ে তাকে জড়িয়ে ধ'রে সকলের সমবেত চিৎকার হৈ-হুল্লোড়ের মধ্যেও জলের নিচে মৃত্যুমুখে নিয়ে গেল। তার আর কোন সন্ধান মিলল না।

* জেলিফিস (**Jellyfish**)

হরিদ্বারে গঙ্গার ঘাটে সন্ধ্যায় লোকেরা শালপাতার নৌকায় ফুল প্রদীপ ভাসিয়ে দেয়। স্রোতের টানে প্রদীপগুলো চলমান আলোকপুষ্পের মত ভেসে যায়, কতক উল্টে গিয়ে নিভে যায়, কতক দূরে দীপালির আলোকমালার মত দৃষ্টিপথের বাইরে চলে যায়। সমুদ্রের বুকে এই রকম রঙিন ভেলা দেখা যায় ঢেউ-এর দোলায় দোল খেতে খেতে চলেছে। শান্ত সমুদ্রবুকে এগুলি মনে হয় ফুলের প্রদর্শনী। দেখতে যতই মনোরম হোক, এদের স্পর্শ থেকে কিন্তু সাবধান! এরা সাগর রাজার উদ্যানের এমন পারিজাত নয় যে, তুলে ঘ্রাণ নেওয়া যাবে, কোটের বুক পকেটের কাছে রাখা যাবে কিংবা খোঁপায় গুজে সৌন্দর্য বৃদ্ধি করা যবে। এরা জীবন্ত প্রাণী। হাঙ্গর অক্টোপাস স্কুইডের মত তাড়া করে শিকার ধরে না এরা, কিন্তু শিকার ধরার নতুন ফন্দি আছে। এরা প্রত্যেকে বিষের ভেলা। জলের ওপর ভেসে থাকার জন্য বেলুনের মত গোলাকার দেহ, পাতলা স্বচ্ছ আঠামত পদার্থ দিয়ে তৈরি। গ্যাস ভর্তি থাকায় ভাসে, বাতাসের সঙ্গে পালতোলা নৌকার মত চলে। পাল তুলে হাওয়া খাওয়া লক্ষ্য নয়, উদ্দেশ্য খাদ্য সংগ্রহ করা। কেমন করে?
গঙ্গা ও পদ্মানদীতে জেলেরা ছোট ছোট ডিঙি নৌকায় বসে জলের মধ্যে জাল ডুবিয়ে দিয়ে স্রোতের সঙ্গে ভেসে আসতে থাকে। জালের মধ্যে মাছ

পড়লেই যে লোকটি জালের দড়ির এক প্রান্ত হাতে নিয়ে বসে থাকে, সে তৎক্ষণাৎ টান দিয়ে জালের মুখ বন্ধ করে দেয়, জাল তুলে মাছ ধরে নেয়। আবার জাল নামিয়ে দেয় জলের মধ্যে।

জেলিফিস জলের মধ্যে এমনি জাল ঝুলিয়ে রাখে মাছ ধরার জন্য। এই জাল হল গাছের শিকড়ের মত লম্বা আঁকড়ে বাহু। কোন কোন জেলিফিসের শিকড় জাল ৩০/৪০ ফুট পর্যন্ত ঝুলে থাকে। মাঝারি আকারের জেলিফিসের জাল ১০।১১ ফুট এবং মেরুসাগর অঞ্চলের জায়ান্ট জেলিফিস চওড়া হয় ৮ ফুট তার শিকড় জলের নিচে নেমে যায় একশো ফুট পর্যন্ত।
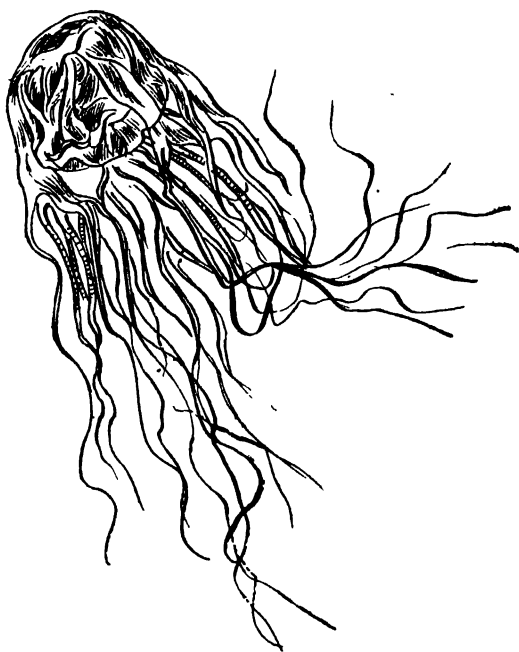
বিষাক্ত জেলিফিস
সাগর-বোলতা (Sea Wasp)

মনে হতে পারে, জলের মধ্যে শিকড় ঝুলে থাকলেই বিপদ হবে কেন? বিপদ হল, শিকড়ের গায়ে রয়েছে সূঁচের মত মিহি বিষাক্ত কাঁটা। এর খোঁচায় ছোট মাছ অবশ হয়ে পড়ে। শিকড়ের জীবন্ত মুখ তাকে খাদ্যে পরিণত করে যেমন মাকড়সা জালে-পড়া মাছিকে হুল দিয়ে অবশ করে তার রস চুষে খায়

তেমনি। মানুষের গায়ে এই কাঁটা লাগলে ফোস্কা পড়ে এবং অসাধারণ জ্বালা যন্ত্রণা সৃষ্টি করে।

ভারতমহাসাগর ও অস্ট্রেলিয়ার সাগরকুলে এক ধরণের জেলিফিস দেখা যায়, যার নাম দেওয়া হয়েছে 'সাগর বোলতা' (Sea Wasp)। এদের শিকড়-কাঁটায় এমন তীব্র বিষ যে, সাঁতার কাটার সময় কারো গায়ে লাগলে কয়েক মিনিটের মধ্যেই হৃৎপিন্ডের কাজ বন্ধ হয়ে মৃত্যু ঘটায়, এমন কি অনেক সময় আহতব্যক্তি সাঁতরে তীরে পেঁছিতেও পারে না। অথচ শান্ত সমুদ্রের নীল জলে এই জেলিফিসগুলো দেখলে মনে হবে রাশি রাশি স্থলপদ্ম জলে ভাসছে।

* পর্তুগীজ মান অব ওয়ার (**Physalia physalis**)

পর্তুগালের যুদ্ধজাহাজ নয়, ফিসালিয়া ফিসালিস, জেলিফিস, যার বেলুনের মত ফোলানো পাল দেখতে কতকটা পর্তুগীজদের আগের দিনের কাঠের জাহাজের পালের মত। এই পাল এমনভাবে বসান যাতে বাতাসে এটি ভেসে ভেসে চলে। জলের নিচে ছড়ানো রয়েছে ৪০।৫০ ফুট দীর্ঘ জাল-শিকড়। এ জালকে বলা যায় উচ্চভোল্টের বিদ্যুৎবাহী তার। মাছ ও অন্যান্য ছোট প্রাণী এর সংস্পর্শে এলে বিপদ। কিন্তু নোমিয়ুস গ্রোনোভাই নামে একজাতের ছোট মাছ আছে যারা এই বিষাক্ত শিকড়-জালের আশ্রয়ে বাস করে আত্মরক্ষা ও নিজেদের খাদ্য-সংগ্রহ করে, কারণ, তারা এই জালের বিষ থেকে অনেকটা নিরাপদ। তাদের ধরার জন্য কোন প্রাণী ফিসালিয়া ফিসালিসের শিকড়-অরণ্যের মধ্যে গেলে তারাই জেলিফিসের শিকার হয়ে পড়ে। নোমিয়ুস সেই শিকারের দেহাবশিষ্ট প্রসাদ-কণিকা পেয়ে তুষ্ট হয়।

সাগরে জেলিফিস অনেক জাতের। এদের প্রধান বৈশিষ্ট্য সাগরজলে ভেসে ভেসে চলা। ভেসে যাওয়ার জন্য মাথায় থাকে বেলুনের মত ছাতা। দরকার হলে বেলুন ছাতাটি-বন্ধ ক'রে অর্থাৎ বেলুন থেকে গ্যাস বের করে দিয়ে ধীরে ধীরে ডুবে যেতে পারে আবার বেলুন ফুলিয়ে ভেসে উঠে বাতাসে বা স্রোতের টানে ভেসে চলে। শিকড় মৃদু আন্দোলন করে নিজেরাও ধীয়ে ধীরে চলতে পারে।

জেলিফিসের বেলুনের রঙ ও গড়ন মনোহর। হাল্কা নীল, বেগুনি, গোলাপী, সবুজ। গড়নও তেমনি শিল্পকর্মের মত নিঁখুত।

'ঊর্ণাতন্তু' জেলিফিস। মাকড়সার জালের মত মিহিসুতা রঙিন ছোট ছোট বেলুন থেকে জলের মধ্যে ছড়িয়ে আছে, বেলুনগুলি জলে ভাসিয়ে-দেয়া পুজার ফুলের মত প্রায়-শান্ত সাগরবক্ষে দোলা খেয়ে খেয়ে চলেছে। দূর থেকে দেখলে মনে হবে নীল ঘাসেরবনে অজস্র মরসুমী ফুল। মানুষের সাঁতারক্ষেত্র যদি এই রকম কুসুমাস্তীর্ণ মনে হয়, সাঁতারুকে সাবধান হতে হবে। কারণ, ওগুলো

স্থলের কুসুমপুঞ্জ নয়, বিষাক্ত শিকড়-জাল ছড়ানো জেলিফিস। অস্ট্রেলিয়ার উপকূলে এরূপ পুষ্পোদ্যান দেখা দেয় মাঝে-মাঝে। তখন সন্তরণকারীরা জলে নামে না ; তারা জানে ঐ জেলিফিসের ঝাঁক শত্রুকে অতর্কিতে বিপন্ন করার মত বিষাক্ত কাঁটাযুক্ত 'সমুদ্র-মাইন'। এরা কোন এক স্থানে স্থায়ী হয়ে থাকে না।
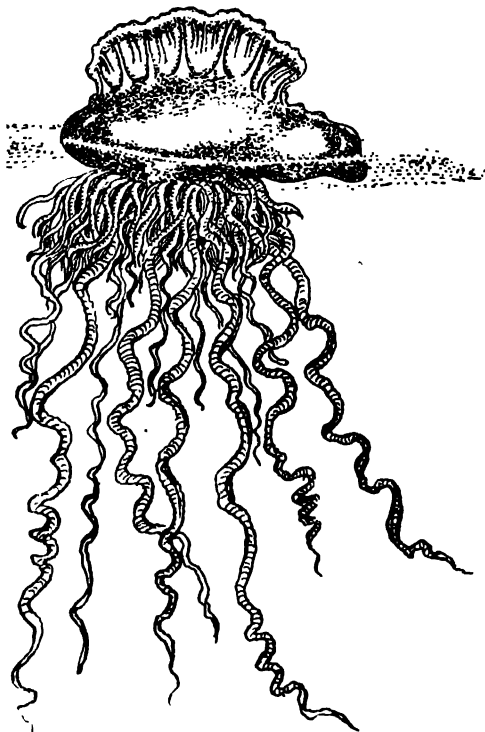
পর্তুগীজ ম্যান অব ওয়ার
ফিসালিয়া ফিসালিস জেলিফিস

ভেসে আসে, আবার অন্যত্র চলে যায়। উপকূলরক্ষীরা এদের আবির্ভাব সম্বন্ধে জনসাধারণকে সতর্ক ক'রে দিয়ে থাকে।

* তিমি (Whale)

সাগরের ভয়ংকর প্রাণীর নাম করতে প্রথমেই মনে পড়বে হাঙরের কথা। তেমনি বিরাট জীবের কথায় আসবে তিমির প্রসঙ্গ। মহাভারতে তিমি ও তিমিঙ্গিলের কথা বলা হয়েছে, তিমিঙ্গিল অর্থাৎ যারা তিমিকে পর্যন্ত গিলে ফেলতে পারে।

এছাড়া সাধারণ সাহিত্যে, উপকথায়, এমনকি ছোটদের অক্ষর পরিচয় বইতেও তিমি হাজির, যদিও জীবন্ত তিমি দেখার সৌভাগ্য খুব কম লোকেরই হয়। বিশাল আকারের প্রাণী মানুষের কৌতুহল জাগায়। আর সেই প্রাণী যদি সচরাচর দেখতে পাওয়া না যায়, তবে মানুষের কল্পনা তাকে ঘিরে নানা কাহিনী রচনা ক'রে থাকে। বাইবেল সহ অনেক রচনায় তিমির উল্লেখ আছে। কতক ভ্রমণ বিবরণীতে অদ্ভুত ঘটনার বিবরণ দেওয়া হয়েছে, যেমন—ঘুমন্ত তিমির পিঠে জাহাজ ঠেকে গেল, সেটি একটি দ্বীপ মনে করে নাবিকেরা নেমে পড়ল সেখানে, তারপর ঘুম ভাঙতেই তিমি জেগে উঠল, নাবিকেরা হুড়োহুড়ি করে জাহাজে উঠে প্রাণ বাঁচাল ; ক্রুদ্ধ তিমির আক্রমণে জাহাজ ভেঙ্গে খান-খান হয়ে গেল ইত্যাদি। কাল্পনিক বিবরণ ছাড়াও বাস্তব অভিজ্ঞতা ভিত্তি ক'রে তিমি-শিকারের রোমাঞ্চকর কাহিনী লেখা হয়েছে।

বিচিত্র স্থলচর প্রাণীর মধ্যে হাতি সবচেয়ে বড়। এরা তৃণভোজী। খাদ্য তুলে মুখে পুরে দেবার জন্য এদের শুঁড় হাতের কাজ করে, সেটি নাসিকাও বটে। নদী পার হওয়ার সময় দেখা যায়, নদী খুব বেশি গভীর না হলে, সব-খানি শরীর জলের মধ্যে ডুবিয়ে কেবল শুঁড়ের আগা জলের ওপর তুলে রেখে হাতি হেঁটে হেঁটে নদী অতিক্রম করে যেতে পারে। জলচর প্রাণীর মধ্যে তিমি বৃহত্তম। জলে বাস করার দরুণ এদের দেহ গড়ন ঠিক হাতির মতন নয়, খাদ্য-সংগ্রহ পদ্ধতিও পৃথক রকমের। কয়েক প্রকার তিমির বিবরণ থেকে এদের আকৃতি ও স্বভাবের পরিচয় পাওয়া যাবে।

* নীল তিমি (**Blue Whale**)

গভীর সমুদ্রের বাসিন্দা উষ্ণরক্ত স্তন্যপায়ী প্রাণী। পৃথিবীর যাবতীয় জীবিত প্রাণীর মধ্যে নীল তিমি বৃহত্তম। এ প্রজাতির সবচেয়ে বড় একটি স্ত্রী-তিবির দৈর্ঘ দেখা গেথে ১০৯ ফুট, ওজন ১৫০ টন। নীলতিমির গর্ভকাল প্রায় ১১
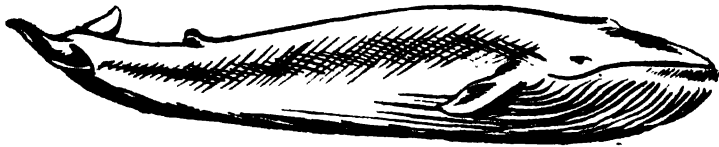
নীল তিমি (**Blue Whale**)

মাস। সদ্যপ্রসূত বাচ্চা ২৫ ফুট দীর্ঘ এবং তার ওজন প্রায় ৩ টন। পেটের তলার দিকে দুইটি স্তন থেকে তিমিশিশু মাতৃদুগ্ধ পান করে। একবার এক দুগ্ধবতী তিমি হত্যা করার পর তার স্তন থেকে ৯ মণ দুধ পাওয়া গিয়েছিল।

আকারে বিশাল হলেও নীলতিমি বড় প্রাণী শিকার করে খাদ্যসংগ্রহ করে না। তার প্রধান খাদ্য ২ ইঞ্চিমত লম্বা চিংড়ি ধরণের মাছ ইউফাসিয়া সুপারবা (euphausia Superba), যাকে বলা হয় ক্রিল (Krill)। ক্রিলভোজী তিমিরা বছরে প্রায় ৮ কোটি টন এই খাদ্য গ্রহণ করে। দক্ষিণমেরু অঞ্চলে ও প্রশান্তমহাসাগরের উত্তর অংশে যেখানে ক্রিল মেলে প্রচুর, সেখানে এই অতিকায় তিমিদের বিচরণক্ষেত্র। গায়ের রঙ গাঢ় কালচে নীল।

* ঘাতক তিমি (**Killer Whale**)

গাঢ় নীলাভ কালো, তার পাশে পৃথক পৃথক অংশ ধবধবে সাদা, ঘাতক তিমিকে দূর থেকে দেখেই চেনা যায়। অন্যান্য গোষ্ঠীর তিমি থেকে এদের পার্থক্য মুখের গড়নেও। আসলে ঘাতক তিমি বৃহত্তম ডলফিন, যেমন চতুর তেমনি ভোজনবিলাসী। চোখের ওপর অংশে ও পিছনদিকে কিছুটা স্থান সাদা; পিঠের ওপরকার পাখনার নিচে ও কোমরে পাশের দিকে অনেকখানি জায়গা
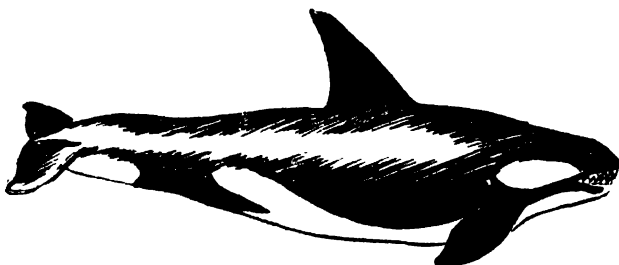
ঘাতক তিমি (**Killer Whale**)

ফ্যাকাশে সাদা, পেট বুক ধবধবে সাদা। ধারাল বড় বড় দাঁত, প্রতি চোয়ালে ১০-১২টি। প্রধান খাদ্য মাছ, জলচল পাখি ও স্তন্যপায়ী প্রাণী।
নীলতিমি সহ বেশির ভাগ তিমিই প্ল্যাংকটন ভোজী; তার সঙ্গে খাদ্যরূপে থাকে অন্যান্য ক্ষুদ্র সামুদ্রিক প্রাণী কিন্তু ঘাতক তিমি নেকড়ের মত দল বেঁধে শিকার করে। শিকার ধরতে শুধু ক্ষিপ্রতা ও দেহের শক্তি নয়, চাতুরি ও 'রাডার' যন্ত্র কাজে লাগায়। এ রাডার মানুষের তৈরি যান্ত্রিক কৌশল নয়, এদের দেহস্থিত প্রত্যঙ্গের সাহায্যে জলের মধ্যে অতি-দ্রুত শব্দ প্রেরণ ক'রে তার প্রতিধ্বনি শুনে শিকারের অবস্থান জেনে নেয়। এর ফলে এরা দূর থেকেই অন্য প্রাণীর অবস্থান জানতে পায়। এরা অনেকে একত্রিত হয়ে আক্রমণ চালিয়ে অন্য প্রজাতির বড়

তিমিকেও শিকার করে। তাছাড়া দক্ষিণমেরুতে ভাসমান বরফস্তূপের ওপর সীলমাছ দেখতে পেলে জলের তলা দিয়ে এসে বরফস্তূপ উল্টিয়ে দিয়ে সীলকে জলে ফেলে অনায়াসে ধরে ফেলে। শিকার ধরার এই কৌশলের জন্য মানুষও এদের আক্রমণে বিপন্ন হতে পারে। সাম্প্রতিক কালে মধ্য প্রশান্তমহাসাগরে কয়েকটি ইয়াট (**Yacht**-প্রমোদ ভ্রমণের হাল্কাধরণের জাহাজ) ঘাতক তিমির আক্রমণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

শুশুক ডলফিনদের মতই ঘাতক তিমি কিছুক্ষণ পর পর নিশ্বাস ফেলার জন্য জলের ওপর মাথা তোলে। এদের মাথার ওপর রয়েছে ইউ (U) আকারের নাসিকাছিদ্র, মাংসপেশী দিয়ে বন্ধ করা। জেগে উঠে নিশ্বাস ফেলার সময় নাসিকার ঢাকনা খুলে যায়, বাতাস নেবার পর আবার জলনিরোধকভাবে আটকে যায়। এর ফলে জলের মধ্যে খাবার ধ'রে গিলে ফেলতে কোন অসুবিধা হয় না। অর্থাৎ নাসিকা-নলি ও খাদ্যনলি পৃথক থাকায় খাওয়ার সময় ফুসফুসে জল ঢুকতে পারে না।

* গ্রীণল্যান্ড তিমি (**Greenland Whale**)

গ্রীণল্যান্ড তিমির দৈর্ঘ্য ৬০ ফুট, মাথাটি প্রায় ২০ ফুট। দেহের এক-তৃতীয়াংশ জুড়ে মাথা থাকার কারণ আছে নিশ্চয়ই। মুখের গড়ন অদ্ভুত। মুখটি তার বিপুল পরিমাণ খাদ্য সংগ্রহের জাল-খাঁচা স্বরূপ। ওপরের চোয়াল ধনুকের মত বাঁকানো, মুখের মধ্যে ১০।১১ ফুট লম্বা বাঁশের চটার মত বেলীন প্লেট (**baleen plate**) দাঁড়া করানো, তালু থেকে জিভ পর্যন্ত

গ্রীণল্যান্ড তিমি (**Greenland Whale**)

নামানো প্রায় ৬০৯টি প্লেট। ২০ ফুট লম্বা, ১৪ ফুট উঁচু মুখ হাঁ করে যখন এই তিমি জলের মধ্যে চলে, মনে হবে বিরাট এক মাছ ধরার খাঁচা চলমান হয়েছে। মুখ গহ্বরে ছোট মাছ (ক্রিল) ঢুকে পড়লে মুখ বন্ধ করে যখন তিমি মাথা উঁচু করে তোলে, প্লেটের ফাঁক দিয়ে জল বের হয়ে যায়, শুধু মাছ ও অন্যান্য ছোট প্রাণী থেকে যায় খাঁচা-মুখের মধ্যে। সেগুলো গিলে

ফেলে আবার মুখ খুলে জলের মধ্যে মাছ ধরার জন্য ছুটে চলা — এই হল ক্রিলভোজী তিমির খাদ্যসংগ্রহের কৌশল। স্থলের হাতি শুঁড় দিয়ে ঘাসজঙ্গল তুলে, গাছের ডাল ভেঙে তা মুখে পুরে দেয়, তিমি মাছ ধরার জন্য খাঁচা-মুখ নিয়ে সাগর চষে বেড়ায়।

গ্রীণল্যাণ্ড তিমির গায়ের রঙ কালো বা কালচে ধূসর ; নিচের চোয়ালের আগার দিকটা সাদা। উত্তরমেরুর কাছাকাছি সমুদ্রে এদের বাস।

* রাইট হোয়েল (**Right Whale**)

আকার গ্রীণল্যাণ্ড তিমির মত, বেলীন প্লেট গ্রীণল্যাণ্ড তিমির চেয়ে কম (৪৫০টি), কিন্তু তার চেয়ে লম্বা, সরু ও নমনীয়। ক্রিল খাদ্য-সংগ্রহের পদ্ধতি একই প্রকার, মুখ খুলে বড় হাঁ করে জলের মধ্যে বেগে ছুটে চলে, কিছুদূর গিয়ে মুখ উঁচু ক'রে বেলীনের ফাঁক দিয়ে জল বের ক'রে দেয়, খাবার জিনিস বাঁশের খুঁপিতে আটক মাছের মত মুখের মধ্যেই রয়ে যায়। রাইট হোয়েল আটলাণ্টিক মহাসাগরের বাসিন্দা।

* কুঁজপিঠ তিমি (**Humpback Whale**)

কুঁজো মানুষের মত পিঠ ঈষৎ বাঁকানো, তাই নাম কুঁজপিঠ। এদের সর্বাধিক দৈর্ঘ ৫০ ফুট। অন্যান্য তিমির তুলনায় এদের পাখনা দীর্ঘ, দেহের প্রায় এক
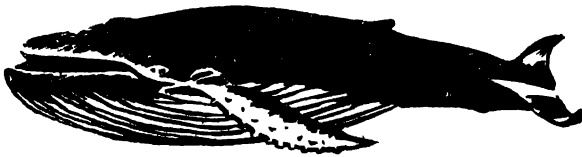
কুঁজপিঠ তিমি (**Humpback Whale**)

তৃতীয়াংশ। রঙ কালো ও সাদা। মুখের ভিতরকার ছাঁকনি বেলন কালো রঙের। বছরের বিভিন্ন ঋতুতে এরা বিভিন্ন সমুদ্রে গিয়ে উপস্থিত হয়, নিয়মিত ভ্রমণ এদের স্বভাব। স্থলভাগের কাছাকাছি সাগরেও এদের সমবেত হতে দেখা যায়। সম্প্রতি বিজ্ঞানীরা লক্ষ্য করেছেন, হাম্পব্যাকদের শুধু সমাবেশই ঘটে না, তারা গানে আনন্দ-অনুষ্ঠানে তাদের বার্ষিক মিলন উৎসব পালন করে।

* বাসন্তী জলসা

আমাদের ক্যালেণ্ডার পঞ্জিকায় দিন তারিখ উল্লেখ না থাকলেও হাম্পব্যাক (কুব্জপৃষ্ঠ) তিমিদের নিশ্চয়ই কোন তিথি পর্বের সংকেত আছে। তাই প্রতি

বছর বসন্তকালে হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জের কাছে সাগরে হাম্পব্যাকদের সমাগম ঘটে, সংখ্যায় শত শত। এটা তাদের বসন্তকালীন মিলনোৎসব, চলে কয়েক মাস ধরে। মহাসাগরের নানা অঞ্চল থেকে এরা সমাবেশে যোগ দেয়। আসন্ন-প্রসবা জননীরা আসে, এখানে তাদের শিশু জলস্থ হয় (ভূমিষ্ঠ বলা চলে না), তরুণরা সঙ্গিনী খুঁজে পায়, বিবাহ উৎসব ও মধুচন্দ্রিমা চলে, খেলাধুলো ও সংগীত বাসর অনুষ্ঠিত হয়। দেখা যাবে কেউ কেউ আরাম বিলাসে জলের ওপর শুয়ে আছে, বৈঠার মত একখানা পাখনা পতাকার মত খাড়া করে তোলা, কখনো পাখনা জলে আছড়িয়ে জল ছিটিয়ে শব্দ করে, কখনো কখনো আনন্দের আতিশয্যে বারবার শূন্যে লাফিয়ে ওঠে। পঞ্চাশ টন ওজনের বিশাল বপু জলের ভিতর থেকে ছিটকে বেরিয়ে এসে দূরে গিয়ে ঝপাস ক'রে পড়ে, জল ছিটকে ওঠে, ঢেউ ছড়িয়ে পড়ে চারদিকে। এই সময় শোনা যায় তিমিদের গান।

* জয়জয়ন্তী, না জলজয়ন্তী ?

তিমিদের কণ্ঠে শব্দের বৈচিত্র্য আছে। মিহি স্বর, তীক্ষ্ম উচ্চধ্বনি, দীর্ঘ বিলম্বিত লয়ের গুরুগম্ভীর উদারা আওয়াজ—এসবের মিশ্রণের ভিতর দিয়ে তিমিরা যেন কোন বিশেষ ভাব প্রকাশ করতে চায়। কৌতূহলী প্রকৃতি বিজ্ঞানী এদের গান রেকর্ড করেছেন, একাধিক বছরের গান তুলনা বিশ্লেষণ ক'রে এর স্বরূপ জানার চেষ্টা করেছেন। দেখা গেছে, তিমিরা গানগুলি ঘণ্টার পর ঘণ্টা একটা নির্দিষ্ট সুরের কাঠামোর মধ্যে গেয়ে থাকে। কখনো হয়ত একটি গান দশ মিনিটে সম্পূর্ণ হল। কখনও বা সেই গান চলল আধ ঘন্টা ধ'রে। একই গান পুনরাবৃত্তি ক'রে বারংবার গেয়ে চলে অবিরাম প্রায় চব্বিশ ঘন্টারও বেশি। আমাদের শীতকালীন রাতভোর গানের আসরের গায়করা তিমিদের কাছে হার মানবেন।

তিমির গানের আসর জলের নিচে কিন্তু জলের ওপর থেকেও অশরীরীর অদ্ভুত গোঙানির মত আওয়াজ শোনা যায়। বিভিন্ন বছরের গানের রেকর্ড থেকে বোঝা যায়, এক এক বছরের রাগ-রাগিণীতে পার্থক্য আছে। আবার রাগিণী এক হলেও তাতে সংযোজিত কথায় যেন পার্থক্য রয়েছে। মানুষ যেমন একই রাগ বা রাগিণী রূপায়িত করে নির্দিষ্ট সুরঝংকারে, তানে, লয়ে, অথচ তার কথা পৃথক হতে পারে, তিমিদেরও তেমনি লক্ষ্য করা গেছে। যেন ঠিক হয়েছে—এবার গাওয়া হবে জয়জয়ন্তী ; বিভিন্ন গায়ক জয়জয়ন্তী গাইলেন কিন্তু গানের কথা সবারই এক নয়, কারো হিন্দী, কারো বাংলা। বিজ্ঞানীরা

তিমিদের এই theme and variation—বিষয়বস্তু ও সুরবৈচিত্র্য লক্ষ্য ক'রে বিস্মিত হয়েছেন আর অভিভূত হয়েছেন সর্বাঙ্গ দিয়ে এ সংগীত গ্রহণ ক'রে।

* গানের আসরে হাজির

হাওয়াই সাগরে তিমিদের গানের আসরে প্রবেশ-পত্র পেতে দক্ষিণা লাগবে না, লাগবে ডুবুরির পোষাক ও কৌতুহলীর সাহস। জলের তলায় যখন তিমিদের গান চলছে তখন নৌকাতে সেখানে উপস্থিত থাকলে বোঝা যাবে, সংগীতের অনুরণন জলের ভিতর থেকে এসে জাহাজের হালে, তলদেশে মৃদু কম্পন জাগাচ্ছে। ঝকঝকে নীল জলে ডুব দিয়ে খানিক নিচে গেলে দেখা যাবে নীলকান্তমণির মত স্বচ্ছ জলে আবলুস কাঠের মত কালো, আলকাৎরা মাখানো উপুড় করা জেলে ডিঙির আকারের গায়কটি স্থির হয়ে রয়েছে, জলের ভিতর দিয়ে সংগীততরঙ্গ অনুভবযোগ্য বেতারতরঙ্গের মত চতুর্দিকে প্রসারিত হচ্ছে। শ্রোতার মনে হবে তিনি যেন বিশাল এক গির্জাগৃহে বিরাট এক অর্গানের চওড়া পাইপের মধ্যে বসে আছেন, গানের স্বরঝংকার তাঁর দেহের স্নায়ুতন্ত্রীর ভিতরকার বাতাসের সঙ্গে মিশে সর্বাঙ্গ সুরসিক্ত, সুরাবেশে অবশপ্রায় ক'রে ফেলেছে।

তিমিরা গান গায় কেন? তাদের কাছ থেকে এ প্রশ্নের উত্তর মিলবে না। তিমিদের জলবাসরে প্রবেশ ক'রে তাদের গানের বৈশিষ্ট্য জানা গেছে। জলবাহিত এই সংগীত, বিশেষ করে উদারা স্বর, দশ কুড়ি এমন কি ত্রিশ মাইল দূরে তিমিও শুনতে পায়। এই সংগীতের মাধ্যমে ফ্রান্সের ত্রবাদুর গীতিকবি বা আমাদের দেশের চারণ কবিদের মত কোন কাহিনী কি নিবেদন করা হয়? মঙ্গোপার্ক নাইগার নদীর উৎস সন্ধানে আফ্রিকার অভ্যন্তরে গিয়ে একবার নিগ্রো রমণীদের কুটিরে আশ্রয় পেয়েছিলেন। রাত্রিতে মঙ্গোপার্ক যখন বিশ্রাম করছিলেন, আশ্রয়দাত্রীরা খাদ্য তৈরি করতে করতে সমবেত কণ্ঠে একটানা সুরে গান গাইছিলেন, সে গান তখন-তখনি মুখে-মুখে রচিত এবং তার বিষয় ছিল, বাড়িঘর আত্মীয় বন্ধু প্রিয়জন ফেলে আসা অসহায় বিদেশীর প্রতি মমতার প্রকাশ।

তিমিরা যে গান গায়, তার মধ্য দিয়ে হয়ত চলে স্বগোত্রীয়দের মধ্যে সংবাদ আদানপ্রদান, শুভেচ্ছা জ্ঞাপন, প্রেমপ্রীতি নিবেদন, আগামী বর্ষের মিলনের কর্মসূচী! কে জানে?

কয়েক মাস পরে হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জের সাগর স্তব্ধ শান্ত হয়ে যায়, গায়ক সদস্যরা সব চলে গেছে বার্ষিক সম্মেলন শেষে। কয়েক সপ্তাহ পরে হাম্পব্যাকদের দেখা যায় আলাস্কার কাছে সাগরে, প্রশান্ত মহাসাগর পাড়ি দিয়ে উত্তর

আমেরিকার উত্তর-পশ্চিম উপকূলে। আর কোথাও এদের গানের আসরের খবর জানা যায়নি।

সাগরে কত রহস্য লুকিয়ে আছে! বিচিত্র সমুদ্রজীবনের বহু বিস্ময়কর দিক এখনো মানুষের বুদ্ধিগ্রাহ্য বিচার বিশ্লেষণের বাইরে রয়ে গেছে।

*** স্পার্ম তিমি (Sperm Whale)**

নীল তিমির পরই আকারে স্পার্ম তিমি অন্য সকলের চেয়ে বড়। স্ত্রী স্পার্ম তিমিরা পুরুষদের চেয়ে অনেকখানি ছোট। পুরুষ স্পার্ম তিমির দৈর্ঘ্য ৬৫ ফুট, এবং স্ত্রীর দৈর্ঘ্য ৩৫ ফুট। স্পার্ম তিমির মাথার গড়ন অদ্ভুত রকমের, মাথার দৈর্ঘ্য সারাদেহের প্রায় তিনভাগের একভাগ, উঁচু ৭ ফুট। মাথাটি দেখে মনে হয় বিরাট এক কাঠের গুঁড়ি করাত দিয়ে সমান করে কাটা ; মুখ নিচের দিকে ; সরু একফালি নিচের ঠোঁট, নিচের চোয়ালে দুই সারিতে

স্পার্ম তিমি (Sperm Whale)

৫০।৬০টি গোল সুচালো ৮ ইঞ্চি লম্বা দাঁত। ওপরের পাটিতে দাঁত নেই, মাড়িতে আছে নিচের দাঁত সোজা ফুটো। মুখ বন্ধ করলে সেখানে দাঁতগুলি খাঁজে খাঁজে বসে যায়।

স্পার্ম তিমির বিশাল পিপের মত মাথার ভিতর গলানো মোমের মত তরল পদার্থ আছে, যাকে বলে স্পার্মাসেটি। তিমি শিকারীরা স্পার্ম হত্যা করার পর এর মাথার খুলি করাত দিয়ে কেটে চৌবাচ্চার ভিতর থেকে নির্মল বর্ণহীন এই তরল বস্তু বের নেয়। শিকারীদের ভাষায় মাথাটিকে বলা হয় 'কেস' যেন তক্তা দিয়ে গোলাকার চোঙের মত বাসানো। প্রতিটি কেসের মধ্যে পাওয়া যায় কমপক্ষে ১৫ পিপে স্পার্মাসেটি তেল যার ওজন হবে এক টন। ঠাণ্ডা লাগলে স্পার্মাসেটি শক্ত মোমে পরিণত হয়। আগের দিনে স্পার্মাসেটি দিয়ে রাজরাজড়াদের প্রাসাদে আলো দেবার উৎকৃষ্ট মোমবাতি তৈরি করা হত। এখন সূক্ষ্ম দামী কলকব্জা ও যন্ত্রপাতিতে ব্যবহারের জন্য স্পার্মাসেটির চাহিদা।

স্পার্ম তিমিদের দেহ থেকে আর একটি কাজের জিনিস মেলে। এদের পাকস্থলী ও ক্ষুদ্র অন্ত্রের ভিতর 'অ্যাম্বারগ্রিস' নামে একটি পদার্থ পাওয়া যায়, যা

গন্ধসার (সেণ্ট) ও ঔষধ প্রস্তুত করতে কাজে লাগে। বৈজ্ঞানিকদের ধারণা স্কুইড ও রে প্রভৃতি খাওয়ার ফলে এদের ধারালো ঠোঁট তিমির পরিপাকযন্ত্রে ক্ষতির সৃষ্টি করলে সেখানে যে রসক্ষরণ হতে থাকে, তাই অ্যাম্বারগ্রিস। নিহত স্পার্মের দেহাভ্যন্তরে পাওয়া যায়, অনেক সময় সাগরজলে এই পদার্থ ভাসতে দেখা যায়। গলিত তিমিদেহ থেকে জমাট তেল বড় কর্কের মত ঢেউ-এর দোলায় ভেসে চলে।

তিমিদের মধ্যে স্পার্মতিমির মত ভয়ংকর দাঁত আর কারো নেই, এমন অদ্ভুত রেল-ইঞ্জিনের মত মাথাও নেই অন্য কারো। এরা দারুণ হিংস্র এবং প্রচণ্ড যোদ্ধা। এদের প্রধান খাদ্য স্কুইড ও অক্টোপাস। স্কুইডের আকারও দৈত্য সদৃশ। তাই দানব-স্কুইডের সঙ্গে স্পার্মের যুদ্ধ সাগরে তোলপাড়কাণ্ড সৃষ্টি করে। নিহত স্পার্মতিমির দেহে, বিশেষ করে বৃক্ষকাণ্ডের মত মাথায় স্কুইডের মরণ কামড়ের চিহ্ন দেখা যায়। স্কুইডের মুখের দাগ ও শোষকবাহুর ক্ষত দেখে জীববিজ্ঞানী তাদের দেহের আকার পরিমাপ করতে পারেন।

স্পার্ম তিমি শুধু সমুদ্রের ওপর-স্তরেই শিকার করে না, খাদ্যের সন্ধানে অনেক গভীরেও চলে যায়। একটি স্পার্ম তিমি পেরুর উপকূল থেকে কিছুদূরে ৩,৭২০ ফুট নিচে সাগরতলদেশে স্থাপিত তারে আটকে পড়েছিল। সমুদ্রতল বিচরণকারী স্কুইডের সন্ধানে সেটি সমুদ্রতলে চলে গিয়েছিল। অন্য একটি তিমিকে হেলিকপটার থেকে সন্ধান করা হচ্ছিল। ডুব দিয়ে সেটি প্রায় সাড়ে দশ হাজার ফুট নিচে চলে যায় এবং ঘন্টা দুই জলের তলায় থাকে। নিশ্বাস ফেলার জন্য ওপরে ভেসে উঠলে তাকে হত্যা করা হয়, তার পেটের ভিতর পাওয়া যায় সদ্য-খাওয়া সমুদ্রতলচারী দুইটি হাঙ্গরের দেহ।

* তিমি শিকার

তিমির মাংস, চর্বি ও স্পার্মাসেটির জন্য তিমি শিকার কতক দেশের লাভজনক ব্যবসাতে পরিণত হয়েছে। প্রাচীনকাল থেকেই মানুষ তিমি শিকারে উদ্যোগ দেখিয়েছে। নবপ্রস্তর যুগের লোকেরা ছোট তিমি ও ডলফিন শিকার করত। এস্কিমো ও উত্তর আমেরিকার আদিবাসী ভারতীয়রা সীলমাছের হাড় ও বল্গাহরিণের শিং দিয়ে তৈরি বল্লমের সাহায্যে শিকার করেছে। সাগরতীরবর্তী দেশের লোকেরা, বিশেষ করে পর্তুগীজ মৎস্যশিকারীরা কাঠের নৌকাতে সমুদ্রে গিয়ে হার্পুন দিয়ে শিকার করত। এখন পর্যন্ত তারা এজোরিস দ্বীপপুঞ্জের কাছাকাছি সাগরে প্রাচীন পদ্ধতিতেই ফাঁকা নৌকায় হাতে-ছোঁড়া-বল্লম দিয়ে তিমি শিকার করে। এতে যথেষ্ট বিপদের সম্ভাবনা আছে। কখনও কখনও আহত ক্রুদ্ধ তিমি শিকারীদের আক্রমণ ক'রে নৌকা চূর্ণ-বিচূর্ণ ক'রে ফেলেছে।

আধুনিক কালে তিমি শিকারে হার্পুন-কামান ব্যবহার করা হয়। গোলার মধ্যে থাকে বিস্ফোরক। দ্রুতগামী স্পীডবোটের সামনের দিকের যন্ত্র থেকে বল্লম লাগানো কামানের গোলা তিমির ওপর নিক্ষেপ করা হয়। বল্লম তার দেহে বিঁধে পড়লে ছোট বিস্ফোরণ ঘটে। তাতে তিমি অনেকটা কাবু হয়ে যায়। আহত তিমি কিছুক্ষণ ছুটাছুটি করে কিন্তু বল্লমের সঙ্গে যুক্ত দড়িতে আটক থাকার দরুণ ফসকে পালাতে পারে না, তবে জাহাজ টেনে নিয়ে যায় অনেকদূর পর্যন্ত। দুর্বল হয়ে পড়লে তাকে গুলি করা হয়।

স্পীডবোট বা ছোট স্টিমারে বিরাট তিমি তুলে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয় না। শিকার করার জন্য দ্রুতগামী স্টিমার এবং সন্ধান করার জন্য হেলিকপটার বা বিমান ছাড়া তিমি সংগ্রহ করার জন্য থাকে কারখানা ধরণের বড় জাহাজ যার খোলের মধ্যে তিমি ঢুকিয়ে নেওয়া যায় এবং জাহাজের ডেকে তিমির চামড়া খুলে ব্লাবার (blubber) বা পুরু চর্বিস্তর তুলে নেওয়ার ব্যবস্থা থাকে।

নিহত তিমি যাতে জলে ডুবে না যায় সেজন্য ফুটবল পাম্প করার মত তিমির ফুসফুসের মধ্যে হাওয়া ঢুকিয়ে ভাসিয়ে রাখার ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু ভেসে থাকলেই ত হবে না ; বাতাসে, স্রোতের টানে এদিক-ওদিক চলে যেতে পারে। তাই দূর থেকে যাতে নজরে পড়ে সেজন্য একটা নিশান তিমির পিঠে পুতে রাখা হয়। রাত্রি হয়ে গেলে, কুয়াশা থাকলে নিশান চোখে নাও পড়তে পারে, আবার ঝড়বাতাসে নিশানের খুঁটি ভেঙেও যেতে পারে। তাই ভাসমান তিমির সঙ্গে আলোর বয়া (bouy) লাগিয়ে দেবার ব্যবস্থা হয়েছে। আজকাল আরও উন্নত উপায় খাটানো হয়। তিমির দেহের সঙ্গে এমন এক ইলেকট্রনিক যন্ত্র লাগিয়ে দেওয়া হয় যা সংকেত পাঠিয়ে কারখানা জাহাজের লোকেদের জানিয়ে দেয় ওটি কোথায় রয়েছে।

মেরু অঞ্চলের শীতল জলে তিমির সংখ্যা বেশি, বিশেষ করে দক্ষিণমেরু অঞ্চলে। সেখানে তিমি ধরে চর্বি বের করে নেবার জন্য কারখানা-জাহাজ নিয়ে যাওয়া হয়। এক একখানা কারখানা জাহাজের সঙ্গে থাকে ছোট ছোট দ্রুতগামী হার্পুন-কামানওয়ালা তিমি ধরা জাহাজ। তিমির সন্ধানে আজকাল যে হেলিকপটার ব্যবহার করা হয়, তা সাগরের ওপর চক্কোর দিয়ে ঘুরে ঘুরে তিমি দেখতে পেলে বেতারে শিকারী জাহাজকে জানিয়ে দেয়। শিকারীরা ছুটে আসে নির্দিষ্ট জায়গায়। শুধু তাই নয়, জলের মধ্যে এক রকম যন্ত্র নামিয়ে দিয়ে এমন শব্দতরঙ্গ ছড়িয়ে দেওয়া হয় যাতে তিমিরা ভয় পেয়ে ছুটাছুটি করে এবং তার ফলে হয়রান হয়ে ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলতে জলের ওপরে ভেসে ওঠে। তিমির নিশ্বাস মানেই জলকণার ফোয়ারা, সহজেই যা মানুষের চোখে পড়ে।

* তিমির নিশ্বাস

মাছ ফুলকো কানকোর সাহায্যে জলের ভিতর থেকে অক্সিজেন নিতে পারে, তাই নিশ্বাস ফেলার জন্যে তাদের জলের ওপর ভেসে উঠতে হয় না। হাঙ্গরও এমনি করে অক্সিজেন পায় কিন্তু তার ফুলকোর মধ্যে জল চালিয়ে দেবার জন্য কানকোর মত অংশ না থাকায় তাকে ফুলকোর ওপর দিয়ে জল প্রবাহিত করার জন্য অবিরত চলাফেরা করতে হয়। কিন্তু তিমির নিশ্বাস নেবার যন্ত্র সম্পূর্ণ আলাদা রকমের। তিমির নাকের ফুটো তার মাথার ওপর। একবারে অনেকখানি বাতাস টেনে নিয়ে তিমি ডুবে শিকার ধরে। জলের নিচে থাকতে পারে একটানা ৪৫ মিনিট পর্যন্ত। কখনো কখনো দেখা গেছে স্পার্মতিমি একবার ডুব দিয়ে ২ ঘণ্টা জলের নিচে থাকতে পারে। তার মাথার ওপরকার নাকের ছিদ্র মাংসপেশী দিয়ে এমনভাবে আটকানো যে, তাতে জল ঢোকার কোন উপায় নেই। জলের ওপর ভেসে উঠে অনেকক্ষণকার বদ্ধ গরম নিশ্বাস যখন বেগে ছেড়ে দেয়, তখন ঐ বাতাস ওপরের দিকে হুস্‌হুস্‌ করে ওঠে। বাইরের ঠাণ্ডা বাতাসের সংস্পর্শে এসে গরম নিশ্বাস কুয়াশার মত ছোট ছোট জলকণায় পরিণত হয়। মনে হয় জলের ফোয়ারা। ঐ জলকণার ওপর সূর্যকিরণ পড়ে রামধনুর সৃষ্টি করে।

মাছ কিন্তু মনে হয় না

* উড়ুক্কু মাছ (Exocoetus volitans)

হঠাৎ দেখা গেল সমুদ্রের ঢেউ-এর ভিতর থেকে এক ঝাঁক পাখি আকাশে উড়ে উঠল, তাদের ডানায় শব্দ নেই, কণ্ঠেও নেই গান। পাখি মনে হলেও এরা পাখি নয়, উড়ুক্কু মাছ (Flying fish)। এদের সামনের পাখনা দুটি দীর্ঘ হয়ে ডানার মত হয়েছে। জলের মধ্যে চলার সময় তা দাঁড়ের কাজ করে। আত্মরক্ষার তাগিদে শত্রুর আক্রমণ থেকে রক্ষা পাবার জন্য ছুটে চলতে চলতে এরা অকস্মাৎ জল থেকে ছিটকে শূন্যে উঠে একশো গজ পর্যন্ত হাওয়ায় ভেসে চলতে পারে। ডানা এদের পাখির ডানার মত কাজ করে না, বরং বলা যায় প্যারাসুট। বেগে শূন্যে উঠে পাখনা-ডানা ছড়িয়ে দিয়ে গ্লাইড ক'রে চলে, আবার ঝুপ ক'রে জলে নেমে পড়ে। উড়ুক্কু মাছের প্রধান শত্রু তরোয়াল মাছ। এদের তীব্রগতিতে আক্রমণ থেকে বাঁচার জন্য উড়ুক্কুমাছ শূন্যে উঠে ধাওয়াকারীকে ধোঁকা দেয়। উড়ুক্কুমাছ ঝাঁক ধরে চলে। জলের মধ্যে এদের রঙ দেখতে সবুজাভ-নীল।

ডানা-পাখনা হালকা বেগুনি। তারা যখন শূন্যে উড়েওঠে, রঙ দেখা যায় অন্যে রকম। তখন তাদের দেখতে কালচে নীল, ডানা সোনালি-হলুদ, গায়ের আঁশ

উড়ুক্কু মাছ ৬ ইঞ্চি
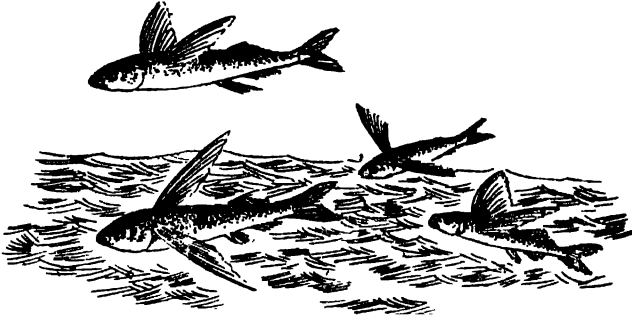
সূর্যকিরণে রুপার মত চিক চিক করে। সাগরপ্রাণীদের জীবনযুদ্ধ চলেছে সদাই। জলের মধ্যে থাকার সময় উড়ুক্কুদের তাড়া করে ফেরে বড় মাছ, স্কুইড, তরোয়ালমাছ প্রভৃতি ; শূন্যে উড়ে উঠলে ওদের ধরার জন্য সামুদ্রিক পাখিদের মধ্যে সাড়া পড়ে যায়।

* সান-ফিস (Sun fiish, Mola)

কোন প্রাণীর যদি সারা দেহ বাদ দিয়ে কেবল মাথাটি চলাফেরা করে বেড়ায়, দেখতে কেমন হবে? পৌরাণিক কাহিনীতে আছে দৈত্য রাহু লুকিয়ে অমৃত খেতে শুরু করলে দেবতারা ভীত হয়ে পড়েন। সর্বনাশ! দৈত্য তাহলে তো অমর হবে, তখন তার দাপটে দেবতাদের কী উপায় হবে? ভগবান বিষ্ণু সুদর্শন চক্র দিয়ে রাহুর মাথা কেটে ফেললেন। অমৃত তখনও পেটে পেঁছায়নি। তাই কেবল মাথাটি অমর হয়ে রইল। সমুদ্রের সান-ফিস কতকটা এই মাথাসর্বস্ব রাহুর মত। ১২।১৪ ফুট উঁচু, ১২।১৪ ফুট লম্বা, নীলাভ সবুজ রঙ। কান্‌কোর পাশে ছোট পাখনা, একটি বড় পাখনা, পতাকার মত পিঠের ওপর দাঁড় করানো, ঠিক তার সোজা আর একটি ঐ রকম বড় পাখনা জলের মধ্যে হালের মত নিচের দিকে নামানো। চেহারা দেখে মনে হবে, কোন দৈত্যাকার মাছের মুড়োটা কেটে তার সঙ্গে সামান্য কয়েকখণ্ড লেজ পাখনা জুড়ে জলে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। সোজা হয়ে ধীরে ধীরে চলে। ওজন এক টনের বেশি কিন্তু মানুষের পক্ষে এ মাছ অখাদ্য। কারণ, চামড়ার নিচে ২।৩ ইঞ্চি পুরু কার্টিলেজ (কোমল অস্থি) দিয়ে গঠিত। কিছুদিন আগে আমেরিকার উপকূলে এক লঞ্চের সঙ্গে ধাক্কা লেগেছিল এক সান-ফিসের। সেটির উচ্চতা ছিল ১৪ ফুট।
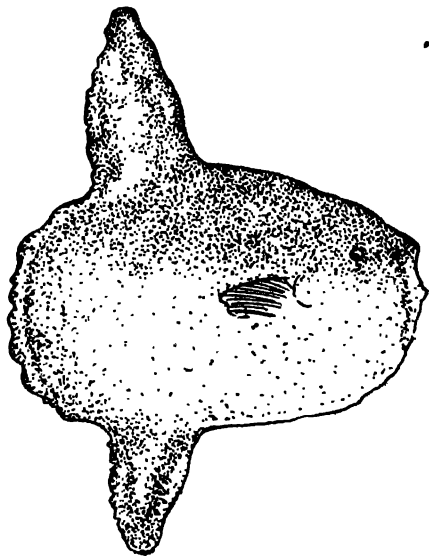
সান-ফিস (sun fish) ১২-১৪ ফুট

* সাগর-অশ্ব (Sea horse Hippocampus erectus)

সাগর ঘোড়া কোন চতুষ্পদ প্রাণী নয়, সমুদ্রের পাইপ-ফিস, দেখতে অদ্ভুদ। মুখটা দেখে মনে হবে, ঘোড়ার বাচ্চা। সর্বাঙ্গ শক্ত বর্ম-খোলসে ঢাকা, যেন মধ্যযুগের নাইটদের যুদ্ধের ঘোড়া। আসলে ঘোড়ামুখো মাছ। সাগর-ঘোড়া ১ ইঞ্চি থেকে ১ ফুট পর্যন্ত লম্বা হয়। লম্বা টিউবের মত মুখ, তার প্রান্তের গড়ন খাদ্য চুষে নেবার জন্য কাঁচের ড্রপারের মত। এরা নিরীহ প্রাণী। ক্ষুদ্র চিংড়ি বা অন্য মিহি জীব ও পদার্থ এদের খাদ্য। গা দুলিয়ে দুলিয়ে জলের মধ্যে চলে। কখনো সোজা দাঁড়িয়ে পিঠের ওপরকার ছোট পাখনা নেড়ে চলাফেরা করে। মাথা খাড়া রেখে যেমন চলে, শীর্ষাসন করার মত মাথা সোজা নিচের দিকে রেখেও চলতে এদের কোন অসুবিধা নেই। অনেক সময় দেখা যায়, আট-দশটা ঘোড়ামুখো মাছ একসঙ্গে লেজ জড়াজড়ি ক'রে সবাই একসঙ্গে ভেসে রয়েছে। ওদের মধ্যে এমন প্রীতি যে, সব সময়েই দল ধরে লেজ ধরাধরি করে থাকতে ভালবাসে।

পুরুষ ঘোড়ার পেটের ওপর আছে একটা থলের মত পকেট। স্ত্রী-মাছ তার ডিম ঐ পকেটের মধ্যে রেখে দিলে পুরুষ সেগুলো বাচ্চা বের না হওয়া পর্যন্ত বয়ে নিয়ে বেড়ায়। ডিম ফুটলেও বাচ্চারা সঙ্গে সঙ্গে বাবার আশ্রয় ছেড়ে চলে

যায় না। একটু বড় এবং শক্ত সমর্থ না হওয়া পর্যন্ত তারা থলির মধ্যে চুপ করে বসে থাকে। তারপর গায়ে জোর হলে বাচ্চারা আরামের কুঠরি থেকে বেরিয়ে নিজেরা চলাফেলা করে কিন্তু পিতার দৃষ্টির বাইরে বেশীদূর যায় না। এরা
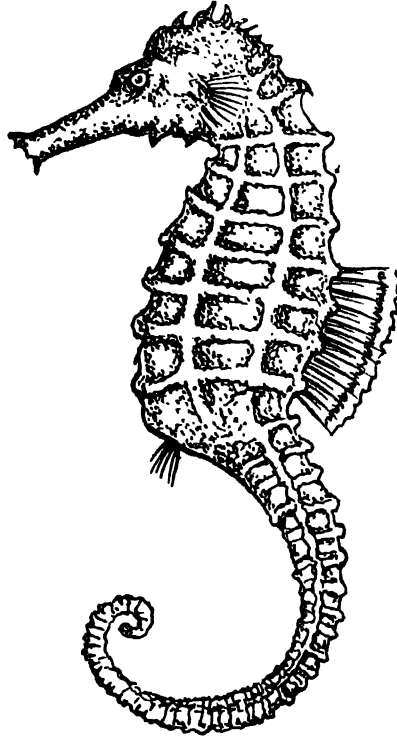
সাগর-অশ্ব (Sea horse-Hippocampus erectus)

রীতিমত ভীতু, অন্য কোন কিছু দেখে ভয় পেলে তিড়বিড়'করতে করতে এসে বাপের পকেটে আশ্রয় নেয় ঠিক ক্যাঙ্গারুশাবক যেমন ভয়ের কিছু দেখলে ছুটে এসে তার মায়ের পেটের নিচে থলিতে লুকিয়ে মুখ বের করে চেয়ে থাকে।

সাগর-ঘোড়া উষ্ণ সাগর-অঞ্চলের বাসিন্দা। এদের প্রায় ৫০ প্রজাতি, আকারেও কমবেশি আছে। এক-দুই ইঞ্চি থেকে প্রায় ১ ফুট পর্যন্ত লম্বা হয়। সাগর-ঘোড়ার দেহ স্থূল, মনে হবে শুকনো করে রাখা বিচিত্র বস্তু (curiuo)। অনেক সময় এদের কাচের মাছঘরে (aquarium) রাখা হয়। এই অদ্ভুতদর্শন

শান্ত প্রাণী শিল্পীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। চিত্রে ভাস্কর্যে এদের অঙ্গগঠনের রূপায়ণ দেখা যায়।

* বহুরূপী মাছ (**Flat fish-Bothus lunatus**)

জগতে বিচিত্র রকমের প্রাণী, বিচিত্র রকম তাদের খাদ্যসংগ্রহ ও জীবনধারণের পদ্ধতি। খাবার যোগাড় করার ব্যাপারে তাদের প্রত্যেকেরই এমন কিছু ক্ষমতা আছে যা দিয়ে তারা অত্যাবশ্যক কাজটি সমাধা করে। বৃহৎ প্রাণীদের আছে গায়ের জোর, দাঁতের জোর; কতকের আছে যান্ত্রিক কৌশল, কতক আশ্রয়
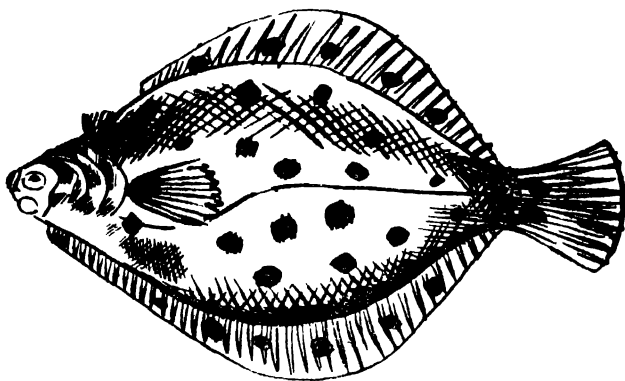
বহুরূপী মাছ (**Flat-fish**)

নিয়েছে ছদ্মবেশের। এ ছদ্মবেশ এমন যে, শত্রুরা তাদের চিনতে পারে না, কাজেই তারা নিরাপদ; যারা খাদ্য, তারাও চিনতে পারে না, কাজেই আপনা থেকেই মুখের কাছে আসে। এইরূপ বহুরূপীর ছদ্মবেশ ধরে এক জায়গায় শুয়ে থেকেই খাদ্য পাওয়ার যে কৌশল আয়ত্ত করেছে, ফ্ল্যাটফিস তাতে দারুণ মুন্সীয়ানার পরিচয় দিয়েছে।

যাবতীয় মাছের মধ্যে ফ্ল্যাটফিসের অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য হ'ল এর চোখ। দুটি চোখই একপাশে, কোন প্রজাতির ডানপাশে, কোন প্রজাতির বাঁ পাশে। জন্ম থেকেই কিন্তু চোখ এক দিকে থাকে না। বয়স বাড়ার সঙ্গে চোখ একপাশ থেকে মাথার অন্য পাশে ঘুরে যেতে থাকে। ডিম ফুটে ফ্ল্যাটফিসের জন্ম হয় সমুদ্রের ওপর-স্তরে। তখন এর চেহারা অনেকটা ব্যাঙাচির মত, দুপাশেই চোখ। ক্রমে যত বড় হতে থাকে এর চোখ সরতে থাকে, মাছ ততই কাৎ হয়ে চলতে অভ্যস্ত হয়। অবশেষে দুটি চোখই যখন মাথার একপাশে এসে পৌঁছে তখন এ সমুদ্রের তলায়

মাটি পাথরের মধ্যে নিজের শয়ন স্থানটি ঠিক ক'রে নেয়। সেই স্থান দেখে নিয়ে কয়েক মিনিটের মধ্যেই নিজদেহের রঙ ও নকশায় এমন পরিবর্তন ঘটায় যে, সেখানে যে একটি জীবন্ত প্রাণী শুয়ে রয়েছে তা বোঝবার জো থাকে না।

ফ্ল্যাটফিসকে কাচের মাছঘরে বিভিন্ন নকশা-প্যাটানের মেঝেতে রেখে পরীক্ষা করে দেখা গেছে, স্থানটি দেখে নিয়ে কয়েক মিনিটের মধ্যেই নিজের দেহেও তেমনি প্যাটার্ণ ফুটিয়ে তোলে। চোখ একপাশে থাকলেও দেখার অসুবিধে হয় না। চোখ কিছুটা উঁচু থাকার ফলে তা ঘুরিয়ে সে এদিক-ওদিক দেখতে পায়, দুই চোখ দিয়ে একই সঙ্গে দুইদিকেও দৃষ্টিপাত করতে পারে। এর যে দিকটা মাটির ওপর থাকে, তার রঙ ফ্যাকাশে সাদা।

শামুক, ঝিনুক, ছোট মাছ ও অন্যান্য ক্ষুদ্র প্রাণী এদের খাদ্য। এদের অবস্থান বুঝতে না পেরে ছোট প্রাণীরা মুখের কাছে এসে পড়লে সদা-সজাগ চোখ দুটির লক্ষ্য ও মুখের কাঁচিকল থেকে তারা রেহাই পায় না। বেশির ভাগ ফ্ল্যাটফিস আকারে একফুট লম্বা হয়; আটলাণ্টিকের একজাতের ফ্ল্যাটফিস ১০ ফুট পর্যন্ত লম্বা ও ওজনে ৫00 পাউণ্ডের বেশি হয়ে থাকে।

* দীপালিকা মাছ

গভীর সমুদ্রে যেখানে সূর্যকিরণ পেঁছায় না, সেখানে নেমে গেলে চোখে পড়বে চলমান দীপালিকার আলো। এগুলো পৃথক করে কেউ জ্বালায়নি, মাছের গা থেকে বিচ্ছুরিত ফসফরাস আলো, উত্তাপবিহীন কিন্তু দূর থেকেও চোখে পড়ে।

দীপাবলীর সন্ধ্যায় আমরা যেমন আলোকমালায় বাড়ি সাজাই মাছেদের আলো বিশেষ উৎসব পালনের জন্য নয়, প্রতিদিনকার ভোজন উৎসব পালনের জন্য। আলো দেখে ছোট মাছ কাছে এলে খাদ্যবস্তুটি মুখের কাছেই পাওয়া গেল।

পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে যেমন পরিবেশে যে প্রাণী রয়েছে, তারা সেস্থানের সঙ্গে সামঞ্জস্য ক'রে নিয়েছে, তাদের অঙ্গ-প্রতঙ্গের বৈচিত্র্য বিচিত্র পরিবেশের চাহিদা মেটাতেই গঠিত হয়েছে। সমগ্র জীবজগতে যে একটা অব্যক্ত অদৃশ্য শক্তি নিরন্তর কার্যরত রয়েছে তাতে কোন সংশয় নেই। আমরা বলি, প্রকৃতি প্রাণীকে জীবন-ধারণে সক্ষম করার জন্য তার অঙ্গ-উপাঙ্গের পরিবর্তন ঘটায়, আত্মরক্ষার জন্য নানা কৌশল গ্রহণ করায়, খাদ্যসংগ্রহের জন্য নানা হাতিয়ারে সজ্জিত করে। বংশবিস্তারের মাধ্যমে প্রজাতিকে 'অমরত্ব' দিতে এর যত্নের অন্ত নেই তার। বিস্ময়কর প্রাণের এই সম্প্রসারণের প্রয়াস।
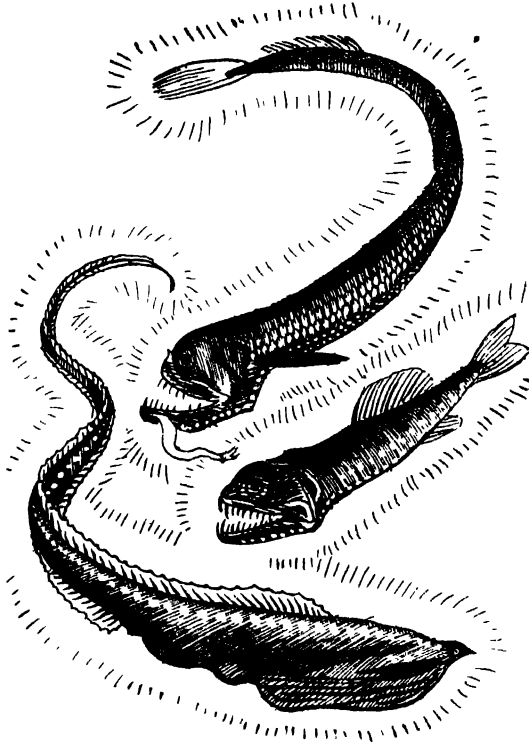
দীপালিকা মাছ

* গভীর সমুদ্রের ছিপ-শিকারী মাছ (Deep sea Angler fish, Linophryne algibarbata)

সমুদ্রের গভীরে সূর্যালোক বিহীন চিরতমসার রাজ্যে ২২৫০ ফুট বা তারও বেশি নিচে যেসব মাছ বাস করে, তারা নিজদেহে আলো জ্বালানোর কৌশল আয়ত্ত করেছে। তাদের দেহ এমন কোষ দিয়ে গঠিত হয়েছে যা কিনা উজ্জ্বল আলো উৎপাদক রাসায়নিক পদার্থ সৃষ্টি করতে পারে। অপর কতক মাছ তাদের বিশেষ অঙ্গে আলোক-প্রদায়ী ব্যাক্টিরিয়া বহন করে। এগুলির ওপর ত্বকের ঢাকনি থাকে। মাছ ইচ্ছামত একবার ঢাকনি খোলে, তখন আলো দেখা যায়, আর ত্বক-পর্দা টেনে নামিয়ে দিলেই আলো অদৃশ্য হয়। চোখের পাতার পলক ফেলার মত মাছ আলো আধারি 'চোখ মিট মিট করতে পারে। আলোর সংকেত মাছেদের স্বগোষ্ঠীর সঙ্গে বার্তা বিনিময় বা মিলনের জন্য

আহ্বান প্রচারে ব্যবহার হওয়া সম্ভব। খাদ্য সংগ্রহের ব্যাপারে এই আলো বঁড়শির টোপের কাজ করে। কয়েক প্রজাতির মাছের পিঠের পাখনা দীর্ঘ হয়ে মাথার ওপর পর্যন্ত যায়, রাস্তার আলো দেবার বাতিখুঁটির (**light post**), মত সামনের দিকে গিয়ে ঝুলে থাকে। এর এক প্রান্তে উজ্জ্বল সবুজ আলোর বাল্ব। মাছটি এই স্নিগ্ধ মশাল নিয়ে ধীরে ধীরে চলাফেরা করে, এর রোশ্‌নাই দেখানোই যেন উদ্দেশ্য। কিন্তু আসল মতলব অন্য রকম। এই আলো দেখতে, তারিফ করতে ছোটরা আসে। আলোর মালিক তখন তার বিরাট ফাঁক-করা মুখখানা বন্ধ করে দিয়ে ঢোক গিললেই খাদ্য পেটের অন্ধকার পুরীতে চলে গেল। আলোর দর্শনার্থীর অন্ধকুপ নির্বাসন, সেখান থেকে তাকে আর ফিরে আসতে হবে না।

গভীর সমুদ্রের ছিপ-শিকারী মাছ

* গভীর সমুদ্রের জীবন

সমুদ্রজলের স্তর অনুসারে প্রাণীদের জীবন যাত্রায় তারতম্য ঘটে। সূর্যের সঙ্গে জীবনমাত্রেরই স্রষ্টা-সৃষ্টি সম্পর্ক। প্রাণীদের খাদ্য উৎপাদনের প্রধান উৎস সূর্যকিরণ। সমুদ্রের ওপর স্তরে এই খাদ্যের প্রাচুর্য। তাই বহুবিধ জীবের লীলাক্ষেত্র এটি। ওপর-নিচ স্রোতের কল্যাণে প্রাণীদের খাদ্যবস্তু ওপর-স্তর থেকে নিচের জল-স্তরেও চলে যায়। তাই সকল স্তরেই জীবন সম্ভবপর হয়েছে। তবে জলের ওপর, মধ্য ও নীচের স্তরে আলো ও জলের চাপের পার্থক্যের জন্য প্রাণীদের দৈহিক গঠনে পরিবর্তন প্রয়োজন হয়েছে।

সমুদ্রপৃষ্ঠের ১00 ফ্যাদম নিচের মাছেদের দেহের পরিবর্তন চোখে পড়ার মত। নিচের জলস্তরের জীবদের তিনটি বিষয়ের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে হয়— এক, জলের প্রচণ্ড চাপ সহ্য করে চলাফেরার ক্ষমতা চাই। প্রকৃতি কৌশলে এই ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। গভীর সমুদ্রের মাছেদের দেহ জলের পক্ষে এমন প্রবেশ্য (**Permeable**) যে, জলের চাপ তাদের ওপর বিশেষ পড়ে না ;

স্বাভাবিক ভাবেই তারা বিচরণ করে। দুই—সূর্যকিরণের অভাবে জল অত্যন্ত শীতল। এখানকার বাসিন্দারা এরূপ শীতলতায় অভ্যস্ত। এই শীতল পরিবেশ একভাবে তাদের রক্ষকরূপে কাজ করে। উষ্ণ ও নাতিশীতোষ্ণ স্তরের প্রাণীরা শীতল স্তরে যায় না, কাজেই গভীর স্তরের প্রাণী আক্রমণকারীর হাত এড়িয়ে চলার সুযোগ পেয়েছে। জলের সকল স্তরে চলাচলের বাধা না থাকলে নিচের প্রাণীরা ওপরের শত্রুদের আক্রমণের শিকার হত। তিন—অন্ধকারে চলা-ফেরার অভ্যাস। অন্ধকারে সঙ্গীদের সঙ্গলাভ ও খাদ্যসংগ্রহের জন্য শত্রু-মিত্র চেনা দরকার, এজন্য আলো চাই। মাছেদের নিজ দেহে ফসফরাস-আলো উৎপন্ন হওয়ায় অন্ধকারের অসুবিধা দূর হয়েছে। কতক মাছ মাথার ওপর ও মুখের নিচে আলোর গুচ্ছ ঝুলিয়ে দিয়ে ধীরে ধীরে চলাফেরা করে, মনে হয় আঁধার রাতে কোন লোক বুঝি লণ্ঠন হাতে হারানো জিনিস খুঁজে খুঁজে বেড়াচ্ছে।

* সমুদ্রের সাপ

সাপের প্রতি মানুষের স্বাভাবিক ভীতি আছে। বিষধর হোক বা না হোক,

সমুদ্রের সাপ

হঠাৎ সাপের সামনে পড়লে আত্মরক্ষার প্রবৃত্তি থেকে মানুষ পিছিয়ে আসার আবেগ বোধ করে। তার আকৃতি, অদ্ভুতভাবে এঁকেবেঁকে চলা এবং তার ভয়ংকরতা সম্পর্কে নানা কাহিনী এই জীবটির প্রতি সাধারণের মনে বিরূপতা সৃষ্টি করেছে।

ডাঙার মত সাগরেও সাপ স্থায়ী বাসিন্দা হয়েছে। তবে মাছের মত পাখনা বা জলের ভিতর থেকে অক্সিজেন ছেঁকে নেবার জন্য কানকোর ব্যবস্থা নেই। স্থলে যেমন এঁকেবেঁকে চলে, জলেও সাপের গতি তেমনি। তার চলায় বেগ আনার জন্য লেজের আগার দিকটা চ্যাপ্টা বৈঠার মত হয়েছে যার ফলে সে দ্রুত এগোতে পিছোতে পারে। তাছাড়া গায়ের আঁশ অনেকটা হালকা হওয়ায় শরীর হয়েছে মসৃণ। শ্বাস নেবার জন্য সাপকে জলের ওপরে উঠতে হয় কিন্তু একটিমাত্র ফুসফুস প্রায় সারা দেহের সমান দীর্ঘ, তাই একবার শ্বাস নিয়ে কয়েক ঘণ্টা জলের নিচে কাটিয়ে দিতে পারে। নিশ্বাস ফেলার জন্য যখন সাপ ওপরে ওঠে তখন তার দেহ সবখানি না জাগালেও চলে। সাপের নাকের ফুটো তার মাথা ওপর। তাই মাথাটুকু জলের ওপর বাতাস নিয়েই আবার ডুব।

সামুদ্রিক সাপের বৈশিষ্ট্য হল এদের সব প্রজাতি বিষধর এবং এদের বিষ স্থলের রাজগোখরার (**king cobra**) বিষের চেয়ে ২ থেকে ৫0 গুণ বেশি তীব্র। তবে এরা ভূমিবাসী বিষধর সাপের মত অতখানি আক্রমণমুখী নয় এবং সহসা কামড়াতে চায় না। এদের বিষথলি সামনের দাঁত থেকে অনেকটা পিছন দিকে এবং দাঁতও ছোট ও ভঙ্গুর। তাই বিষের উগ্রতা থাকা সত্ত্বেও কখনো কখনো এর দংশন মারাত্মক হয় না। কিন্তু মানুষের দেহে বিষ প্রবেশ করলে মৃত্যু প্রায় অনিবার্য। কেউটে সাপের মত এদের বিষ দ্রুত কার্যকরী নয়, বিষক্রিয়া হতে ২0 মিনিট থেকে কয়েক ঘণ্টা সময় লাগে। কোন প্রকারে এদের আঘাত করায় জেলেরাই এদের দংশনে প্রাণ দেয় বেশি।

সমুদ্রের উপর তল থেকে ৫00 ফুট গভীর পর্যন্ত সাপেরা খাবার সন্ধানে বিচরণ করে। কতক সাগরজলের ওপর শুকনো কাঠের মত অসাড়ে ভেসে চলে; তখন কিন্তু ঘুমাচ্ছে না, খাদ্যপ্রাণী ধরার কৌশল প্রয়োগ করছে। ভাসমান কাঠের খণ্ড মনে করে কাছে ছোট মাছ আসে, 'কাঠ' তখন অল্প সময়ের জন্য জীবন্ত হয়ে ভোজন সমাধা করে নেয়। আবার ভেসে চলার অভিনয়।

* আন্তর্জাতিক সীমানা

সামুদ্রিক সাপেদের একটি বিশেষ ব্যাপার বৈজ্ঞানিকদের কাছে আজও বিস্ময় হয়ে আছে! ভারতমহাসাগর ও প্রশান্ত মহাসাগর ছাড়া আটলাণ্টিক, ভূমধ্য-সাগর, লোহিতসাগর—কোথাও এদের বসতি নেই। পশ্চিমে পানামা খালের মুখে প্রশান্ত মহাসাগরে এদের দেখা মেলে, আর এদিকে আফ্রিকার সর্ব দক্ষিণ অংশ ভারত মহাসাগরের মধ্যে এদের পাওয়া যায় কিন্তু কোন অজ্ঞাত কারণে

ঐ সীমারেখা পার হয়ে কখনো এরা আটলান্টিকে যায় না। আটলান্টিকে এবং অন্যান্য সাগরেও তাদের বসবাসের উপযোগী অনুকূল পরিবেশ বিদ্যমান। তবু তারা সীমান্ত অতিক্রম করে না কেন, কেউ জানে না।

সাগরের সাপ জীবন্ত বাচ্চা প্রসব করে। জন্মের সময় শক্ত গুটিপাকানো বলের মত মনে হয়। জন্মের পর গুটির 'পাক' খুলে গেলে দেখা যায়, বাচ্চারা বাপ-মায়ের প্রায় সমান লম্বা। জন্ম হওয়া মাত্রই এরা স্বাবলম্বী, নিজেদের খাদ্য সংগ্রহ, আত্মরক্ষা—সবকিছু নিজেরাই করে। সামুদ্রিক সাপ দৈর্ঘে হয় ৩ থেকে ৯ ফুট।

প্রবাল উদ্যান

ভূমির ওপর উদ্যান রচনায় মানুষের যত্ন ও উৎসাহের অন্ত নেই। বাহারী গাছপালা, বিভিন্ন রকমের রঙিন পাতার বৃক্ষরাজি, রঙ-বেরঙের পুষ্পতরু ও লতার কুঞ্জ, তার মাঝে জলের ফোয়ারা তৈরিতে মানুষের শিল্পীমন ও রুচির প্রকাশ ঘটেছে। মোগলসম্রাটদের পুষ্পপ্রীতি ও উদ্যান বিন্যাস বিশালতায়, সৌন্দর্যে অভিনবত্বে ঐতিহাসিক কৃতিত্বের নিদর্শন বলে স্বীকৃত। কিন্তু মানুষের দৃষ্টির অন্তরালে, সাগরজলের মধ্যে যে রঙ ও গঠন বৈচিত্র্যে অপূর্ব সুন্দর উদ্যান তৈরি করতে পারে তা হয়ত মানুষের কল্পনার অতীত ছিল। উষ্ণ অঞ্চলের সমুদ্রজলের তলায় যে মোগল উদ্যান সদৃশ বরুণরাজার বাগান রয়েছে সেখানে গেলে নতুন রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা হবে। বর্তমান বিজ্ঞানের কল্যাণে সাগরতলে বেড়াতে যাওয়া মানুষের পক্ষে আর অসম্ভব ব্যাপার নয়। অক্সিজেন টিউব পিঠে নিয়ে, পায়ে ব্যাঙের পায়ের মত রবারের পাতা লাগিয়ে, প্রয়োজনে আত্মরক্ষার জন্য জলের মধ্যে গুলি চালানো যায় এমন স্পিয়ার গান (বল্লম-বন্দুক) হাতে নিয়ে প্রবাল দ্বীপের গা ধ'রে সাগরজলের মধ্যে নেমে গেলে অদ্ভুত সব দৃশ্য চোখে পড়বে।

* প্রবাল উদ্যানের রচয়িতা কে ?

অসম্ভব মনে হলেও সত্য, এক ইঞ্চির সামান্য একটু অংশমাত্র যার দেহের দৈর্ঘ্য এমনি ক্ষুদ্র কীট এরা, যাদের বলি কোরাল পলিপ (coral polyp) বা প্রবাল কীট। বহু সংখ্যক প্রবাল কীট একত্র হয়ে লক্ষ লক্ষ বছর ধরে নিজেদের অস্থি দিয়ে মর্মরসৌধের মত প্রবালদ্বীপ গড়ে তুলেছে। এই কীটেরা চিরজীবী

নয়। কিছুদিন জীবন ধারণের পর তারা মরে গেলে তাদের সন্তানসন্ততি বংশের ধারা অব্যাহত রাখে, মৃতদের অস্থি দিয়ে গেঁথে তোলে বাসগৃহ। সেখানে নিজেরা বাস করে, আবার তাদের অস্থি দিয়ে তাদের সন্ততিরা ঘরদোর কিছুটা উঁচু করে তোলে। এ এক অদ্ভুত প্রক্রিয়া।

সিন্ধুসভ্যতার লুপ্তকাহিনী আবিষ্কার করার সময় জানা গেছে, সিন্ধুর বানে মহেঞ্জোদড়ো শহর প্লাবিত হলে লোকেরা তাদের বাড়িঘর ফেলে অন্যত্র চলে যায়নি, পুরনো ভেঙে-পড়া বাড়ির ওপরই নতুন ক'রে গৃহনির্মাণ করেছে। প্রবাল কীটেরা তেমনি নিজেদের আত্মীয়-স্বজনের মৃতদেহ ফেলে দেয় না, নিজেদের বাসস্থানের ওপরই জমা করতে থাকে। এইভাবে তিল তিল করে বেড়ে উঠতে থাকে প্রবাল-ভবন। প্রবাল কীটদের একতা, ধৈর্য ও কর্মকুশলতা মানব সমাজে প্রবাদ বাক্যে পরিণত হয়েছে।

প্রবাল শিল্পীদের একটি বৈশিষ্ট্য হল বিভিন্ন ডিজাইনের বাড়ি তৈরি করা। কতক পলিপ আছে যারা কেবল তারকা আকারের প্রবাল-ভবন তৈরি করে, কতক তৈরি করে হরিণ-শিং আকারের গৃহ, কেউ বা বানায় মানুষের মস্তিষ্কের আকারের ইমারত। শুধু আকার নয়, রঙ ও কারুকার্যেও পার্থক্য রয়েছে।

* প্রবাল উদ্যান কেমন জায়গায় হয় ?

সমুদ্রের সর্বত্র প্রবালকীটের বসতি নেই। প্রবাল-প্রাচীর নির্মাণকারী পলিপরা এমন উষ্ণ অঞ্চলের সমুদ্রেই বাস করে যেখানে জলের তাপমাত্রা ৬০° ফারেনহাইটের কম নয় এবং ৯৬° ডিগ্রির বেশি না ; যেখানে জল স্ফটিক স্বচ্ছ, কাদাবালি শূন্য। যেখানে সারাক্ষণ ঢেউ-এর মাতামাতি, ঢেউ ওঠা ও ভেঙে পড়ার দরুণ জলের মধ্যে বাতাস প্রবেশ করে। প্রবাল প্রাচীর সাধারণত কয়েকশো ফুট থেকে কয়েক হাজার ফুট চওড়া হয়ে থাকে। এগুলি সাগরজলের সমতলে থাকে, ভাটার সময়ে জলের ওপর কিছুটা জেগে থাকে। প্রবালদ্বীপ গঠনকারী পলিপরা ৩০০ ফুটের বেশি গভীরতায় বাঁচে না ; জলের ওপরেও এরা বাঁচে না, কারণ বাঁচার জন্য খাদ্য সরবরাহকারী জল চাই। এদের পক্ষে সব চাইতে অনুকুল উষ্ণতা হল ৭৭° থেকে ৮৬° ডিগ্রি ফারেনহাইট।

প্রবালকীটদের সর্ববৃহৎ উপনিবেশ হল অস্ট্রেলিয়ার উত্তর-পূর্বে সাগরের অংশ যেখানে ১২৬০ মাইল দীর্ঘ প্রবাল প্রাচীর গড়ে উঠেছে। **Great Barrier Reef of Australia** নামে এই প্রবাল প্রাচীর-উপনিবেশ পলিপদের লক্ষ লক্ষ বছরের নিরবচ্ছিন্ন কর্মপ্রবাহের ফল। উত্তর আমেরিকার ফ্লোরিডার দক্ষিণ-পূর্বে আটলাণ্টিক মহাসাগরের মধ্যে ৬০০ মাইল দীর্ঘ প্রবাল-ভবন তৈরি হয়েছে। যেখানে প্রবাল-প্রাচীর বিরাট বলয়ের মত গোলাকার হয়ে সাগরের অনেকখানি

স্থান জুড়ে জেগে ওঠে, তার মাঝে থাকে সাগরের ঢেউ-এর আন্দোলন থেকে মুক্ত শান্ত জলের হ্রদ, ভূগোলের ভাষায় যাকে বলা হয় লেগুন (Lagoon)। প্রশান্ত মহাসাগর ও ভারত মহাসাগরে নারিকেলগাছ দিয়ে ঘেরা কাকচক্ষুনির্মল জলের লেগুনেগুলি দেবকন্যাদের ফ্রেমে-বাঁধানো আয়নার মত সুন্দর। শান্ত জলে সবুজ নারিকেল কুঞ্জের ছায়া পড়ে, সাদা মেঘ আকাশে ভেসে চলে, মনে হয় তারা যেন নীলজলে পাল তুলে ভেসে চলেছে।

* প্রবাল উদ্যান

ডাঙায় পাহাড়ের গায়ে যেমন নানা আকারের ফার্ণগাছ দেখা যায়, প্রবাল প্রাচীরের গা ধরে জলের মধ্যে নেমে যেতে তেমনি চোখে পড়বে বহু আকারের এবং বহু বর্ণের সুন্দর সব প্রবালকুঞ্জ। স্বচ্ছ ঝকঝকে কাচগলানো জলে সাদা, গোলাপী, সবুজ, নীল নানা রঙের প্রবাল। তার মধ্যে বিচিত্র বর্ণে রঞ্জিত ছোট ছোট মাছ লুকোচুরি খেলার মত ছুটোছুটি করে। মনে হবে উদ্যানে মরশুমি ফুলের বাহার, সেখানে নানা রঙের প্রজাপতির আনন্দ-বিহার।

বিভিন্ন সমুদ্রের প্রবাল উদ্যানের ফসলে পার্থক্য আছে। কতক স্থানে সাধারণ ধরনের প্রবাল দেখা যায়, কোন কোন অঞ্চলে উৎকৃষ্ট মূল্যবান প্রবাল বেশি মেলে। ভূমধ্যসাগরের প্রবাল অতি প্রাচীনকাল থেকেই রঙ ও গড়নের জন্য বিখ্যাত। সবচেয়ে উত্তম প্রবাল পাওয়া যায় টিউনিশিয়া ও আলজিরিয়ার উপকূলে। এছাড়া স্পেন, প্রোভেন্স, সার্ডিনিয়া, কর্সিকা, সিসিলি ও নেপলস উপসাগরেও ভাল জাতের প্রবাল মেলে। ২00 থেকে ১000 ফুট গভীরতায় প্রবাল পাওয়া গেলেও উৎকৃষ্ট মানের প্রবাল হয় ১00 থেকে ১৬0 ফুট গভীরতার মধ্যে।

ভূমধ্যসাগরের লাল প্রবাল মূল্যবান। অলংকারে এর ব্যবহার ব্যাপক। রোমান শিশুরা মাদুলি করে প্রবাল ধারণ করত। ভারতবর্ষেও প্রবালের বেশ সমাদর। ভারত মহাসাগরে পাওয়া যায় কৃষ্ণবর্ণের প্রবাল যাকে 'রাজ-প্রবাল' আখ্যা দেওয়া হয়েছে, কারণ রাজাদের রাজদণ্ড এই উজ্জ্বল মসৃণ কালো প্রবাল দিয়ে তৈরি হত। এছাড়া জাপানের উপকূলে পাওয়া যায় এক জাতের প্রবাল যার রঙ নীলাভ সবুজ এবং তাতে মুক্তার মত নিটোল মসৃণতা।

ভূমধ্যসাগরে যে উত্তম জাতের প্রবাল মেলে তার চাহিদা সর্বত্র। প্রবাল শিল্প ইটালির উপকূলবর্তী শহরে বিশেষ খ্যাতি লাভ করেছে। প্রবাল দিয়ে নানা রকম ছোট ছোট মূর্তি নির্মাণের জন্য নেপলসের টোরে-ডেল-গ্রেকো শহর বিখ্যাত।

স্পঞ্জ

সমুদ্রে যত রকম বিস্ময়কর পদার্থ পাওয়া যায়, স্পঞ্জ তার মধ্যে একটি। এটি ভয়ংকর নয়, নিতান্ত নিরীহ সরলতম প্রাণী। প্রাণ আছে কিন্তু চলতে পারে না, মুখ নেই কিন্তু খাদ্য গ্রহণ করে, চোখ নেই কিন্তু অনুভবে দেখে; সাধারণ জীব-দেহে যেমন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ থাকে তার তেমন কিছুই নেই অথচ বৃদ্ধি আছে, বংশবিস্তার আছে, দেহের বর্ণে বৈচিত্র্য আছে, নানা জাতের মধ্যে আকার গঠনে পার্থক্য আছে।

স্পঞ্জের বৈজ্ঞানিক নামের মধ্যেই এর স্বরূপ বলা হয়েছে। বিজ্ঞানীর ভাষায় একে বলা হয় **porifera**, দুটি ল্যাটিন শব্দ দিয়ে নামটি গঠিত—**porus, pore** অর্থ ছিদ্র; **fero** অর্থ ধারণ করা—**porifera** অর্থ যে প্রাণীর দেহ ছিদ্রময়। সারা দেহ ছিদ্রযুক্ত হওয়ায় তার মধ্যে জল ঢোকে। ছিদ্রপথে এমন কতক মিহি সুতার মত দাঁড়া আছে সেগুলো জল টেনে নিয়ে শরীরের ভিতরকার জালিপথ দিয়ে বের করে দেয়। জলের সঙ্গে খাদ্যবস্তু ও অক্সিজেন দেহে প্রবেশ করে। চাষের মাঠে কাটা নালা দিয়ে যেমন সেচের জল প্রবেশ করে মাঠ উর্বর এবং শস্য সতেজ করে, স্পঞ্জের 'সেচখাল' তেমনি তার জীবন ধারণের সহায়ক।

* স্পঞ্জ কোথায় হয়?

স্পঞ্জের বিস্তার বিশ্বজোড়া। সব সমুদ্র, সাগর, মিঠাজলের হ্রদ, নদী—সর্বত্রই এরা ছড়িয়ে আছে। যেখানে জোয়ার-ভাটা খেলে এমন অগভীর সাগর মুখ থেকে গভীর সমুদ্রের তলদেশ পর্যন্ত এরা সংসার রচনা করেছে। তবে সবচেয়ে অনুকূল স্থান হল সাগরের তীর দিয়ে পাষাণময় বা শক্ত তলভূমি এবং প্রবাল প্রাচীরের ভিতরে শান্তজলের লেগুন। প্রায় আড়াই হাজার জাতের স্পঞ্জ পাওয়া গেছে। এর মধ্যে বেশির ভাগই অনুকূল স্থানের বাসিন্দা।

স্পঞ্জ নিজ অঙ্গ শক্তিতে চলতে অক্ষম হলেও অন্য প্রাণীকে আশ্রয় করে অনেক ক্ষেত্রে সচল হয়েছে। এর বৃদ্ধির জন্য একটু শক্ত স্থান পেলেই হল। কতক সচল প্রাণী স্পঞ্জকে তার পিঠে 'রোপণ' ক'রে নিয়ে বেশ ছদ্মবেশ ধারণ করে এবং শত্রুর চোখে ধুলো দিয়ে চলে-ফিরে বেড়ায়। খাদ্য হিসাবে অন্য প্রাণীর কাছে স্পঞ্জ মোটেই আকর্ষণীয় নয়, কাজেই তার স্বাভাবিক শত্রুও কম। স্পঞ্জই বরং অন্য প্রাণীকে আত্মরক্ষা করতে সাহায্য করে। এক ধরণের মুনি কাঁকড়া (**Hermit crab**) শামুকের খোলসের ওপর স্পঞ্জের একটু টুকরো বসিয়ে

খোলের মধ্যে আশ্রয় নেয়। স্পঞ্জ কাঁকড়ার কোন ক্ষতি করে না, সে যখন বড় হয়ে কাঁকড়ার খোলস-ঘর ঢেকে ফেলে তখন কাঁকড়ার আত্মরক্ষার অতিরিক্ত বর্ম হয় স্পঞ্জ। স্পঞ্জও চলমান বাহন পেয়ে খাদ্য সংগ্রহের অতিরিক্ত সুবিধা পায়। কাঁকড়া জলের মধ্যে চলাফেরা করে, তাতেই স্পঞ্জের ভোজ্যবস্তু মিলে যায়।
সব সাগরে স্পঞ্জ হলেও উষ্ণ অঞ্চলের স্পঞ্জ আকারে ও বর্ণ সুষমায় শ্রেষ্ঠ। ভূমধ্যসাগর, পশ্চিম ভারতীয় সাগর, জাপান ও ফিলিপিন দ্বীপপুঞ্জের কাছে সবচেয়ে ভাল স্পঞ্জ জন্মে।

* স্পঞ্জ সংগ্রহ করা হয় কেমন করে ?

সাগর উপকুলে ২০০ ফুট গভীরতার মধ্যে স্পঞ্জ সংগ্রহের জন্য সাধারণ প্রাচীন পদ্ধতি চালু আছে। স্পঞ্জ শিকারীরা লম্বা দণ্ডের সঙ্গে দুই-তিনটি আঁকড়ে লাগিয়ে হুক (hook) তৈরি করে। এই স্পঞ্জ-সংগ্রাহকদের বলা হয় হুকার। ছোট ডিঙিতে করে হুক নিয়ে এরা নির্মল স্বচ্ছ জলের তলায় স্পঞ্জের সন্ধান চালায়। স্বচ্ছ জলে ২৫ এমন কি ৩০ ফুট পর্যন্ত নিচের জলতল দেখতে পাওয়া যায়। স্পঞ্জ নজরে পড়লে দণ্ড নামিয়ে দিয়ে হাল্কা টানে স্পঞ্জগুচ্ছ তার ভিত্তি মূল থেকে টেনে তুলে নেয়। জল নির্মল এবং সমুদ্র শান্ত থাকলেই তবে এ পদ্ধতি কার্যকর হতে পারে।
এর চেয়ে গভীর জলের স্পঞ্জ তুলতে গ্রীস, লিবিয়া ও ফিলিপিনের উপকূলে ডুবুরিরা খালি গায়ে জলে নামে। এরাও বেশি গভীরে যেতে পারে না। ফ্লোরিডা ও গ্রীসের সাগরে গভীর অংশ থেকে স্পঞ্জ তোলার জন্য আজকাল অক্সিজেন নল মুখে লাগিয়ে শিকারীরা নৌকো থেকে জলে নেমে স্পঞ্জ তুলে আনে। জলের ওপর থেকে মই টানার মত এক রকম ভারী যন্ত্র (gangave) নামিয়ে স্পঞ্জ তোলা যায় কিন্তু তাতে ছোট বড় নির্বিচারে সব স্পঞ্জগুচ্ছ টেনে পিষে ফেলার ফলে স্পঞ্জক্ষেত্রের ক্ষতি হয়। বাহামা, কিউবা, তুরস্ক এবং সাইকোস দ্বীপের সাগর অঞ্চলে কেবলমাত্র হুকাররাই স্পঞ্জ সংগ্রহ করে।

* স্পঞ্জের চাষ

পূর্ণাঙ্গ প্রাণীর মত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ না থাকলেও স্পঞ্জ প্রাণবান উদ্ভিদ-প্রাণী। তার জন্ম, বৃদ্ধি, মৃত্যু আছে। যেমন স্বাভাবিক পরিবেশে তার বিকাশ ঘটে, তেমনি স্থানে এদের পালনক্ষেত্র তৈরি করা যায় না? মানুষ সে কৌশলও আয়ত্ত করেছে ? জীবন্ত স্পঞ্জের সামান্য অংশ (২" × ৪" × ১½") মাপে খুব ধারাল অস্ত্র দিয়ে কেটে পাথরখণ্ড বা সিমেন্টের তৈরি চাকতির গায়ে সুতা দিয়ে বেঁধে জলে নামিয়ে দিলে গাছের ডাল থেকে 'কলম' করার মত স্পঞ্জের অংশ ভিত্তিটি আঁকড়ে

ধ'রে বেড়ে উঠতে থাকে। ব্যবহারযোগ্য আকারের হতে স্পঞ্জের সময় লাগে চার বছর। এইভাবে স্পঞ্জ-উদ্যান তৈরি করে নির্দিষ্ট সময় অন্তর ফসল কাটার মত স্পঞ্জ তোলার ব্যবস্থা হয়েছে।
স্পঞ্জ যখন সাগর থেকে তোলা হয় তখন সেগুলি জীবন্ত যদিও সাধারণ প্রাণীর মত তাদের প্রাণের লক্ষণ বোঝা যায় না। জীবন্ত স্পঞ্জের গায়ে পাতলা রঙের একটা প্রলেপ থাকে, সেইটি তার সজীবতার লক্ষণ। স্পঞ্জ তুলে নিয়ে নৌকার ওপর কিংবা উপকূলে চৌবাচ্চায় সেগুলো কয়েকদিন ফেলে রেখে 'পচানো' হয়। গায়ের রঙের প্রলেপ উঠে গেলে যে কোমল অস্থি থেকে যায়, সেইটি ব্যবহার-যোগ্য স্পঞ্জ। পচনের পর জলে 'জাগ' দেওয়া পাট যেমন ছোট ছোট-বৈঠার মত হাতা দিয়ে পিটিয়ে পরিস্কার করা হয়, স্পঞ্জও তেমনি কাঠের হাতুড়ি দিয়ে পিটিয়ে ময়লামুক্ত নরম করা হয়। তারপর রোদে শুকিয়ে নিয়ে বিভিন্ন আকারে তা কেটে নানা কাজে ব্যবহারের উপযোগী স্পঞ্জে রূপান্তরিত হয়।

স্পঞ্জ একটি সামুদ্রিক ফসল। ভূমির ওপর মানুষ যেমন বিভিন্ন পরিবেশে জলবায়ু ও ভূমি উর্বরা অনুসারে নানা ফসল উৎপন্ন করে, বিভিন্ন দেশের সমুদ্র উপকুলে তেমনি স্পঞ্জ উৎপাদনের অনুকূল ক্ষেত্রে এই জলজ ফসল চাষের ব্যবস্থা হয়েছে। এই ফসল থেকে কি পরিমাণ অর্থ বিভিন্ন দেশ উপার্জন করে নিচের চার্ট থেকে তা বোঝা যাবে ঃ

বিশ্বে স্পঞ্জের উৎপাদন

১৯৩৯

দেশ	পরিমাণ, পাউণ্ড	মূল্য ঃ মার্কিন ডলার
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	৪,৮৪,৪০০	১১,৬১,৯৪৫
বাহামী	৪,৭৩,০০০	১,২০,০০০
কিউবা	৩,৬০,০০০	২,৩০,০০০
গ্রীস	৭৮,০০০	১,৯০,০০০
ইতালি (১৯৩৮)	১,৩০,০০০	২,১০,০০০
তুরস্ক	৫৫,০০০	১,৫০,০০০
লিবিয়া (১৯৩৮)	৭০,০০০	১,২০,০০০
সিরিয়া-লেবানন (১৯৩৮)	৩,০০০	৪,৫০০
ব্রিটিশ হন্ডুরাস	১,৯৬০	২,৬৬০
ফিলিপিন দ্বীপপুঞ্জ	৩৫০	২৫০

মুক্তা

সমুদ্রের এক নাম রত্নাকর, রত্নের ভান্ডার এটি। সমুদ্র থেকে যত প্রকার জিনিস পাওয়া যায় মুক্তা তার মধ্যে সর্বাধিক মূল্যবান। সাগরে এর জন্ম কিন্তু জন্ম রহস্য বিস্ময়কর। প্রাণী নয়, প্রাণীদেহে এর উদ্ভব। তবে সবরকম প্রাণীর দেহে এর সন্ধান মিলবে না ; এক বিশেষ ধরণের জীব, কোন বিশেষ অবস্থায়, বিশেষ প্রক্রিয়ায় একে তৈরি করে। শুনতে অদ্ভুত মনে হলেও এটি জৈবিক সত্য যে, জীবজগতের নিম্নপর্যায়ের প্রাণী শামুক ঝিনুক এই মূল্যবান পদার্থের জন্মদাতা।

অতি প্রাচীনকাল থেকে মুক্তা মানুষেয় কাছে আকর্ষণীর বস্তু। কী করে এর জন্ম হয় সে সম্বন্ধে বিভিন্ন জাতির লোক ভিন্ন ভিন্ন ধারণা মনে পোষণ করত। কতক লোক মনে করত, আকাশের বিদ্যুৎ সাগরে নেমে পড়লে তার কণামাত্র আলোক যে ঝিনুককে স্পর্শ করে, তার দেহে জন্ম নেয় এই টলটলে কোমল আলোক বিন্দু। অন্যদের ধারণা ছিল, শিশিরবিন্দু ঝিনুকের মধ্যে ঢুকে জমাট বেঁধে মুক্তায় পরিণত হয়েছে। স্পষ্টই বোঝা যায়, মুক্তার আলো-বিচ্ছুরণকারী নয়নসুখকর দীপ্তি ও মনোহর গড়ন দেখে কল্পনাপ্রবণ মানুষ এই মনোরম বস্তুটির সৃষ্টিরহস্য ব্যাখ্যা করতে চেয়েছিল। অবশ্য মুক্তার উৎপত্তি কিভাবে হয়, আগে মানুষের অজ্ঞাত থাকলেও এখন আমাদের তা জানা।

শামুক ঝিনুক যখন তার দেহের কোমল অংশ খোলের ভিতর থেকে বের করে খাদ্যের সন্ধানে চলাফেরা করে, তখন যদি বালুকণা বা অন্য কোন ক্ষুদ্র শক্ত পদার্থ তার দেহ ও খোলার মাঝে কোথাও আটকে যায় এই জিনিসটি তার অস্বস্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায়, ঠিক মানুষের চোখের মধ্যে সামান্য কোন ক্ষুদ্র পদার্থ পড়লে যে অবস্থা হয়, তেমনি। শামুকটি তখন তার ওপর দেহরসের প্রলেপ দিয়ে তার অবিরত আঘাত থেকে রক্ষা পাওয়ার চেষ্টা করে। ঝিনুক-শামুকের খোলার ভিতরের দিকটায় যে উজ্জ্বল চক্‌চকে পদার্থের আস্তরণ তা 'নেকার' (nacre) বা মুক্তা-জননী [mother of pearl] নামে উল্লিখিত হয়। এই পদার্থ স্তরে স্তরে প্রলেপ পড়ার ফলে মুক্তার সৃষ্টি হয়।

* বিভিন্ন আকারের মুক্তা

মুক্তার আকার সব সমান নয়, এক রকমও নয়। ঝিনুকের দেহের অভ্যন্তরে কোন্ স্থানে উৎপত্তি, তার ওপর গড়ন নির্ভর করে। যদি খোলার আস্তরণের ওপর থাকে, তবে এর তলার দিকটা চ্যাপ্টা হবে। এরূপ মুক্তাকে বলা হয় 'বোতাম মুক্তা' [button pearl] ; যদি খোলার সঙ্গে সামান্য একটু যুক্ত ও

মোটামুটি গোলাকার হয় তার নাম দেওয়া হয়েছে 'ফোস্কা মুক্তা' [blister pearl] ; যেগুলি খুবই ছোট এবং ঝিনুকের মাংসপেশীর মধ্যে উৎপন্ন, তার নাম 'বীজ মুক্তা' [seed pearl] । টিস্যুর মধ্যে বড়, গোলাকার, স্নিগ্ধ দ্যুতি যুক্ত ও নিষ্কলঙ্ক যে মুক্তার সৃষ্টি হয় সেগুলি দুর্লভ, অতি উত্তম ['of the first water'] এবং বহু মূল্যবান। বর্তমানে একটি উৎকৃষ্ট মুক্তার মূল্য কয়েক হাজার ডলার। প্রাচীনকালে মিশরের রাণী ক্লিওপেট্রা মার্ক এণ্টনির সম্মানে আয়োজিত ভোজন সভায় যে মুক্তা ভিনিগারে গলিয়ে পানীয়ের সঙ্গে পান করেছিলেন তার দাম ছিল দেড় লক্ষ পাউণ্ড, এখানকার মুদ্রায় যার দাম পড়বে ২৭ লক্ষ টাকার ওপর।

প্রাচীন রোমে মুক্তার বিশেষ আদর ছিল। কলঙ্কহীন নিটোল মুক্তা পরিপূর্ণতার প্রতীক বলে গণ্য হত। রোমে কেবল বিশিষ্ট ব্যক্তিদেরই মুক্তা ব্যবহারের অধিকার ছিল। প্লিনি বলেছেন, মুক্তা হল যাবতীয় সামগ্রীর মধ্যে মহামূল্য এবং রাজকীয় বস্তু।

* মুক্তা সংগ্রহ

অতি প্রাচীনকাল থেকে ভারতমহাসাগর ও পারস্য উপসাগরে মুক্তা সংগ্রহের কাজ চলে আসছে। বর্তমান পৃথিবীর অন্যান্য স্থানে—জাপান, চীন, অস্ট্রেলিয়া, প্রশান্তমহাসাগরের দ্বীপপুঞ্জ, মেক্সিকো উপসাগর প্রভৃতি স্থানে মুক্তা আহরণের ব্যবস্থা আছে। সাধারণত বছরে একবার—বসন্তকাল চার সপ্তাহের জন্য—মুক্তার সন্ধানে সাগরে ডুবুরিদের অভিযান চলে।

মুক্তাশিকারীরা ডুবুরি। একটি নৌকায় দুজন করে লোক থাকে তার হাতের মুটি দড়ির প্রান্ত। একটি দড়ির সঙ্গে 40 পাউণ্ড ওজনের পাথর ও একটি ঝুড়ি, দ্বিতীয়টি সংকেতবাহী। একজন ডুব দিয়ে সাগরের তলায় গিয়ে শামুক ঝিনুক কুড়িয়ে রাখে। নৌকার ওপর যে দড়ি ধরে থাকে সে সংকেত পেলেই ঝুড়ি ও পাথর টেনে তোলে। ডুবুরি প্রায় ৬০ থেকে ৮০ সেকেণ্ড জলের নিচে থাকে। জাপানী ও মালয়ী ডুবুরিরা খালি গায়ে একখণ্ড পাথর ধরে তাড়াতাড়ি নিচে নেমে যায় এবং কাজ শেষ করে উঠে আসে। এরূপ ক্ষেত্রে এক মিনিটের বেশি সময় তাদের পক্ষে জলের নিচে থাকা সম্ভব হয় না। বর্তমানে পৃথিবীর নানা স্থানে অক্সিজেন-টিউব-লাগানো ডুবুরির পোষাক ব্যবহার করা হয়। এর ফলে ডুবুরিরা সাগরতলে অনেকক্ষণ থাকতে পারে। ডুবুরিদের সবচেয়ে মারাত্মক শত্রু হাঙ্গর। বিপদ দেখা দিলে তারের সাহায্যে ওপরে খবর পাঠিয়ে তাড়াতাড়ি উঠে আসার ব্যবস্থা করতে পারে।

মুক্তা সংগ্রহকারী ডুবুরিদের একটা বিস্ময়কর অভিজ্ঞতা হয়েছে। যে শামুক ঝিনুক

কুৎসিৎ, কদাকার, অন্য ক্ষুদ্র প্রাণীর আক্রমণে ক্ষতবিক্ষত, যাদের খোলার উপরিভাগ এবড়ো-খেবড়ো আঁচিলযুক্ত সাধারণত সেগুলোই শ্রেষ্ঠ মুক্তার উৎপাদিকা।

* মুক্তা বাছাই

কখনো কখনো সাগর থেকে তোলার পর নৌকার মধ্যেই ঝিনুক খুলে তার মধ্যে মুক্তা আছে কিনা সন্ধান করা হয়। তবে সাধারণত তীরে নিয়ে ঝিনুকগুলো চৌবাচ্চার মধ্যে কিছুদিন ফেলে রেখে পচানো হয়; তারপর জল দিয়ে ভাল করে ধুয়ে, হাতে বা বিশেষ যন্ত্রসাহায্যে তন্নতন্ন করে খোঁজা হয়। বেশির ভাগ মুক্তার রঙ মাখনের মত সাদা হলেও বেগুনি ও হলুদ রঙের মুক্তাও মেলে। চিকচিকে কালো রঙের মুক্তা খুব মূল্যবান বলে বিবেচিত হয়। সবচেয়ে দামী এবং আকর্ষণীয় হল ভারতের গোলাপী রঙের মুক্তা।
আসল মুক্তার ব্যবহার সাধারণ মানুষের সামর্থের বাইরে। মোগল সম্রাট দীর্ঘ মুক্তার মালা পরে সিংহাসনে বসতেন। জুলিয়াস সীজার নাকি মুক্তা পাওয়ার আশাতে ব্রিটেন জয় করেছিলেন, রাণী এলিজাবেথ যে পোষাক ব্যবহার করতেন, বহু মুক্তা সন্নিবিষ্ট থাকায় তা রীতিমত শক্ত হয়ে পড়ত।

* মুক্তা চাষ

মুক্তা চাষ আঙুর চাষের মত নয়, যাদের দেহে মুক্তার জন্ম হয় তাদের দিয়েই মুক্তা তৈরি করানো হয়। স্বাভাবিকভাবে মুক্তা হতে গেলে দরকার দুইটি ব্যবস্থা —ঝিনুকের দেহের মধ্যে বাইরের কোন ক্ষুদ্র বস্তুর প্রবেশ; দুই—সেই বস্তুটিকে 'নেকার' বা মুক্তা-জননীর প্রলেপ দিয়ে ঢাকার চেষ্টা যার ফলে উজ্জ্বল ঝিকমিক-করা পদার্থটির আস্তর প্রলেপ পুরু হয়ে মুক্তার আকার গ্রহণ করে। কিভাবে, কেন মুক্তা তৈরি হয় তা যখন জানা গেল তখন বুদ্ধিমান কৌশলী মানুষ ঝিনুককে কাজে লাগিয়ে এই মূল্যবান বস্তুটি উৎপাদনের উপায় উদ্ভাবন করে। এই উদ্ভাবনের কৃতিত্ব চীনাদের। চীনের হুচাও-এর অধিবাসী ইয়ে-জিন-ইয়াং ত্রয়োদশ শতকে এই কৃত্রিম পদ্ধতি প্রচলিত করেন। চীনারা দেখেছিল, শুধু সাগরে নয়, মিঠাজলের ঝিনুক দিয়েও মুক্তা তৈরি করানো যায়। ঝিনুকের মুখ খুলে তার মধ্যে একটু মাটি বা কাঠের কুচি ঢুকিয়ে দিয়ে ঝিনুকটিকে জলে পালন করতে থাকলে দেখা গেল তিন বছরে সেই প্রবিষ্ট বস্তুটিকে ঘিরে প্রলেপে মুক্তা তৈরি হয়েছে। চীনাদের এইভাবে চাষ করা মুক্তা প্রায় সবই হয় blister pearl, ফোস্কার মত দেখতে; একদিকে সমতল ওপরের পিঠ অর্ধ-গোলাকার। এইরূপ দুটিকে একত্রে জুড়লে একটি পূর্ণাঙ্গ মুক্তা হয়।

জাপানীরা পুরো গোলাকার মুক্তা চাষের পদ্ধতি আবিষ্কার করেছে। বহু পরীক্ষা নিরীক্ষার পর মিকিমোটা ১৮৯০ সালে এই পদ্ধতিতে সাফল্য লাভ করেন। একটি ক্ষুদ্র mother of pearl-এর পুঁতি ঝিনুকের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দিলে ঝিনুকটি মুক্তা তৈরিতে বিশেষভাবে সাড়া দেয়। এই ধরণের চাষ করা মুক্তায় একটা গুণ, এর সবটাই নেকার অর্থাৎ mother of pearl উপাদানে গঠিত। এইভাবে চাষ করা মুক্তা স্বাভাবিক মুক্তার প্রায় কাছকাছি যায় কিন্তু ঝিনুকের দেওয়া প্রলেপ এত পাতলা যে কিছুদিন ব্যবহার করলে দেহের সংস্পর্শে থাকায় প্রলেপটি ক্ষয় হয়ে যায় এবং ভিতরের পুঁতি কাঠামো অংশ বেরিয়ে পড়ে।

জাপানীদের মুক্তা আবাদের ক্ষেত্র সমুদ্রে। এরূপ ক্ষেত্রের সংখ্যা তিনশোর বেশি। সবচেয়ে বড় ক্ষেত্র আগো উপসাগর কূল থেকে ২০ সামুদ্রিক মাইল পর্যন্ত বিস্তৃত। ঝিনুকগুলির ভিতর পুঁতি ভরে দেবার পর তাদের নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে জলে নামিয়ে দেওয়া হয়। চার বছর পর পর এদের তুলে 'ফসল' সংগ্রহ চলে। এদের রক্ষণাবেক্ষণ, তদারকি ও হিসাব-নিকাশ রীতিমত পশুপালন ক্ষেত্রের মত।

* মুক্তা পরীক্ষা

মুক্তার গঠন স্বাভাবিক কিনা এবং তার গুণাগুণ কেমন তা পরীক্ষার জন্য বহুবিধ যন্ত্রপাতির ব্যবহার হয়। মুক্তার আভ্যন্তরীণ মধ্যবিন্দুটি দেখার জন্য আছে নেকারস্কোপ (nacrescope) বা মুক্তা আলোক-উদ্ভাসক যার আলোক রশ্মিপাতে এর ভিতর দিকটার গঠন দেখতে পাওয়া যায়। অন্য একটি যন্ত্রের নাম এণ্ডোস্কোপ (endoscope)। মুক্তায় সুতা পরানোর জন্য যে ফুটো করা হয়, এণ্ডোস্কোপ দিয়ে ফুটোর মধ্যে আলোক ফেললে তা ফুটোর গা থেকে মুক্তার বাইরের দিকে উঠে আসার সময় এর ভিতরকার মূলবিন্দু থেকে বাইরের দিকের গঠন চোখে পড়ে। আসল মুক্তার গড়নে কেন্দ্র থেকে প্রলেপ পড়তে শুরু হয়; চাষ করা মুক্তায় নেকারের প্রলেপ সমান্তরালভাবে পড়ে প্রবিষ্ট পুঁতির ওপর। মুক্তা ফুটো করা না থাকলে এক্স-রে ফটোগ্রাফ নিয়ে মুক্তার ভিতরকার গঠন সঠিকভাবে জানা যায়।

যন্ত্র ছাড়া একটি পরীক্ষা হল মুক্তার মসৃণতা পরখ করা। স্বাভাবিক এবং চাষ করা মুক্তার উপরিভাগ ঈষৎ খসখসে, দাঁতের ওপর আলতোভাবে ঘষলে এটা অনুভব করা যায়। নকল মুক্তা স্পর্শে মসৃণ মনে হবে।

* অনুকরণ মুক্তা

নকল বা অনুকরণ মুক্তা প্রথম তৈরি হয় ফ্রান্সে ১৭ শতকে। ' মাছের রূপালি চকচকে আঁশ থেকে তরল সার ও ল্যাকার দিয়ে আরক তৈরি করে তার মধ্যে স্বচ্ছ কাচের গোল দানা বারে বারে ডুবিয়ে কাচের ওপর একটা আস্তরণ প্রলেপ লাগিয়ে নেওয়া হয়। এইভাবে এতে ইচ্ছামত রঙের জৌলুসও আনা যায়। দূর থেকে দেখলে একে আসল মুক্তা বলেই মনে হবে।

* মুক্তার ব্যবহার

মুক্তা তুলনামূলকভাবে অন্যান্য রত্ন অপেক্ষা নরম এবং অ্যাসিডে সহজে নষ্ট হয়। সেজন্য মুক্তার বিশেষ যত্ন আবশ্যক। মো-র (Moh) কাঠিন্য মাপক স্কেল অনুসারে talc = 1, হীরা = 10, মুক্তা = $3\frac{1}{2}$—4 অর্থাৎ হীরা অপেক্ষা অনেক নরম। আলপিন, ছুরি বা ধাতুর মুদ্রা দিয়ে এতে আঁচড় কাটা যায়। তাই সাধারণত মুক্তা অন্য কোন আধারে স্থাপন করে ধারণ করা হয়, যেমন নেকলেস্ আংটি, দুল প্রভৃতি। সুতা পরিয়ে মালার মত গাঁথলে নিয়মিতভাবে সুতা পালটানো দরকার আর মুক্তা যাতে সুতার ওপর দিয়ে হড়কে চলতে চলতে ফুটোর ভিতর দিকে ক্ষয়ে না যায় সেজন্য মুক্তার ঠিক দুইপাশে গিঁটমত দিয়ে এর সচলতা বন্ধ করা দরকার। মুক্তা প্রধানত ক্যালসিয়াম কার্বোনেট দিয়ে তৈরি। অ্যাসিডের সংস্পর্শে এলে এর ক্ষতি হয়। মানুষের গায়ের ঘামে সামান্য পরিমাণ অ্যাসিড থাকে। তাই ঘামেও মুক্তার ক্ষতি করে। কাজেই ব্যবহারের পর মুক্তা মুছে রাখতে হবে, সামান্য অ্যাসিডে রঙ নষ্ট করে, অ্যাসিডের পরিমাণ বেশি হলে মুক্তা গলে যাবে। উত্তাপে মুক্তার ক্ষতি হয়, আবার বেশিদিন অন্ধকারে রাখলেও এর উজ্জ্বলতা কমে যায়।

সাগর-গাভী (Sea Cow)

ডাঙার চেয়ে সাগরের আয়তনের পরিমাণ অনেক বেশি ; ডাঙার চেয়ে সমুদ্রের জীবের জাতি-প্রজাতি ও সংখ্যাও অনেক অনেক বেশি। ডাঙাতে যে সকল জীবের সঙ্গে আমাদের পরিচয়, সমুদ্রেও সেই নামের অনেকের দেখা মেলে। সমুদ্রে আছে বাঘের মত ভয়ংকর প্রাণী হাঙ্গর, হাতির মত বিরাট প্রাণী তিমি, ঘোড়ার মত মুখাকৃতি সী-হর্স, গরুর মত তৃণভোজী সাগর-গাভী। **Sea-Cow** বা **Dngong** গভীর সমুদ্রের জীব নয়। উষ্ণ মণ্ডলের সাগরে উপকূলের কাছাকাছি এদের বাস, সামুদ্রিক উদ্ভিদ এদের খাদ্য।

ডাঙায় চিৎকরে শোয়ান ডুগং [সাগর-গাভী]

৮ থেকে ৯ ফুট লম্বা, গায়ের রঙ ধূসর। অস্ট্রেলিয়ার কাছাকাছি যাদের বাস তারা লম্বায় ১৫ ফুট পর্যন্ত হয়ে থাকে। এদের দেহ-গড়নের বৈশিষ্ট্য, সামনের পাখনা-পা দুটি ছোট বৈঠার মত, লেজ অর্ধচন্দ্রাকৃতি ও শক্তিশালী, ছোট গোল মাথা, ক্ষুদ্র চোখ। ওপর-নিচ লেজ-বৈঠা চালিয়ে ডুগং ধীরে ধীরে জলের মধ্যে চলা ফেরা করে। সাগর তলের শৈবাল ও অন্যান্য উদ্ভিদ খাওয়ার জন্য এরা ধীরে ধীরে ডোবে। উষ্ণরক্ত, স্তন্যপায়ী সাগর-গাভী একবার প্রশ্বাস নিয়ে ৫ থেকে ১0 মিনিট জলের তলায় থাকতে পারে। ধীরে ধীরে ভেসে উঠে নিশ্বাস ফেলে আবার ডেবে। এক ক্ষেত্রের খাদ্য-উদ্ভিদ শেষ হলে এরা দল ধরে অন্য চারণ ভূমিতে চলে যায়।

সাগর-গাভী স্নেহশীলা জননী। একটি করে সন্তান হয়। বুকের ওপর ছোট দুটি স্তন। জলের ওপর ভেসে রোদ পোহানোর সময় মায়ের কোলের কাছে সন্তানকে দেখা যাবে, চলাফেরার সময় জননী সন্তানকে এক হাতে বুকে চেপে রেখে দুধ খাওয়ায়। নানাদেশের রূপকথায় রূপসী সাগরকন্যার কাহিনী আছে যাদের দেহের ওপরের ভাগ কিশোরীর মত, নিচের অংশ মৎস্যাকৃতি।

গোল মুখ, মসৃণ ধূসর দেহ ও পুষ্ট বক্ষদেশ দূর থেকে দেখলে মানবী বলে ভ্রম হওয়া স্বাভাবিক।
লোহিত সাগর, ভারত মহাসাগর, প্রশান্ত মহাসাগর, সলোমন ও মার্শাল দ্বীপপুঞ্জ পর্যন্ত এদের দেখা যায়। এদের মাংস সুস্বাদু এবং দেহে প্রচুর চর্বি। পূর্ণবয়স্ক ডুগং-এর শরীরে ১০ থেকে ১২ গ্যালন চর্বি পাওয়া যায়। নিরীহ শ্লথগতি, ৫-১০ মিনিট অন্তর জলের ওপর ভেসে উঠতে বাধ্য এই প্রাণীগুলি বর্শা ও হাপুণধারী শিকারীর হাতে সহজবধ্য।

ডলফিন

তিমি গোষ্ঠীর ছোট শরিক ডলফিন দেহ গড়নে প্রায় তিমির মতই, কেবল আকারে ছোট। অবশ্য ঘাতক তিমিদের সঙ্গেই এদের সাদৃশ্য বেশি; স্পার্ম তিমি বা ক্রিলভোজী ছাকনি দাঁতওয়ালাদের সাথে চেহারার মিল নেই। তিমিরা সবাই সমুদ্রের বাসিন্দা, সাগরে পড়েছে এমন নদীতেও ডলফিন বাস করে। ভারতের সাগর-খাড়ি ও নদী, দক্ষিণ আমেরিকার আমাজন ও রায়ো-ডি-প্লাটা এবং চীনের ইয়াং-সি-কিয়াং নদীতে এদের ঝাঁক ধরে থাকতে দেখা যায়। ডলফিন সাধারণত ৬ থেকে ৮ ফুট লম্বা হয়। মুখে ধারালো ছোট ছোট দাঁত, সংখ্যা

ডলফিন

১৬০ থেকে ২০০। পিঠের ওপরকার রঙ কালো, তলার দিকে সাদা। চ্যাপ্টা ধরণের ঠোঁট ইঞ্চি ছয়েক লম্বা। ছোট ছোট, কানের ফুটোও ছোট। মাথার ওপর নিশ্বাস ফেলার অর্ধচন্দ্রাকার ফুটো; তাতে ভাল্ভ থাকায় জল ভিতরে প্রবেশ করে না। মাঝে মাঝে জলের ওপর মাথা জাগিয়ে সশব্দে নিশ্বাস ফেলে।

স্ত্রী ডলফিন একবারে একটি বাচ্চা প্রসব করে, স্তনের দুধ খাওয়ায়। সন্তানের প্রতি মা ডলফিনের প্রবল আকর্ষণ।

প্রাচীনকালের লেখক এবং আধুনিক সাহিত্যিকদের রচনায় ডলফিনদের সম্বন্ধে নানা চিত্তাকর্ষক কাহিনী পাওয়া যায়। অ্যারিস্টটল, প্লেটো এবং অন্যান্য কতক প্রাচীন লেখক ডলফিনদের সম্বন্ধে বলেছেন, এরা মানুষের বন্ধু এবং সাগরে জাহাজের কাছে এসে এরা নানা রকম কৌতুককর আচরণ করে। পালতোলা জাহাজ যত বেগেই ছুটুক এরা তার সঙ্গে দৌড় পাল্লা দেয়; জাহাজকে চক্রাকারে পরিক্রমা করে নিজেদের দৌড়সামর্থের পরিচয় দেয়। বালকদের প্রতি ডলফিনদের বিশেষ অনুরাগ। এমন কাহিনীও প্রচলিত আছে যে পোষা ডলফিন ডাকলেই কাছে আসে এবং বালক বন্ধুদের পিঠে করে স্কুলে নিয়ে যায় ও বাড়িতে দিয়ে আসে। এ কাহিনী সত্য মনে হয় এই কারণে যে, সাগরে স্নান করার সময় ডলফিনরা কাছে এসে ভাব জমায় এবং ছোটদের তাদের পিঠে ওঠে মজা করতে দেয়। এইভাবে ছোটদের পিঠে নিয়ে ঘোড়ার মত চলতে ডলফিনরা নিজেরাও যেন আনন্দ পায়। ডলফিনরা যে মানুষের বন্ধু কিছুদিন আগে তার বাস্তব প্রমাণ পাওয়া গেছে। দৈনিক Statesman ও আনন্দবাজার পত্রিকায় ডলফিনদের সম্বন্ধে একটি অভিনব খবর প্রকাশিত হয় যা থেকে প্রাচীন লেখকদের পর্যবেক্ষণের সমর্থন মেলে।

৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৮১ তারিখের Statesman-এর খবর ঃ

> **Rescued by Dolphins : Three children were rescued by dolphins which hushed them adrift till they reached a life-boat after their ship. Tampomas II, had sunk in the Java Sea, the Djakarta newspaper. Berita Burean reported on Monday. U. P. I.**

৩ ফেব্রুয়ারী ১৯৮১ তারিখের আনন্দবাজার পত্রিকার সংবাদ ঃ

• মহানুভব ডলফিন

জাকরতা, ২, ফেব্রুয়ারি ঃ গত সপ্তাহে জাভাসমুদ্রে জাহাজডুবিতে একদল ডলফিন তিনটি শিশুর জীবন রক্ষা করে। আগুন লাগার পর ট্যামপোমাস-২ জাহাজটি যখন ডুবে যাচ্ছিল তখন ওয়ালানস (১১) ও তার দুই ভাইকে তাদের বাবা সমুদ্রে ছুঁড়ে দেন। একদল ডলফিন, শিশুরা ডুবে যাচ্ছে দেখে সঙ্গে সঙ্গে তাদের পিঠের ওপর তুলে নিয়ে জলের ওপর ভাসিয়ে একটি লাইফবোটের পাশে নিয়ে আসে। লাইফবোটের লোকেরা তখন শিশু তিনটিকে উপরে তুলে নেন। তাদের মা-বাবা কিন্তু এখন পর্যন্ত নিখোঁজ। —এ. এফ. পি.

ডলফিনদের কথা আমরা নানা দেশের বইতে দেখতে পাই। প্লিনি বলেছেন, ডলফিনরা নীলনদের উজান দিকে উঠে যায়। নীলনদের কুমির মানুষের শত্রু। ডলফিন তাদের সঙ্গে লড়াই করতে ছাড়ে না। এ যেন বন্ধু হয়ে তার শত্রুকে প্রতিরোধ করা! স্প্যানিস ও পর্তুগীজভাষী ধীবরদের মধ্যে এ বিশ্বাস বদ্ধমূল যে, মাছ ধরার সময় তাদের বিপদ থেকে রক্ষার জন্য নরমাংসলোভী হাঙ্গরদের তারা আক্রমণ করে তাড়িয়ে দেয়। সাগরে ডলফিনের দল দেখা গেলে বিপন্ন মানুষ, কাছেই বন্ধু আছে জেনে মনে সাহস পায়, কারণ তারা যেন নিউ টেষ্টা-মেণ্ট বাইবেলের 'উত্তম স্যামারিটান' (Good Samaritan); বিপন্ন মানুষের সেবার জন্য তারা আপনা থেকেই এগিয়ে আসে। সাগরের প্রাণী সবাই যখন স্থলচর মানুষের শত্রু, সাহসী বুদ্ধিমান ক্ষিপ্রগতি একতাবদ্ধ ডলফিন বন্ধুরা যে সমুদ্রচারী মানুষের কাছে প্রিয় হবে তাতে আর আর সন্দেহ কি?
শুধু আপৎকালে নয়, আনন্দের দিনেও ডলফিন প্রীতিবর্ধকের ভূমিকা গ্রহণ করে। উন্মুক্ত মাছঘরে, (Outdoor aquarium) ডলফিন দর্শকদের, বিশেষ করে শিশুকিশোরদের প্রিয় সঙ্গী-তে পরিণত হয়েছে। হংকং, ফ্লোরিডা ও ক্যালিফোর্নিয়ার অ্যাকোয়ারিয়ামে ডলফিনরা মানুষের ডাকে সাড়া দেয়, ছোটদের সঙ্গে খেলায় আমোদ পায়, তাদের মুখে 'লাগাম' লাগিয়ে তা ধরে পিঠের ওপর দাঁড়ালে ডলফিনরা সানন্দে সওয়ার নিয়ে জলদৌড় বাইচ খেলা দেখায়। ডলফিনরা স্পষ্ট শব্দ উচ্চারণ করে নিজেদের মধ্যে ভাবের বিনিময় করে; তাছাড়া শব্দাতিগ (supersonic) বায়ুতরঙ্গও সৃষ্টি করতে পারে। হয়ত ডলফিন এই সুপারসনিক শব্দতরঙ্গ জলের মধ্যে উৎপাদন করে দূরে অন্য ডলফিনদের কাছে সংবাদ পেঁাছে দিতে পারে; কিংবা বন্ধু ডলফিনদের মারফৎ সাগর পাড়ি দিয়ে দূরে কোন বার্তা পাঠানো ও প্রয়োজনীয় দ্রব্য বহন করিয়ে আনাও হয়ত সম্ভব হতে পারে। ডলফিনের ভাষা ও দৌত্যকাজে তাদের ব্যবহার করা সম্পর্কে গভীর গবেষণা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলেছে বিজ্ঞানীদের মধ্যে।

বিজ্ঞানভিত্তিক গল্পলেখক আর্থার সি. ক্লার্ক কিশোরদের জন্য লেখা উপন্যাস ডলফিন আইল্যাণ্ড-এ ডলফিনদের বুদ্ধি ও বন্ধুত্বের কাহিনী লিখেছেন। তাদের অযাচিত সাহায্যে কিভাবে একটি কিশোর সাগরে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পেয়েছিল এবং কিভাবে সে পোষা ডলফিনদের সার্ফবোর্ডের জোয়ালে জুড়ে তাদের দিয়ে টানিয়ে সাগর পাড়ি দিয়েছিল তার রোমাঞ্চকর বর্ণনা দিয়েছেন। বাস্তবনির্ভর অভিজ্ঞতা ও কল্পনার মিশ্রণে রচিত কাহিনী ভবিষ্যতে কল্পনাবর্জিত হয়ে পুরোপুরি বাস্তব ঘটনায় পরিণত হবে কিনা কে বলতে পারে? যদি হয়, অনেক কাল পরে মানুষ এক নতুন কীর্তির অধিকারী

হবে। সেই ৮।১০ হাজার বছর আগে নবপ্রস্তরযুগের মানুষ তার স্থলভাগের সহবাসিন্দা বন্য পশু পোষ মানিয়ে কতককে বন্ধু, কতককে ভৃত্যে পরিণত করেছিল। হাতি, ঘোড়া, গরু, ছাগল, উট, গাধা, কুকুর, বিড়াল সবই যখন বুনো ছিল তারা মানুষের সহায়ক ছিল না কেউই। পরে সাহস ও বুদ্ধিবলে মানুষ তাদের আপন করে নিয়েছে, বানিয়েছে জীবনযাত্রার সহযোগী। সমুদ্রেও এরূপ কোন বন্ধু পাওয়া গেলে তা নিঃসন্দেহে হবে মানুষের এক উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব।

* ডলফিন ঃ নতুন জগতের মানুষ ?

কথায় বলে 'মাছের মায়ের পুত্রশোক'। মাছ, হাঙ্গর, স্কুইড, অক্টোপাস—তাদের সন্তানদের জল-জগতে ছেড়ে দিয়ে তাদের সম্পর্ক শেষ করে কিন্তু ডলফিন এর ব্যতিক্রম। ডলফিন মাছেদের মত শীতলরক্ত প্রাণী নয়, উষ্ণরক্ত এবং স্তন্যপায়ী জীব। এরা তিমিদের স্বগোত্র কিন্তু আকারে এবং খাদ্যগ্রহণ কৌশলে এদের মধ্যে পার্থক্য ঘটে গেছে।

জলমন্ডলের বাসিন্দা ডলফিন প্রকৃতির এক অপরূপ সৃষ্টি। এদের পারিবারিক জীবন আছে, সমাজ-ব্যবস্থা আছে, সমাজ জীবনের নিয়ম-শৃঙ্খলা আছে। এদের নিজেদের ভাষাও আছে। জীব বিজ্ঞানী যারা ডলফিনের জীবন ও সমাজ পরিবেশ নিয়ে গবেষণা করছেন তাঁদের অভিমত এই যে, ডলফিনের বুদ্ধি বেশ তীক্ষ্ম ; তবে মানুষ যেমন নানা সমস্যা সমাধানে বুদ্ধির প্রয়োগ করতে করতে এর উৎকৃষ্ট সাধন করছে, ডলফিন তার নিজের পরিবেশেই সন্তুষ্ট রয়েছে, অধিক বুদ্ধি প্রয়োগের প্রয়োজন অনুভব করেনি।

পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেই শুশুক ও ডলফিনদের আচার-ব্যবহার, হৃদয়াবেগ, সমাজ ব্যবস্থা সম্পর্কে গবেষণায় নিযুক্ত আছেন অনেক বিজ্ঞানী। এর ফলে ডলফিনদের জীবনযাত্রার অনেক খবর জানা গেছে। এদের এক-একটা পরিবারে ১০ থেকে ১২টি সদস্য থাকে। অনেকগুলি পরিবার একত্র হয়ে এক বিরাট দল গঠন করে, যেমন সাধারণ ডলফিন [Common Dolphin] নামে পরিচিত এক প্রজাতির [Dolphins delphis] দলে প্রায় দশ হাজার ডলফিন থাকে। 'পাইলট ডলফিন' [Pilot whale] নামে পরিচিত ডলফিনরাও কয়েক হাজার মিলে ঝাঁক বেঁধে সমুদ্রে বিচরণ করে।

ডলফিন শিশুর জন্ম

জলে বাস করলেও মাছের মত কান্‌কো-ফুলকো দিয়ে জল থেকে অক্সিজেন নিয়ে নিশ্বাস নেবার অঙ্গ ডলফিনের নেই, তাই শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য জলের বাইরেকার

---

* দ্রষ্টব্য—অন্বেষা, ২য় বর্ষ, ৬ষ্ঠ ও ৮ম সংখ্যা

বাতাসের ওপর তার নির্ভর। কিন্তু যে শিশু জলের মধ্যে ভূমিষ্ঠ, বরং বলা যায় জলষ্ঠ হল, সে বাতাস পাবে কোথায়? ডলফিন প্রসূতির সাহায্যের জন্য একাধিক স্ত্রী-ডলফিন সব সময় আসন্ন প্রসবা ডলফিন-মাতার কাছে কাছে থাকে। প্রকৃতিও সাহায্য করে। মাতৃগর্ভ থেকে প্রসূত হওয়ার সময় প্রথমে শাবকের লেজ, পরে মস্তক নির্গত হয়। 'ধাত্রী-মা' ডলফিন, যে সর্বদা কাছে কাছেই ছিল, সে জন্মের পর মুহূর্তেই বাচ্চাকে তার নাকের ওপর তুলে নিয়ে দ্রুত জলের ওপরে ভেসে ওঠে; অক্সিজেন পাওয়া গেল। শাবকের শ্বাস নিতে আর কোন অসুবিধা হয় না। ডলফিন মাতার স্তন তার উদরে ত্বকের মধ্যে প্রোথিত। সেজন্য ডলফিন শিশু মুখ ও অধর-ওষ্ঠের সাহায্যে চুষে দুধ পান করতে পারে না। মা তার উদরের পেশী সংকোচন করে সন্তানের মুখের মধ্যে দুধ ঢুকিয়ে দেয়, কতকটা মানবী-মায়ের ঝিনুক দিয়ে দুধ খাওয়ানোর মত।

সভ্য সমাজ

সহানুভূতি, শিষ্টাচার, সেবা, সহযোগিতা যদি মানুষের সমাজে সভ্যতার পরিচায়ক বলে গণ্য হয়, তবে ডলফিন সমাজ নিঃসন্দেহে সভ্য। ডলফিনরা দল বদ্ধ হয়ে পরস্পরের সঙ্গে সহযোগিতায় সুখী সমাজে বাস করে। সমুদ্রে খাদ্য প্রচুর, তা নিয়ে ঝগড়া বিবাদ নেই, বাসস্থানের সমস্যা নেই, একজনকে বঞ্চিত করে লাভবান হওয়ার কোন সুযোগ সম্ভাবনা নেই। সমস্যা হল বড় শত্রুর হাত থেকে আত্মরক্ষা। সেজন্য প্রয়োজন নিজেদের মধ্যে একতা, সংঘবদ্ধতা, সংবাদ আদান প্রদান এবং উৎসাহের সেবাকাজে ব্রতী হওয়া। ডলফিনরা এ সব ব্যাপারেই সাফল্যের পরিচয় দেয়। নিজস্ব 'ভাষা', বিশেষ ধরনের শব্দ তরঙ্গের মাধ্যমে তারা আদেশ নির্দেশ অনুরোধ উপদেশ প্রকাশ করে। সমাজে ছোটরা বড়দের উপদেশ শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ ও পালন করে। ভব্যতার একটি নিদর্শন অপরের কথায় বাধা দিয়ে আলোচনায় ব্যাঘাত সৃষ্টি না করা। ডলফিনের ছোটরাও শিক্ষা পেয়েছে যে, 'একে যবে কথা কয়, অন্য সবে মৌন রয়।' তাই তাদের দলের মধ্যে হট্টগোল নেই, অবাধ্যতার সমস্যা নেই। অসুস্থকে সেবা করা, তার খাবার জুগিয়ে দেওয়া, তাকে জলের ওপর ভাসিয়ে রেখে সুস্থ হতে সাহায্য করা, শত্রুকে দলবদ্ধ আক্রমণে বিতাড়িত করা—এ সবই ডলফিন সমাজের উন্নত বুদ্ধি-চালিত ব্যবস্থার নিদর্শন।

মানুষের বন্ধু

প্রাচীনকাল থেকে মানুষ ডলফিনকে বন্ধু বলে জানতে পেরেছে। আধুনিক কালে ডলফিনের বুদ্ধি এবং সহযোগিতার দৃষ্টান্ত অনেক মিলেছে। ১৯40 সনে ফ্লোরিডার উপকূলে স্নান করার সময় এক মহিলা জোয়ারের টানে যখন সমুদ্রে যাচ্ছিলেন, এক ডলফিন তাঁকে তীরে পৌঁছে দিয়েছিল। বিশ্বযুদ্ধের সময়

একটি মার্কিন জঙ্গীবিমান প্রশান্ত মহাসাগরে ভেঙে পড়লে পাঁচজন বৈমানিক একটি ছোট নৌকায় আশ্রয় নেয়। অকুল সমুদ্রে নৌকা কি করে তীরে পেঁছবে? হঠাৎ দেখা গেল একটি ডলফিন তাদের নৌকা ঠেলছে। ঠেলতে ঠেলতে কয়েক দিনের মধ্যে তাদের এক ছোট্ট দ্বীপে পেঁছিয়ে দিল। সুয়েজখালে জাহাজ ডুবি হওয়ায় নিমজ্জমান মাসুদ বালি নামে এক ইনজিনিয়ারকে হাঙরের আক্রমণ থেকে রক্ষা করে এবং তাকে পিঠে করে নিরাপদে তীরে নিয়ে আসে একদল ডলফিন।

দুই দেশের পাহাড়ময় উপকূলের মাঝেকার সংকীর্ণ প্রণালী দিয়ে জাহাজ চালানোর সময় ডুবো পাহাড় থেকে নাবিকদের ভয় থাকে। কারণ ডুবো পাহাড়ের চূড়ার সঙ্গে সংঘর্ষ হলে জাহাজ রক্ষা পায় না। নিউজিল্যাণ্ডের পেলোরাস সাউণ্ড [Pelorus Sound] এই রকম বিপদসংকুল সংকীর্ণ জলপথ। ১৮৮৮ সালে এখানে অজানা বিপদের মুখে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে অপেক্ষা করার সময় এক জাহাজের ক্যাপ্টেন দেখলেন একটি ডলফিন জাহাজের ঠিক আগে আগে পাইলটের মত জলযানটিকে এপাশ ওপাশ দিয়ে ঘুরে নিয়ে যেতে চাইছে। ক্যাপ্টেন ডলফিনকে অনুসরণ করলেন এবং নিরাপদে প্রণালী পার হয়ে গেলেন। এরপর ঐ ডলফিনটি আরো অনেক জাহাজকে এইভাবে পথ দেখিয়ে পেলোরাস সাউণ্ড অতিক্রম করতে সাহায্য করে। সে তীক্ষ্ম শব্দতরঙ্গ জলের মধ্যে সৃষ্টি করে 'সোনার' [sonar] যন্ত্রের মত কোথায় ডুবো পাহাড় রয়েছে তা জেনে নিত এবং সেই অনুসারে পাহাড়মুক্ত পথ দেখিয়ে দিত। মানুষের বন্ধু এই ডলফিনটি 'পেলোরাস জ্যাক' নামে সুপরিচিত হয়। কুক প্রণালীর এই পাইলট বন্ধুকে দেখার জন্য পৃথিবীর নানা দেশের পর্যটকগণ এখানে সমবেত হতেন। ১৯১২ খৃস্টাব্দের পর 'পেলোরাস জ্যাকের' আর দেখা মেলেনি।

রিমোরা (Remora)

সাগরে যেমন ভয়ংকর জীব আছে যারা গায়ের জোরে খাবার সংগ্রহ করে, তেমনি কুঁড়ে ও চতুর প্রাণীও আছে যারা বড়দের প্রসাদ পেয়ে তুষ্ট এবং মোসায়েবের মত থাকে তাদের পাশে পাশে, শুধু পাশে পাশে নয়, একেবারে গায়ে। রিমোরা এই ধরণের বিনাটিকিটে ট্রেনের ছাদে বসে চলা যাত্রীর মত বড় প্রাণীর বুকে সওয়ার হয়ে চলার অভ্যস্ত। তার দেহের গড়ন এবং মাথার ওপরকার শোষক-যন্ত্র হয়েছে এই কাজের পক্ষে বিশেষ উপযোগী।

রিমোরার মাথার ওপর আছে শোষক [sucker] বাটি যা কোন শক্ত জিনিসের সঙ্গে চেপে ধরলে ভ্যাকুয়াম-যন্ত্রের মত সেঁটে ধরে। এর ফলে সেই বড় প্রাণীটি যখন জলের মধ্যে চলে রিমোরাও থাকে তার অঙ্গসঙ্গী হয়। মাথা আটকানো থাকে, মুখ থাকে খোলা ; ঐ ভাবে লেগে থেকেই তার খাবার খেতে অসুবিধা হয় না ; ইচ্ছা করলে বাঁধন খুলে ফেলতে অসুবিধা নেই।

প্রায় ১২ প্রজাতির রিমোরা আছে, সবাই উষ্ণ ও নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের সমুদ্রের বাসিন্দা। তিমি, শুশুক, হাঙ্গর, সামুদ্রিক কচ্ছপ ও বড় মাছের গায়ে নিজেদের আটকিয়ে এরা তাদের সঙ্গে চলাফেরা করে। যাদের আতিথ্য গ্রহণ ক'রে এরা ঘুরে বেড়ায় তাদের ভোজনকালে সাময়িকভাবে আশ্রয় ছেড়ে সাঁতার কেটে এরা ভুক্তাবশেষ সংগ্রহ করে। 'আশ্রয়' চলতে সুরু করলে তারাও আবার সওয়ার হয়ে বসে। এদের sucking disc বা শোষকবাটির বাঁধন এমন শক্ত যে, টেনে ছাড়ানো কঠিন। টানলে আরো শক্ত হয়ে পড়ে, কেবল সামনের দিকে ঠেলা দিলে বাঁধন খুলে আসে।

উষ্ণ মণ্ডলের কোন কোন স্থানের জেলেরা রিমোরাকে মাছ ধরার কাজে লাগায়। এর লেজের সঙ্গে সুতা দিয়ে বেঁধে সাগরে ছেড়ে দিলে সেটি বড় মাছ ও কচ্ছপকে আশ্রয় করে। মৎসশিকারী তখন সুতা টেনে তাদের কাছে এনে জালে আটকে ফেলে।

রিমোরাকে ডাঙায় হায়নার সঙ্গে তুলনা করা যায়। হায়না বাঘের কাছাকাছি থাকে, বাঘকে ভয় পায়, তাকে দেখলে পালায় কিন্তু তার ভোজন শেষে নিহত প্রাণীর যে হাড়গোড় পড়ে থাকে সেগুলো সে সাফ করে খায়। হায়নার সবগুলো দাঁতই মাড়ির দাঁতের মত চর্বণ দন্ত। তার পক্ষে প্রাণী হত্যা করা কঠিন কিন্তু মোটা শক্ত হাড় চূর্ণ করতে কোন অসুবিধা নেই।

রিমোরা হাঙ্গর বা অন্য বড় প্রাণীর গায়ে সেঁটে চলায় তার বিপদ কম নয়। হাঙ্গরের গায়েই সওয়ার, কিন্তু তার মুখের সামনে পড়লে রক্ষা নেই। এ যেন বাঘের পিঠে চড়ে বেড়ানো, নামলেই বাঘের পেটে। প্রাণের ঝুঁকি নিয়েও রিমোরা বড়দের সঙ্গ ছাড়ে না তবে হাঙ্গরের এই উদারতা আছে, নেহাৎ বিপন্ন না হলে সে আশ্রিত অতিথি রিমোরাকে আক্রমণ করে না।

পাইলট মাছ (Pilot Fish, Naucrates ductor)

চার-পাঁচ ইঞ্চি থেকে ১২ ইঞ্চি পর্যন্ত লম্বা, নীলাভ গায়ে পাঁচ-সাতটি গাঢ় নীল বা গোলাপী দাগ ; ভারি চটপটে সাহসী মাছ, জাহাজের নাবিকদের কাছে খুবই পরিচিত। নাম পাইলট ফিস কারণ, জাহাজ দেখলেই পাইলটদের ঝাঁক তার

পাইলট মাছ

সাথে সাথে চলবে। উদ্দেশ্য জাহাজ থেকে ফেলে দেওয়া খাদ্য সংগ্রহ। এদের দেখা যাবে বড় মাছ, বিশেষ করে হাঙ্গরের নাকের ডগার কাছে। মনে হবে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলেছে শিকারের সন্ধানে। এতে এদের লাভ আছে। লাভ হল 'প্রভুর' ভোজন শেষে যা অবশিষ্ট থাকে সেই প্রসাদকণিকা। রিমোরার মত পাইলট ফিসকেও হাঙ্গর স্নেহ ও অনুকম্পার চোখেই দেখে থাকে।
পাইলট-ফিস গভীর সমুদ্রে ডিম পাড়ে। উষ্ণ ও নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলের সমুদ্রে ও ভূমধ্যসাগরে এদের অধিক সংখ্যায় দেখা যায়।

সাগর ভালুক (Sea Bear]

ডাঙায় হাতি, ঘোড়া, বাঘ, ভাল্লুক, সিংহ আছে। সমুদ্রেও আছে? আমরা জানি ঐ নামের প্রাণী সাগরেও রয়েছে, যদিও জলে বাস করতে হয় বলে তাদের গড়ন ও স্বভাবে পরিবর্তন ঘটেছে। সাগর ভালুক বা সাগর সিংহকে পৃথিবীর সব সমুদ্রে দেখা যাবে না। এদের বাসভূমি শীতল সাগর অঞ্চল। তাদের বিচরণ ক্ষেত্রে গেলে এই অদ্ভুত আকারের জীবদের প্রকৃতি ও জীবনযাত্রার পরিচয় মিলবে।
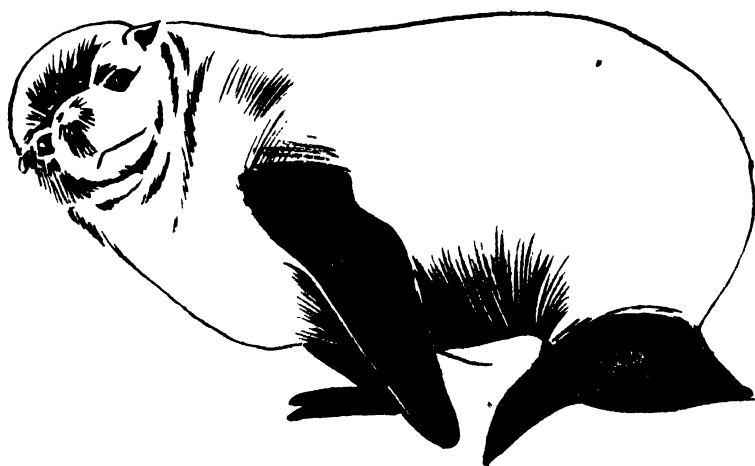
সাগর ভালুক [Sea Bear]

* বসন্ত যাপন

উত্তরের তুষার সাগর অঞ্চল। একদিকে আমেরিকার প্রান্তদেশ অন্য দিকে সাইবেরিয়া—এর মধ্যে বেরিং প্রণালী এশিয়া ও আমেরিকা মহাদেশকে পৃথক করছে। এখানে আছে প্রিবিলফ দ্বীপসমষ্টি। ঠাণ্ডা, বৃক্ষলতাহীন, তৃণহীন নির্জন পাষাণময় ভূখণ্ড। যতদূর চোখ যায়, কেবল জনপ্রাণীবর্জিত পাথর ঢাকা ভূমি। সাগরের তরঙ্গ দিনরাত্রি তার বেলাভূমিতে আছড়ে পড়ে। বসন্তকালেও সেখানে দেখা যায় কুয়াশার ভাসমান স্তর, শোনা যায় বায়ুর কাতর গোঙানি আর কামান গর্জনের মত বরফস্তূপ ভেঙে পড়ার প্রচণ্ড আওয়াজ।

বসন্তকাল যতই এগিয়ে চলে দ্বীপের পরিবেশে পরিবর্তন হতে থাকে। নির্জন দ্বীপ নতুন ধরণের প্রাণীদের আগমনে কলরব-মুখরিত হয়ে ওঠে। নবাগতরা সাঁতরিয়ে এসে তীরে উঠে কোলাহল ও নিজেদের মধ্যে কলহ ও ধস্তাধস্তিতে স্থানটি সরগরম করে তোলে। এরা পুরুষ সাগর-ভালুক, দ্বীপের ভূমিতে সাময়িক আস্তানা স্থাপন করে সেখানে সংসার পাতবে। কে কোন্ ভাল জায়গাটা দখল করবে তাই নিয়ে ঠেলাঠেলি, হুংকার কামড়াকামড়ি। সাগরের কাছাকাছি সমতল স্থান সকলেই চায়। যার গায়ের জোর বেশি, সেই উত্তম স্থানটি দখলে রাখে, তবে দখল স্থায়ী রাখার জন্য তাকে সদা সতর্ক থাকতে হয়। নতুন নতুন পুরুষ ভালুকের দল এসে বেদখল করতে চায়। সবাই যখন মোটামুটি নিজ নিজ এলাকা নিয়ে কায়েম হয়েছে, এমন সময় আসে

মহিলা ভালুকের দল। দলে শুধুই বয়স্কা ভালুকীরা। তখন সুরু হয় স্বয়ম্বর—পত্নী-অপহরণের কলহ।
বলিষ্ঠ পুরুষেরা যতগুলি সম্ভব স্ত্রী সংগ্রহের চেষ্টায় অন্য প্রতিযোগীদের সঙ্গে দ্বন্দ্বযুদ্ধ আরম্ভ করে। মহিলারা বিশেষ কোন পক্ষ অবলম্বন করে না কিন্তু তাই বলে তাদের দুর্ভোগ কম হয় না। একজন হয়ত এক কন্যার ঘাড় কামড়ে ধরে টানতে টানতে নিজের শিবিরে এনে রেখে অন্য একটিকে ধরতে গেছে। ইতিমধ্যে অন্য এক প্রার্থী এসে তাকে সরিয়ে নিয়ে গেছে অন্য সংসারে। এইভাবে কয়েকদিন গৃহস্থালি পাতার সংগ্রামের পর দেখা যায়, বলবানেরা কেউ কেউ ৫।৭টি স্ত্রী দখল করে নিয়েছে, তরুণদের ভাগে কারো একটি, কারো কারো একটিও না।

বয়স্ক তরুণরা যখন এই হৈ-হুল্লোড়-হাঙ্গামায় লিপ্ত, কিশোররা দল বেঁধে দ্বীপের অন্য এক কোণায় নিজেদের মধ্যে খেলা আর সাগরে ঝাঁপাঝাঁপিতে আনন্দে সময় কাটায়। সংসার গড়ে তোলার দিকে তাদের আগ্রহ নেই। তাদের বয়স তখন ২ থেকে ৫।৬ বছর।

এদিকে বয়স্ক ভালুকদের উপনিবেশে শান্তি বিরাজ করেছে। নিজেদের মধ্যে কলহ গর্জন নেই ; শুধু শোনা যাবে অন্য রকম শব্দ। প্রতিটি মা-ভালুকীর একটি করে বাচ্চা হয়েছে, তাদের অদ্ভুত ম্যাঁ-ম্যাঁ আওয়াজ। সমগ্র অঞ্চলে হাজার হাজার ভালুকশিশুর ডাক, যেন সারা দ্বীপটাই শিশুদের নার্সারি। মে মাস থেকে অক্টোবর পর্যন্ত এখানে ভালুকদের বসন্তযাপন। নভেম্বরেই দ্বীপ ফাঁকা করে সবাই সমুদ্রে নেমে পড়ে, শিশুরাও চলে তাদের মায়েদের সঙ্গে।
দ্বীপে আসার পর থেকে বয়স্ক পুরুষেরা একবারও জলে নামেনি, কাজেই এ কয়মাস নির্জলা উপবাস! কী করে এত দীর্ঘদিন এরা অনাহারে থাকতে পারে জীববিজ্ঞানীদের কাছে তার রহস্য অনুদ্ঘাটিত। এদের দেহে যে প্রচুর পরিমাণে চর্বি জমা ছিল তাতেই জীবন ধারণ সম্ভব হয়েছে। তবে তারা শীর্ণ ও দুর্বল হয়ে পড়ে। কিন্তু জলে নেমে প্রচুর খাদ্য সদ্ব্যবহার করার ফলে অল্পদিনের মধ্যেই এরা আবার হৃষ্টপুষ্ট হয়ে ওঠে। মাছ, কাটল্‌ফিস এবং স্কুইড এদের প্রধান খাদ্য।
সাগর-ভালুকেরা মাস পাঁচেকের জন্য ডাঙায় আসে, বছরের অর্ধেকের বেশির ভাগ কাটে মহাসমুদ্রে, ডাঙা স্পর্শমাত্র না ক'রে। অর্ধেক-ডাঙা অর্ধেক-জলের জীব, কোথায় এদের বিশ্রাম? কোথায় নিদ্রা? সন্তানদের নার্সিং হোম না হয় হল নির্জন শীতল দ্বীপ কিন্তু দেড়মাস দুমাস বয়সের শিশুরা যখন দলের সঙ্গে সমুদ্রযাত্রা করল, তাদের অবস্থা কী? সাগর-ভালুক শিশুরা ইচড়ে পাকা সন্তান। জন্মের পর থেকেই তারা স্বাবলম্বী, কেবল সাঁতার শিখতে

হয়, এই যা ! প্রথম প্রথম জলে নামতে ভয় পায়। মা জলে ঝাঁপ দিয়ে দেখায় কেমন করে সাঁতার দিতে হয়। কিন্তু ভারি মাথাটাকে জলের ওপর উঁচু ক'রে রাখা কঠিন হয়, মাথা ডুবিয়ে দিয়ে লেজের দিকের জোড়া পাতা-পাখনা শূন্যে তুলে চলতে চেষ্টা করে ! মা কয়েকবার ধমক দিয়ে সোজা ক'রে দেয়। দু-একবার চেষ্টার পর কৌশল আয়ত্ত হয়ে গেলে ছোটরাও হয় চ্যাম্পিয়ান সাঁতারু। জলে খাবার মেলে, জলে বিশ্রাম, ঢেউ-এর দোলায় চিৎ হয়ে শুয়ে ভেসে ভেসে ঘুম। সাগর-ভালুকেরা যখন সমুদ্রে থাকে, তখন একান্তভাবেই সমুদ্রের বাসিন্দা। জলে এদের যেমন খাদ্য আছে, তেমনি শত্রুও আছে। এদের প্রধান শত্রু ঘাতক তিমি [Killer whale]। মেরু সাগরে এই তিমিরা নেকড়ের মত দল বেঁধে শিকার করে। ভালুকদের সাঁতার কাটতে দেখলে ডুব দিয়ে অতর্কিতে এদের কাছে এসে উপস্থিত হয়। এরা যদি ভাসমান বরফস্তূপের ওপর উঠে আশ্রয় নেয়, চতুর ঘাতকেরা বরফের চাঁই উলটিয়ে দিয়ে এদের ধ'রে ফেলে।

রাডিয়ার্ড কিপলিং 'Jungle Book'-এ সাগর-ভালুকের সন্তানদের কথা লিখেছেন। তাদের কি সমস্যা, তাদের মা তাদের কেমন শিক্ষা দেয়, সমুদ্র-সংসারে তাদের কেমন ক'রে চলতে হবে—এসব কথা মা যেন ভাল ক'রে বুঝিয়ে দিচ্ছে। মা তার ছেলেমেয়েদের যেন ডেকে বলে—

দেড় হপ্তা বয়স হবার আগে
সাঁতার কেটো না ;
মাথা তখন তলায় যাবে
শূন্যে যাবে পা !
গরমকালের ঝড়ো হাওয়া
ঘাতক তিমির দল
এরাই কিন্তু বিপদ আনে,
ভুললে বিষম ফল।
জলে ঝাঁপাও, বেড়ে ওঠ
পুষ্ট করো গা,
সাগর তোমার বসত-ভবন
সাগর তোমার মা।

ফার সীল (Fur-seal)

ফার-সীলের চেহারা অদ্ভুত। সামনের পা দুখানা জলে দাঁড় টেনে চলার উপযোগী, পিছনের পায়ের পাতা লম্বা, চ্যাপ্টা, ডাঙায় চলার পক্ষে মোটেই উপযুক্ত নয়। জলে সাবলীল গতি কিন্তু ডাঙায় এদের চলতে হয় সামনের পায়ে ভর রেখে পিছনের পা দিয়ে মাটি ঠেলে ঠেলে। সীলদের পুরুষের তুলনায় স্ত্রীর আকার ছোট। কতক পুরুষ দেখতে সিংহের মত, গলায় উজ্জ্বল চকচকে কেশরের মত পশম, দীর্ঘ গোঁফ, উজ্জ্বল চোখ, ঝকঝকে দাঁত। সিংহের মত দেখতে হলেও এরা হিংস্র নয়। লম্বায় ৮।৯ ফুট পর্যন্ত হয়।

জীবজন্তুপ্রেমিক জেরাল্ড ডুরেল ফার-সীলদের দেখতে দক্ষিণ আমেরিকার শেষ-প্রান্তে তাদের উপনিবেশে উপস্থিত হয়েছিলেন। **The Whispering Land** বইতে

ফার-সীল

সীল এবং আরো অনেক প্রাণীর উপভোগ্য বিবরণ দিয়েছেন। ফার-সীল সম্বন্ধে ডুরেল লিখেছেন—

যে নিচু শৈলচূড়া থেকে সীলদের দেখা যাবে তার কাছাকাছি যেতেই চিৎকার, গর্জন, ম্যাঁ-ম্যাঁ শব্দ, হুংকার ধ্বনি সব মিলিয়ে এমন এক অদ্ভুত খিচুড়ি শব্দ সৃষ্টি করল, মনে হল যেন এক বিরাট কড়াইতে হালুয়া রান্না করা হচ্ছে। উপনিবেশে সাতশোর মত প্রাণী, সমুদ্রতীরে ১০।১২ টি গায়ে গায়ে লাগিয়ে টানা লাইনে শুয়ে রয়েছে। এমন ঘন সন্নিবিষ্ট যে, তারা যখন নড়াচড়া করে এদিক-ওদিক যাচ্ছিল, সূর্যালোকে তাদের সোনালি দেহ ঝিকমিক করছিল, মনে হচ্ছিল যেন চঞ্চল মৌমাছির ঝাঁক।

বয়স্ক পুরুষ সীলগুলির বিরাট দেহ প্রথমেই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করল। আমি এ পর্যন্ত যত জীব দেখেছি তার মধ্যে এরা সবচেয়ে গর্বিত এবং অসাধারণ-দর্শন। আকাশের দিকে মুখ তুলে তারা বসে ছিল। তাদের লোমবহুল গলা পিছনে হেলে পড়েছে, ভাঁজে ভাঁজে চর্বি; থ্যাবড়া নাক, ফোলা-ফোলা মুখ উদ্ধতভাবে শূন্যপানে তোলা। তাদের দেহের গড়ন মুষ্টিযোদ্ধার মত, কাঁধে স্ফীত মাংসপেশী ক্রমে সরু হয়ে পিছন দিকে চলে গেছে এবং অসমঞ্জসভাবে এমন একজোড়া প্রত্যঙ্গে গিয়ে শেষ হয়েছে যা নেহাৎ হাস্যকর। পায়ের নখগুলি সরু লম্বা এবং জোড়া লাগানো। মনে হবে সীল যেন ডুবুরির ব্যাঙের পায়ের মত পা নিজ অঙ্গে লাগিয়ে নিয়েছে।

ওরা যখন হাঁটছিল প্রকাণ্ড ব্যাঙ-পা দেহের দুই পাশে বেরিয়ে ছিল। চলনটা ছিল ভারি কৌতুককর। গায়ের রঙ চকোলেট থেকে ফ্যাকাশে বিস্কুটবর্ণ। স্ত্রীরা ছিল আকারে পুরুষের চেয়ে অনেক ছোট, রঙ রুপালি মসৃণ কোটের ওপর সোনার ছোঁয়া। স্বামীরা দৈত্যসদৃশ, স্ত্রীরা তন্বী প্রেমিকা; তাদের মুখ সুন্দর সুচালো, চোখের মণি নির্মল জলের মত টলটলে। তারা নারীরত্নের প্রতিমূর্তি, সুন্দরী, লাবণ্যময়ী। তারা মনে হচ্ছিল স্বর্গের অপ্সরা।

আমি স্থির করলাম, এই পৃথিবীতে যদি জীব হয়ে জন্মগ্রহণের সুযোগ পাই আমি ফার-সীল হব যাতে আমি এই রকম অপূর্ব পত্নী লাভ করতে পারি।'

ডুরেল ফার-সীলদের বাচ্চাকে সাঁতার শেখানর কসরৎ লক্ষ্য করেছেন। শিশু শিক্ষার যে বিবরণ তিনি দিয়েছেন তা, আগের যুগের পণ্ডিতমশায়দের শিক্ষা-পদ্ধতির কথা মনে করিয়ে দেবে। এক সময়ে ধারণা ছিল, চাবুক আর পুঁথি দুই-ই সশব্দে ব্যবহার করতে হবে তবেই ছোটদের মনে জ্ঞানবৃক্ষ অংকুরিত হওয়ার সম্ভাবনা। সীল-শিশুর সাঁতার শেখার পাঠ কিভাবে চলে তা ডুরেলের কথায়—একটা পুরুষ সীল ছোট বাচ্চাকে ঘাড় কামড়ে ধ'রে জলের মধ্যে খানিক দূরে নিয়ে ২০ ফুট দূরে ছুঁড়ে দিল। বাচ্চাটি প্রথমে ডুবে গেল, খানিক পরে ভেসে উঠে হাবুডুবু করতে করতে কাছে আসতেই সে বাবার হাতে পড়ল। তাকে ৫ থেকে ১০ সেকেণ্ড জলের নিচে ডুবিয়ে রেখে তুলতেই সে দম ফেলার

জন্য হাসফাঁস করতে লাগল কিন্তু সাঁতারে ট্রেনিং তাকে নিতেই হবে। আবার আগের মত ঘাড়ে ঝাঁকানি আর দূরে নিক্ষেপ। এই রকম চলল পনর মিনিট। বাচ্চাটি যখন শ্রান্ত হয়ে মৃতপ্রায়, তখন সাঁতার শিক্ষক তাকে ডাঙার কাছে অল্প-জলে এনে বসিয়ে কাছেই দাঁড়িয়ে রইল। বিশ্রাম নিয়ে আবার সুরু হবে প্র্যাকটিস্। বেচারি বাচ্চা রেহাই পেলে বাঁচে কিন্তু ট্রেনার নাছোড়বান্দা! অবশেষে অন্য একটি পুরুষ এর সঙ্গে লড়াই করতে এলে শিশু-সীল জল থেকে পালিয়ে রেহাই পেল।

হাতি সীল (Elephant Seal)

স্থলের হাতির সঙ্গে সাগরের হাতি-সীলের দৈহিক সাদৃশ্য কিছু নেই। হাতি আখ্যা দেওয়া হয়েছে এদের বিশাল বপুর জন্য। সাগর-ভালুক বলা হয় এদের ভালুকের মত গায়ের লোমের জন্য, সাগর-সিংহ বলা হয় পুরুষ সীলের সিংহের

হাতি সীল (**Elephant Seal**)

কেশরের মত লোমে-ঢাকা বলিষ্ঠ গর্দানের জন্য। এরা ভালুক বা সিংহের মত মাংসাশী হিংস্র প্রাণী নয়, নেহাৎ নিরীহ সামাজিক জীব।

হাতি-সীলদের আস্তানা দক্ষিণ আমেরিকার প্যাটাগোনিয়ার সমুদ্রকূলে গিয়ে জেরাল্ড ডুরেল তাদের পর্যবেক্ষণ করেছিলেন। হাতি-সীলেরা অধিকাংশ সময় গভীর নিদ্রায় কাটায়। বালি-পাথর মেশানো তীরভূমিতে অনেকে একসঙ্গে নিশ্চল পাথর স্তূপের মত নিদ্রামগ্ন থাকে।

* ডুরেলের বর্ণনা ঃ

নাসিকাধ্বনিসহ নিদ্রিত, বিশালদেহ সীলদের মধ্যে আমরা ঘুরে বেড়ালাম এবং হিসাব করে দেখলাম , বারোটি প্রাণীর মধ্যে ৩টি পুরুষ, ৬টি স্ত্রী এবং ৩ টি বড়সড় শিশু। শিশুরা লম্বা ৬ ফুট, স্ত্রীরা ১২ ফুট থেকে ১৪ ফুট। ৩ টি পুরুষের মধ্যে ২ টি ১৮ ফুট করে, ১ টি পূর্ণ বয়স্ক ষণ্ড লম্বায় ২১ ফুট।··· আমরা ফটো নেওয়ার জন্য ওদের কাছে ৩।৪ ফুটের মধ্যে গেলে তারা নড়াচড়া পর্যন্ত করল না, কেবল চোখ মেলে ঘুম-ঘুম চোখে আমাদের দেখে নিয়ে আবার ঘুমিয়ে পড়ল।

Fur-seal এবং **Elephant seal**-দের পার্থক্য সম্বন্ধে ডুরেল লিখেছেন ঃ

ফার-সীল (যা আসলে সী-লায়ন) এলিফ্যাণ্ট সীলদের থেকে অঙ্গের গড়নে পৃথক। ফার-সীলদের পিছনের অঙ্গ পায়ের মত গঠিত ; কাজেই ডাঙায় চলার সময় এরা কতকটা কুকুর বা বিড়ালের মত পা ফেলে। কিন্তু হাতি সীলের পিছনের পা ক্ষুদ্র এবং প্রায় অকেজো। লেজের দিকে ছোট দুটি পাখনা দেখে মনে হয় পিছন দিকে দুটি খালি দস্তানা আটকানো রয়েছে। ডাঙার ওপর চলার সময় সামনের দুখানা পাখনার মত পায়ে ভর করে পিছনের অংশ দিয়ে ঠেলে কোনরকমে এগিয়ে চলে, দেখতে মনে কষ্ট লাগে।

সমুদ্র এদের লীলাক্ষেত্র।

ওয়ালরাস (Walrus)

সামুদ্রিক জীবের মধ্যে ওয়ালরাসের চেহারা অদ্ভুত। হঠাৎ দেখলে জলচর প্রাণী বলে বোধ হবে না, মনে হবে লুপ্ত-হয়ে-যাওয়া খড়্গদন্তী বাঘ অতীত যুগ থেকে বর্তমানে এসে হাজির হয়েছে বুঝি। লম্বায় ১০।১১ ফুট, শক্ত সমর্থ গড়ন। এদের বৈশিষ্ট্য, স্ত্রী পুরুষ উভয়েরই ওপরের কুকুর-দাঁত দুটি গজদন্তের মত নিচের দিকে বেরিয়ে আসে, লম্বা হয় প্রায় ২ ফুট। মাথা ছোট, ক্ষুদ্র চোখ, বাইরে কান নেই। মুখে খোঁচা খোঁচা গোঁফ-চুল। লেজ আছে, তবে খুবই ছোট, চামড়ার বাইরে আছে বলেই মনে হয় না। সামনের পা দুটি খাটো, কনুই-এর পর থেকে মুক্ত, চ্যাপ্টা জোড়া লাগানো, জলে চলায় দাঁড়ের কাজ করে। পিছনের পা আরো খাটো, চ্যাপ্টা ও চওড়া। সারা গায়ে কর্কশ লোম। এদের বয়স বাড়ার সঙ্গে চুলগুলি কমে যায়, চামড়া হয় মসৃণ, ভাঁজযুক্ত।

ওয়ালরাস উত্তরমেরু অঞ্চলের স্থলভাগের কাছাকাছি ছোট ছোট দলে বাস করে। কখনো কখনো দেখা যাবে, ভাসমান বরফের স্তূপের ওপর উঠে আরাম করে
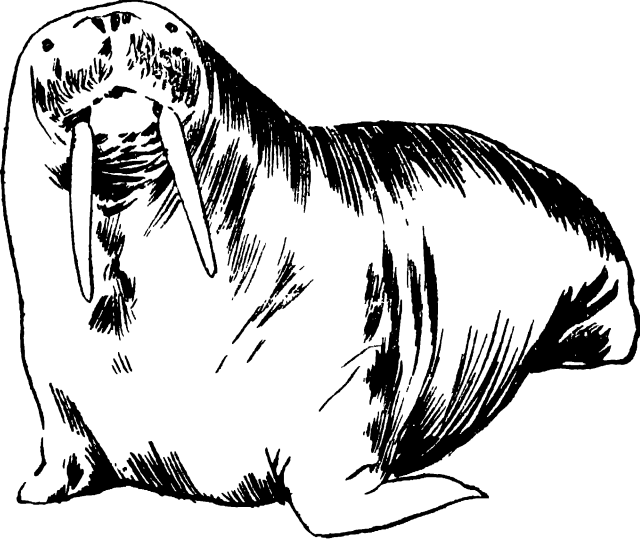
ওয়ালরাস

শুয়ে আছে। প্রধান খাদ্য ঝিনুক-শামুক জাতীয় জীব; ডুব দিয়ে সাগরের তলা থেকে লম্বা দাঁত দিয়ে মাটি খুঁড়ে বের করে।

ওয়ালরাস দেখতে ভীষণ হলেও এরা শান্ত নিরীহ জীব, সহসা কাউকে আক্রমণ করে না, তবে বিপন্ন হলে লম্বা দাঁত মারাত্মক অস্ত্ররূপে ব্যবহার করে। ওয়ালরাসের প্রধান শত্রু মেরুভালুক ও মানুষ। ডাঙায় বা বরফস্তূপের ওপর বিশ্রাম করার সময় এরা মেরুভালুকের কবলে পড়ে। সাদা লোমে আবৃত দেহ মেরুভালুক তুষার ঢাকা তৃণলতাহীন অঞ্চলে চুপি চুপি এগিয়ে এলে ওয়ালরাস অনেক সময় লক্ষ্য করতে পারে না। হিংস্র এবং শক্তিশালী মেরুভালুক একবার এদের ধরতে পারলে আর নিস্তার নেই।

এস্কিমোরা ওয়ালরাস শিকার করে এদের চামড়া, চর্বি ও মাংসের জন্য। জলের ধারে ডাঙার ওপর থাকলে চুপিসারে কাছে গিয়ে হার্পুনবল্লম দিয়ে বিঁধে ফেলে। শীতকালে সারা মেরুঅঞ্চল যখন বরফে জমাট হয়ে যায়, ওয়ালরাস বরফের নিচে জলের মধ্যে আশ্রয় নেয়। নিশ্বাস নেবার জন্য বরফের মাঝে মাঝে যে ফুটো বা ফাটল থাকে সেখানে মুখ বের ক'রে দেয়। এস্কিমোরা ঐ সুড়ঙ্গের কাছে বল্লম

নিয়ে জলের দিকে চেয়ে ব'সে থাকে। ৫।১০ মিনিট পর পর বাতাস নেবার জন্য ওয়ালরাসকে জলের ওপর মুখ তুলতেই হয়। ঐ সময় দেখামাত্র তার মুখে বঁড়শির মত হার্পুন বিঁধিয়ে তাকে আটকিয়ে ফেলে। মেরুভালুকও ফাটলের ভিতর থেকে ওয়ালরাস শিকারের কায়দা জানে। সুড়ঙ্গের ধারে ওৎ পেতে থাকে, দেখামাত্র জলে ঝাঁপিয়ে মুখ কামড়ে ধরে।

* নুড়ি-পাথর কি খাদ্য ?

সীলগোষ্ঠীর সব প্রাণীর একটা অদ্ভুত স্বভাব দেখা যায়। এরা নুড়ি-পাথর খায়। পাকস্থলীতে পাথর রাখে খাদ্য পরিপাকের সহায়তার জন্য ? জলে তাড়াতাড়ি ডুবতে ভারি বস্তু সহায়ক হয় বলে ? না, স্বাভাবিক খাদ্য সংগ্রহ করার সময় আকস্মিক ভাবে ওগুলি পাকস্থলিতে চলে যায় ? এ সম্বন্ধে সঠিক কিছু বলা যায় না। অনুসন্ধিৎসুর চোখ নিয়ে দেখলে প্রকৃতির রাজ্যে বিস্ময়ের অন্ত নেই।

অজানা দানব

শিশুরা প্রথমভাগে পড়ে 'আলো হয়, গেল ভয়'। যখন সবকিছু স্পষ্ট দেখা যায় তখন ভয় থাকে না ; অন্ধকারে সর্বত্র দৃষ্টি চলে না বলে মানুষের মনে অজানার আশংকা উঁকিঝুঁকি দেয়। সমুদ্রের বিশাল বিস্তার যেমন মানুষের বিস্ময় জাগায় তেমনি এর গভীর তলদেশে কত কি ভয়ংকর জানোয়ার লুকিয়ে আছে, এই চিন্তা যারা সমুদ্র জাহাজ চালাত তাদের মনে বাসা বেঁধেছিল। কখনও নাবিকেরা বিপন্ন হয়েছে, কখনও বা বিপদের কথা অতিরঞ্জিত হয়ে অন্যদের কাছে পেঁৗচেছে। প্রাচীনকালের সাহিত্যেও ভয়ংকর জীবের সঙ্গে সমুদ্রের প্রায় যাবতীয় প্রাণীর পরিচয় সংগ্রহ করা হয়েছে, তবু জীবন বিকাশের আদিম ক্ষেত্র সামুদ্রিক জলমণ্ডলের গভীরে আরো কত বিচিত্র জীব লোকচক্ষুর অগোচরে রয়ে গেছে কিনা কে বলতে পারে ! পূর্বে জানা যায়নি এমন জীবের সন্ধানও তো মাঝে মাঝে পাওয়া যায় !

কিছুকাল আগে সাগরে এক রহস্যজনক ঘটনা ঘটেছিল। কেন, কিভাবে তা ঘটে সে তথ্য জানার আর কোন উপায় নেই। শুধু পারিপার্শ্বিক অবস্থা থেকে অনুমান করা চলে।

নানাজনে নানা অনুমান ব্যক্ত করেছেন, কারোটা সম্ভবযোগ্য, কারোটা ভুতুড়ে বলে মনে হবে। উইলিয়ম আউটারসন এই রহস্যজনক ঘটনা ভিত্তি করে Fire

in the Galley Stove নামে যে কাহিনী লিখেছেন তাতে সাগরের অদ্ভুত
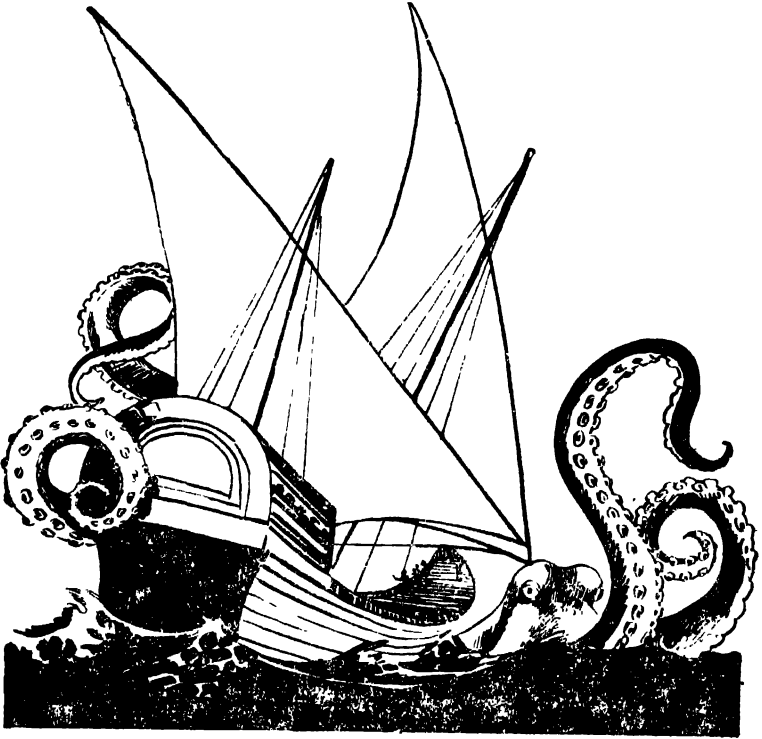
জাহাজের মানুষ শিকারে তৎপর ভয়ংকর অক্টোপাসের দল

জীবের কবলে পড়লে নাবিকদের কি দশা হতে পারে, তার রক্ত-হিমকরা বিবরণ পাঠককে অভিভূত করে রাখে।

* ঘটনাটা হল ঃ

এখন থেকে একশো বছরের কিছু আগে 'মেরি সেলেস্টি (Marie Celeste) নামে একখানা কাঠের পালতোলা একতলা জাহাজকে অ্যাজোরিস দ্বীপপুঞ্জের কাছে উদ্দেশ্যহীনভাবে ইতস্তত চলতে দেখা যায়। ব্যাপার কী, দেখার জন্য অন্য একখানা জাহাজের নাবিকেরা যখন তাতে উঠল, তখন প্রথম রহস্যের সন্ধান পাওয়া গেল। আজ পর্যন্ত এর সঠিক সমাধান হয়নি। জাহাজের খোল, নাবিকদের শোবার ঘর যেমন পরিপাটি থাকার কথা তেমনি রয়েছে, লগ বইতে (**Log Book**) শেষ লেখা ২৫ নভেম্বর, ১৮৭২ তারিখে। তাতে

জাহাজে কোন অসুবিধার ইঙ্গিত নেই। জাহাজের ক্যাপ্টেন বা নাবিক, খালাসি কোথাও কারো চিহ্ন নেই। পাটাতনের দরজা খোলা, কম্পাসটি চূর্ণবিচূর্ণ, হাল ঢিলা হয়ে রয়েছে।

জাহাজের লোকেরা কোথায় গেল? জলদস্যুর হাতে পড়েনি, কারণ লুঠপাটের কোন চিহ্ন নেই, সব জিনিস যেমন থাকে তেমন রয়েছে; ঝড়-ঝাপটের কোন ব্যাপার নয়; নাবিক, ক্যাপ্টেন, খালাসি, পাচক, ডাক্তার সবাই কি একসঙ্গে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করেছে? জাহাজ ভুতুড়ে হয়ে গেল কেমন করে?

এই রহস্য উদঘাটন করার চেষ্টা করেছেন আউটারসন তাঁর উপন্যাসের কাহিনীর ভিতর দিয়ে।

আউটারসন তাঁর জাহাজের নাম দিয়েছেন ইউনিকর্ণ (**Unicorn**)। জাহাজ চলছিল, নাবিকদের কাছে বিপদের আভাষ রূপে এল একটা মৃদু ধাক্কা। জাহাজের তলায় কিছু ঠেকেছে। এর পরই বানের উচ্ছ্বাসের মত জল স্ফীত হয়ে জাহাজের পাটাতন প্লাবিত করে চলে গেল। হঠাৎ হালখানা অনড় জমাট হয়ে গেল, কিছু যেন হালের কাঠখানা চেপে ধরেছে। ব্যাপার কী? দেখার জন্য ক্যাপ্টেন ও সহকারী জাহাজের পিছন দিকে উঁচু স্থানটিতে দাঁড়িয়ে জলের দিকে লক্ষ্য করতে লাগলেন! কিন্তু কিছু তো দেখা যায় না! ক্যাপ্টেন বিড়বিড় করে বলেন, যদি দেখতে পেতাম কারা এমন করছে তবে কি করা যায় ঠিক করতাম। কিন্তু অজানা, অদেখা জিনিসের সঙ্গে লড়াই করি কেমন করে!

চিন্তায় কুঞ্চিত ললাট, হাত একবার মুঠি করেন আর খোলেন; অধীরভাবে পাটাতনের উঁচু সংকীর্ণ অংশটির ওপর ক্যাপ্টেন পদচারণা করতে লাগলেন।

ক্যাপ্টেন মিঃ মারগাম পাচকের ঘণ্টাধ্বনি শুনতে পেয়ে সামনের দিকে তাকালেন। নাবিকেরা জাহাজের সামনের দিকে কফি নেবার জন্য পাচকের ঘরের কাছে সমবেত হয়ে নিজ নিজ পালার জন্য অপেক্ষা করছে। প্রথম লোকটি কফি নিয়ে সামনের পাটাতনের ওপর বসে মৌজ করে খাবার জন্য ঐদিকে এগিয়ে গেল। রেলিং-এর ওপর দিয়ে তার মাথার ওপর লম্বা সরু একটা আঁকড়ের মত কর্ষিজা কিছু ধরার জন্য এদিক-ওদিক এঁকেবেঁকে হাত বাড়াচ্ছিল। নাবিকটি তা দেখতে পায়নি।

চার্লি কফি নিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে কেবিনের আড়ালে পড়ায় অন্যদের দৃষ্টির বাইরে চলে গেল। ঐ সময় সরু শুঁড়ের মত কর্ষিকাটি তার গলা এমনভাবে পেঁচিয়ে ধরল যে, গলা দিয়ে কোন আওয়াজ বের হল না। তাকে রেলিং-এর ওপর দিয়ে জোর করে টেনে নিয়ে গেল। চার্লির পরই যে লোকটি কফি নিয়ে গেল, সে দেখে চার্লি কফির মগ দিয়ে মরিয়া হয়ে কর্ষিকাটিকে আঘাত

করছে। চিৎকার করে লোকটি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করল। সবাই ছুটে এল রেলিং-এর ধারে, দেখল কফির মগ শূন্যে দোলাতে দোলাতে চার্লি মাথা নিচের দিকে করে জলের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ল। একটু দেরিতে আসার দরুণ চার্লির গলায় আটকানো কর্ষিকার প্যাঁচ তাদের নজরে পড়েনি। তারা ছুটে রেলিং-এর কাছে গিয়ে নিচের ঘোলা জলের দিকে চেয়ে রইল কিন্তু যে লোকটি ঐ কর্ষিকা দেখেছিল সে রেলিং-এর ধারে গেল না। সে জানত, ঐ কর্ষিকা বস্তুটি কোন জন্তুর।

লোকেরা হয়ত সারাজীবন জাহাজে করে নানা সাগরে ঘুরে বেড়াতে পারে কিন্তু সাগরতলের পাহাড়ের গুহায় বা শিখরে কিংবা সমুদ্র তলদেশে যেসব দুঃস্বপ্নস্বরূপ অতিকায় দানব বাস করে, তাদের দেখা নাও পেতে পারে। **Unicorn** জাহাজের লোকেরা রেলিং-এর ওপর ঝুঁকে পড়ে ঈষৎ ঘোলা জলে দেখতে পেল বিরাট সাপের মত তালগোল পাকানো অনেকগুলো কর্ষিকা-শুঁড় —মোটা, লম্বা, আগার দিকে ক্রমে শুরু হয়ে সেগুলোর আকার হয়েছে মানুষেয় বুড়ো আঙুলের মত। দেখলেই গায়ের মধ্যে ঘিন্ ঘিন্ করে। সাগরের অন্ধকার জগৎ থেকে উঠে এসেছে, যেখানে ক্ষুধাই সব জীবের জীবন-কর্মের একমাত্র প্রেরণা। যেখানে জলের মধ্যে জাহাজের হাল ডোবানো, সেখানে দেখা গেল বিকটাকার এক মুখ, তাতে পলকহীন চোখ। প্রকাণ্ড টিয়াপাখির ঠোঁটের মত ঠোঁট একবার অল্প খুলছে, একবার বন্ধ হচ্ছে, মনে হয় কিছুক্ষণ আগেই উষ্ণ মাংস চিবিয়ে খেয়েছে, তার স্বাদ লেগে রয়েছে মুখে। কাছাকাছি জলের রঙ লালচে হয়েছে। সম্ভবত চার্লির রক্ত ওখানে মিশেছে জলের সঙ্গে। জাহাজের নিচে এই রকম অনেকগুলো ক্ষুধার্ত দৈত্য জগা হয়েছিল। তারা এখন বুঝতে পেরেছিল, জাহাজের ওপর তাদের খাদ্য রয়েছে —এ খাদ্য পুচ্কেদেহ মানুষ, যাদের ভোজন করার জন্য কেবল ধরে আনলেই হয়।

যে লোকেরা চৌকি দিচ্ছিল তারা হঠাৎ দেখল, রেলিং-এর ওপর জীবন্ত শুঁড় ছেয়ে গেছে। এগুলো দু-এক সেকেণ্ডে ইতস্ততভাবে এদিক-ওদিক শিকারের সন্ধানে ঘুরল তারপর ভীত সন্ত্রস্ত লোকেদের ওপর নিশ্চিত লক্ষ্য গিয়ে পড়ল। চারদিকে প্যাঁচ দিয়ে ভাইসের মত এঁটে ধরল। কোন মানুষের সাধ্য নেই এ বাঁধন খুলতে পারে, কেবল ধারালো ছুরি ঠিকমত চালাতে পারলে দুইখণ্ড করে কেটে ফেলা যায়, অন্য কিছুতে নয়। আতঙ্কগ্রস্ত লোকেরা চাকু, কফির মগ যার হাতে যা ছিল তাই দিয়ে পাগলের মত আঘাত করতে লাগল কিন্তু উত্তেজনার মধ্যে কর্ষিকা কেটে নিজেদের মুক্ত করতে পারল না। তারা চিৎকার করতে থাকল কিন্তু সাগরদৈত্যের নিষ্ঠুর বাহু তাদের রেলিং-এর

ওপর দিয়ে টেনে জলের মধ্যে নিয়ে গেল। জাহাজের সর্দার-মাঝি, মিস্ত্রি, পাল তৈরির দর্জি দৌড়িয়ে ডেকের ওপর চৌকির লোকেদের বাঁচাতে ছুটে গেল কিন্তু পাঁচ-ছয়টা শুঁড় তাদের জড়িয়ে ধরে ঝাঁকি দিয়ে জাহাজ থেকে নামিয়ে নিল।

প্রথম আকর্ষ যখন রেলিং-এর ওপর দিয়ে এসে চার্লিকে ধরে, সেই সময় স্টিউয়ার্ড (জাহাজের অধ্যক্ষ) জাহাজের সামনের দিকে কফি ঘরের দিকে ধীরে-সুস্থে হেঁটে আসছিলেন। লোকটাকে টেনে জলের মধ্যে নামানো দেখে তিনি থমকে দাঁড়ালেন, অবাক হয়ে ঐদিকে তাকালেন, ভাবলেন, লোকটির কি হল! তার কি হঠাৎ মাথা খারাপ হয়ে গেল! চার্লির টলতে টলতে যাওয়া, যেভাবে সে লড়াই করছিল এবং রেলিং-এর ওপর দিয়ে গিয়ে পড়ল তাতে তাঁর ধারণা ছিল কোন কিছু তাকে ধরেছিল। চৌকির লোকেদের প্রাণপণ লড়াই এবং রেলিং-এর ওপর লকলক-করা কয়েক ডজন আকর্ষ দেখে ভয়ে, উৎকণ্ঠায় তাঁর মসৃণ করে কামানো মুখে আতঙ্ক ফুটে উঠল। তিনি এই আদিম সংগ্রাম লক্ষ্য করছিলেন, একটি আকর্ষ এসে তাঁর কোমর জড়িয়ে ধরল এবং গলা দিয়ে অ্যাঁ-অ্যাঁর চেয়ে বেশি জোরে চিৎকার শব্দ বেরনোর আগেই তাঁকে জলের মধ্যে টেনে নিয়ে গেল।

পাচক, তার মাথাভরা আগুন-লাল ঝাঁকড়া চুল, ছুরি হাতে রান্না-কুঠুরি থেকে দৌড়িয়ে জাহাজের পিছন দিকে যেতেই মাঝপথে তাকে ধরে ফেলল। একখানা আকর্ষ সে কেটে ফেলল কিন্তু অন্য আকর্ষগুলো তাকে আটক করে রাখল, কাটা অংশটুকুও গায়ের সঙ্গে লেগেই রইল। জাহাজের সামনের দিকের পাহারাদার লোকেরা ছুরি হাতে দুই দলে ভাগ হয়ে লোকেদের রক্ষা করতে জাহাজের দুই পাশে ছুটে গেল। এতক্ষণে সারা রেলিং জুড়ে লকলকে জিভের মত দীর্ঘ শুঁড়গুলো সারা জাহাজ ঘিরে ধরেছে। প্রচণ্ড জোরে ও তেজের সঙ্গেই তারা যুঝতে লাগল কিন্তু তাদের সফল হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম। এদের কেউ কেউ লাফ দিয়ে মাস্তুল বেয়ে উঠতে লাগল যাতে শূন্যে চলমান বাহুগুলির নাগালের বাইরে যাওয়া যায়। কিন্তু যারা এরূপ করতে গিয়েছিল জাহাজের তলে লুকানো দানবদের নজরে পড়ে গেল এবং সঙ্গে সঙ্গে তাদের নামিয়ে নিয়ে গেল জাহাজের পাশ দিয়ে। জাহাজে এত আকর্ষ এসেছে যে, তাদের কেটে শেষ করা সম্ভব নয়; যেগুলো দুখণ্ড করে ফেলা হচ্ছিল তারও খণ্ডিত অংশ গায়ের সঙ্গে আটকে রইল। আকর্ষগুলোর তলার দিকে ছিল শোষকবাটি আর বাটির মধ্যে সারি সারি ধারালো নখ।

চার্লি মারা পড়ার পর ক্যাপ্টেনের সহকর্মী তাঁকে বলে—এখন বুঝতে পারছি। যারা জাহাজের তলায় জমা হয়েছে ওগুলো সব অক্টোপাস। তিমি বাদে সাগরে

তারাই সবচেয়ে বড় ; আর কেবল স্পার্ম তিমিই তাদের মোকাবিলা করতে পারে। স্পার্ম তিমি তাদের খায়, আবার তারা যদি ওকে বেশ খানিকক্ষণ জলে ডুবিয়ে রেখে মেরে ফেলতে পারে তবে তারাই ওকে খাবে। আমি একখানা ছুরি নিয়ে এসে লোকেদের সাহায্য করব।

ক্যাপ্টেন ঝাঁঝালো স্বরে বললেন—এখানে দাঁড়িয়ে ওসব বলার চেয়ে তাই করুন তো। যা বললেন, ওসব আমি জানি। লোকগুলো মারা পড়ছে!

সহকর্মী দ্রুত তার ঘরের দিকে চলে গেল। তার একখানা শিকারের ছুরি আছে। চমৎকার অস্ত্র, এ পর্যন্ত ব্যবহার করা হয়নি, তার আট ইঞ্চি ফলায় ক্ষুরের মত ধার। যে অক্টোপাসটি হাল চেপে ঘরে জাহাজ অচল করে দিয়েছিল, সে বুঝতে পারে তার সঙ্গীরা পাহাড়ের মত যে পদার্থটির গায়ে লেগে রয়েছে তার ওপর থেকে খাদ্য সংগ্রহ করে নিচ্ছে। সে দুইটি আকর্ষ জাহজের পিছন দিকের মঞ্চের ওপর তুলে মিঃ মারগামের দিকে এগিয়ে দেয়।

যে লোকটি হালের কাছে দাঁড়িয়ে ছিল সে চেঁচিয়ে উঠল—ওদিকে দেখুন স্যার! মিঃ মারগাম নিচে ঘরের মধ্যে যাওয়ার জন্য পা বাড়িয়েছেন এমন সময় এই চিৎকার শুনতে পেলেন। কাঁধের ওপর দিয়ে শূন্যপানে তাকাতেই দেখেন সাপের মত লকলকে একটা রশি তার দিকেই আসছে। ওখান থেকেই লাফ দিয়ে নামার চেষ্টা করলেন তিনি, কিন্তু একটু দেরি হয়ে গেছে। আকর্ষ তাঁর বুক পেঁচিয়ে ধরে কষে ফেলল। তিনি ঠেকানর চেষ্টা করলেন, ছোট একটা চিৎকার দিলেন, নিজেকে মুক্ত করার প্রাণপণ আগ্রহে হাত ও পা দিয়ে দরজা চেপে ধরলেন। ক্যাপ্টেনকে বললেন—ছুরি এনে এটাকে কেটে আমাকে বাঁচান। ক্যাপ্টেন ভীতিবিহ্বল চোখে তাঁর দিকে চেয়ে দেখে ছুরি আনতে ডেক থেকে সিঁড়ি দিয়ে দৌড়ে নেমে কেবিনের দিকে গেলেন।

অন্য একটি আকর্ষ এসে হালের কাছে দাঁড়ানো লোকটির কোমর জড়িয়ে ধরল, এক হাত চাপা পড়ল আকর্ষের মধ্যে, অন্য হাত খোলা থাকল। Unicorn জাহাজে নিয়ম ছিল, হালের কাছে দাঁড়িয়ে কাজে রত থাকার সময় সঙ্গে ছুরি রাখা চলবে না। কাজেই টমসনের কাছে ছুরি ছিল না। সে জানত, এইসব আকর্ষকের বিরুদ্ধে মানুষের কোন কিছু করার সাধ্য নেই, কেবল কেটে ফেলা চলে। তাই সে ক্যাপ্টেনের ছুরি নিয়ে আসার প্রতীক্ষা করতে লাগল। এই সময়ের মধ্যে সে একটা ঝাঁকি দিয়ে আকর্ষটাকে ফুট দুই কাছে টেনে এনেছে, তারপর হাল ঘুরানো চাকার আড়ার সঙ্গে আকর্ষটাকে দুটি প্যাঁচ দিয়ে তার আগা কণ্ঠে ধরে রাখল। এক হাত দিয়ে এ কাজ করতে দারুণ জোর দরকার, তবে তার গায়ে অসাধারণ জোর ছিল বলেই সে এটা করতে পেরেছিল।

এখন আড়াটি না ভেঙে গেলে অক্টোপাস তাকে টেনে নিতে পারছিল না। চাকার আড়াটি ভাঙাও সহজ ছিল না, ওটা ছিল সেগুন কাঠের এবং অত্যন্ত শক্ত। সহকর্মীর হাত ছাড়া আর কোন অস্ত্র ছিল না! হাতে কোন কাজ হবে না। সে যেখানে দাঁড়িয়ে ছিল সেখান থেকে সামান্য নীচে একখানা ধারালো কুড়াল ঝুলান ছিল। ঐটিকে হাতের নাগালে আনার জন্য সে প্রাণপণ চেষ্টা করল কিন্তু হল না; অক্টোপাস তার বাঁধন ঢিলে দিতে রাজি ছিল না বরং এমন চাপ দিতে থাকল যে, সহকর্মী যন্ত্রণায় গোঙাতে লাগল।

ক্যাপ্টেন গেছেন কয়েক মিনিটও হয়নি। মারগাম ভাবলেন ক্যাপ্টেন আর ফিরবেন না। দম বন্ধ হওয়ার অবস্থায় হাঁপাতে হাঁপাতে চেঁচিয়ে তাড়াতাড়ি আসতে বললেন। ক্যাপ্টেন গারটন চিৎকার করে বললেন, ছুরি খুঁজে পাচ্ছিনে, একখানা কুড়াল নিয়ে এখুনি আসছি।
'ঈশ্বরের দোহাই, শীগগির করুন, জানোয়ারটা আমাকে পিষে ফেলল'—সহকর্মীর আকুল আর্তকণ্ঠ।
ক্যাপ্টেন কুড়ালখানা হাতে করে মারগারের দিকে আসতেই দেখা গেল তাঁকে টেনে হিচড়ে মঞ্চ থেকে নামিয়ে নিয়ে গেল। ক্যাপ্টেন গারটন তাঁর পিছে পিছে ছুটে ডেকের ওপর এসে নামলেন, কুড়াল দিয়ে আকর্ষকে আঘাত করার চেষ্টা করলেন। কুড়াল আকর্ষে লাগার আগেই মারগম আছড়ে পড়লেন জাহাজের গায়ে, তারপর এক পাশ দিয়ে জলের মধ্যে।
হালের কাছেকার লোকটি চাকার আড়ার সঙ্গে আকর্ষের দুই পাক লাগিয়ে শক্ত করে ধরে রেখেছিল কিন্তু তবু গায়ের বাঁধন ক্রমেই কষে যাচ্ছিল। তার দম বন্ধ হয়ে আসছে। মুখ লাল হয়ে গেছে। যতই সে মুক্ত হওয়ার চেষ্টা করে অক্টোপাসের গেরো ততই কষে বসে। তার শক্তি শেষ হয়ে আসছিল।

মারগামের কি হল দেখার জন্য রেলিং-এর ওপর দিয়ে উঁকি দিয়েই ক্যাপ্টেন ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে পিছিয়ে এলেন। ক্যাপ্টেন খুব একটা শক্ত সমর্থ মানুষ নন। চাকার দিকে তাকিয়ে ওখানে টমসনের শোচনীয় অবস্থা দেখতে পেলেন। আড়ার সঙ্গে যেখানে আকর্ষ প্যাঁচ দিয়ে রাখা হয়েছে, সেখানে কোপ দিয়ে কাটার ইচ্ছায় এগিয়ে যেতেই তিনি হোচট খেয়ে পড়ে গেলেন। ভয়ে শরীর ঠক ঠক করে কাঁপছে! এ অবস্থায় কুড়াল উঁচু করে তোলাই কঠিন। কুড়ালখানা মাথার ওপর তোলার জন্য তিনি কয়েক সেকেন্ড দাঁড়িয়ে রইলেন।
যে অক্টোপাসটা হাল 'জ্যাম' করে দিয়েছিল সে একটু ঢিলে দিতেই চাকাটি খানিক ঘুরে গেল, আড়ার সঙ্গে যে প্যাচ লাগানো ছিল তাও গেল খুলে! টমসন ওপরের মঞ্চ থেকে ছিটকে পড়ল নিচের দিকে। তার ধাক্কায় ক্যাপ্টেন মুখ থবড়ে পড়লেন ডেকের ওপর, তাঁর হাতের কুড়াল পিছলে পড়ে গেল।

কাঁপতে কাঁপতে উঠে তিনি কুড়ালখানা কোন রকমে ধরলেন। এই সময় দেখেন একটি আকর্ষ তাঁর দিকে আসছে। উন্মাদের মত কুড়াল দিয়ে তিনি সেই দোলায়িত বাহুর ওপর আঘাত করতেই কুড়ালখানা হাত ফসকে সাগরে গিয়ে পড়ল। আঁকড়ে ধরতেই তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলেন, অক্টোপাস তাঁকে টেনে নিচে নিয়ে গেল।

জাহাজের সামনের দিকে যে লোকটি পাহারায় ছিল সে দেখল শেষ নাবিকটি অক্টোপাসের কবলে চলে গেল। কি করে নিজের জীবন বাঁচানো যায় এই চিন্তায় সে দিশাহারা হয়ে পড়ল। এ পর্যন্ত কোন আকর্ষ তার দিকে আসেনি। এর হাত এড়ানোর জন্য সে নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রইল, আশা এই, তারা হয়ত তাকে দেখতে পাবে না।

কিন্তু এতে সে নিরাশ হল। একটি বাহু এসে এদিক ওদিক দুলতে দুলতে প্রতি মুহূর্তে তার দিকে এগিয়ে এল। তরাসে উন্মত্তের মত হয়ে সে রেলিং-এর ওপর গিয়ে উঠল এবং নিচে চেয়ে একটি অক্টোপাসের ভয়ংকর মুখ দেখতে পেল। তার ছুরিখানা উল্টা করে ধরে মারল ছুঁড়ে অক্টোপাসের চোখ নিশানা করে। তাকটা এমন অব্যর্থ হল যে, সে দেখতে পেল ছুরিটা জানোয়ারের চোখের মধ্যে আমূল বসে গেছে। প্রচণ্ড আলোড়ন তুলে সেটা সরে গেল। ওপরের দিকে চেয়ে লোকটি দেখল ডেকের ওপর অল্প কয়েকটা আকর্ষ এদিক ওদিক হাতড়াচ্ছে শিকার সন্ধানে। সে নিচে নেমে গেল আরো একখানা ছুরি আনার জন্য কিন্তু খুঁজে পেল না, কোথাও ছুরি নেই। সব নাবিক খালাসি ছুরি আর মগ নিয়ে লড়াই করতে করতে শেষ হয়ে গেছে। সামনের দিকে গিয়ে সে ভাবল কেবিনে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিলে সে রক্ষা পাবে। কিন্তু তার এক মুহূর্ত দেরি হয়ে গেল। অক্টোপাসের বাহুগুলি তাকে পেয়ে গেল। এর অল্প পরেই একদল স্পার্ম তিমি সেখানে এসে হাজির। Unicorn-এর কাছাকাছি তাদের নিশ্বাস ফেলার শব্দ শোনা গেল। অক্টোপাসেরা তাদের যম স্পার্ম তিমিদের আগমন জানতে পেরেই নিঃশব্দে সটকে পড়ল, চলে গেল সমুদ্রের গভীর অংশে।

মেরিভেল (**Merivale**) নামে একখানা জাহাজ নিউইয়র্ক থেকে পূর্বমুখে চলেছিল। কয়েকদিন চলার পর পালখাটানো একখানা জাহাজ লোকেদের নজরে পড়ল। সেটি কেমন এলোমেলো ভাবে চলছিল, মনে হচ্ছিল সেখানা পরিত্যক্ত, কারণ হালের কাছে বা ডেকের ওপর কোন লোকই দেখা যাচ্ছিল না। সূর্যোদয়ের পর মৃদুমন্দ বাতাস বইছিল। অদ্ভুত জাহাজখানা পশ্চিমদিকে কিছুটা এগিয়ে আসে, সব পালে বাতাস লাগে ; খানিক পরে

আবার বিপরীত দিকে ফিরে যায়। এইভাবে একবার যাওয়া আর ফিরে আসা —এই রকম চলছিল বারেবারে। 'মেরিভেলের' ক্যাপ্টেন ও সহকর্মী জাহাজের ওপর থেকে এই দৃশ্য লক্ষ্য করেছিলেন। তাঁরা যে সংকেত পাঠাচ্ছিলেন তারও কোন সাড়া মেলেনি। তখন একখানা নৌকা পাঠান হল ব্যাপার কি দেখার জন্য।

নৌকা Unicorn-এর পাশে গিয়ে ভিড়ল। সহকর্মীকে ঠেলে রেলিং-এর ওপর তুলে দেওয়া হল। নৌকার চিত্রকরকেও ঐ জাহাজে উঠিয়ে দেওয়া হল ; সে রেলিং ধরে দোল খেয়ে ডেকের ওপর গিয়ে পেঁছল।

সারা ডেক পরিষ্কার, কোথাও এলোমেলো কিছু নেই, কেবল সামনের দিকের ডেকের ওপর কফির দাগ, তখনও সম্পূর্ণ শুকায়নি। কেবিনের মধ্যে কফির জন্য টেবিল পাতা হয়েছিল, কিন্তু ডিস ব্যবহার করা হয়নি। সহকর্মী অবাক হয়ে মাথা চুলকায়, ব্যাপার কী? জীবন রক্ষার নৌকাগুলো সব যথাস্থানে ঝুলানো, তাদের ঢাকনি স্পর্শ পর্যন্ত করা হয়নি। কোন অসুখ বা বিদ্রোহের কোন চিহ্ন নেই কোথাও। সে যখন এই রহস্যময় ব্যাপারটি নিয়ে চিন্তামগ্ন তখন তার দলের একজন লোক এসে সামনে দাঁড়াল।

সে বলে—স্যার, ওরা বেশিক্ষণ আগে যায়নি ; জাহাজের উনুনে এখনো তাজা আগুন!

হোমারের কাব্যে সাগরদৈত্য

সাগরের সঙ্গে গ্রীকদের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তার যোগ। বাইরের আক্রমণ থেকে সাগর তাদের রক্ষক ; সাগর তাদের দূরদূরান্তরে উপনিবেশ বিস্তারের বাহক। বাণিজ্য দ্বারা সম্পদ আহরণ ও সাগরের অপর কূলে ও দূরে প্রবাসে সভ্যতা বিস্তারের মাধ্যম। প্রাচীন সাহিত্যে সাগরের কথা ও সাগরের ভয়ংকর প্রাণীর কাহিনী দেশের মানুষের চিত্ত আকর্ষণ করেছিল। গ্রীসের মহাকবি হোমারের 'ওডিসি' দেবদেবী, বীরপুরুষ, কাপুরুষ, দৈত্যদানবের কাহিনীতে পূর্ণ। ওডিসির নায়ক ইথাকার রাজা ওডিসিউসকে ঘিরে রোমাঞ্চকর কাহিনীর জাল বোনা হয়েছে। ওডিসিউস অপহৃতা সুন্দরী হেলেনকে উদ্ধারের জন্য গ্রীক যোদ্ধাদের সঙ্গে ট্রোজান যুদ্ধে যোগ দিয়েছিলেন। যুদ্ধশেষে দেশে ফেরার সময় সমুদ্রপথে নানা অ্যাডভেঞ্চারে দশ বছর কেটে গেল। এই সময় সাগর পথে ওডিসিউসের যে বিচিত্র সব অভিজ্ঞতা হয় তার কাহিনী রচনার দুহাজার বছর পরেও পাঠকের মনে ভীতি ও দেহে শিহরণ জাগায়।

দেবী সার্কি ওডিসিউসকে সাগর ডাইনী 'সাইরেন' এবং রাক্ষসী 'সিলা' ও 'চ্যারিবডিস' সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়েছিলেন। তাঁর উপদেশ পালন করেও কিরূপ বিপদের ভিতর দিয়ে সাগর পাড়ি দিতে হয়, সে কথা ওডিসি থেকে তুলে দিই ঃ

দেশে ফিরতে সমুদ্রে কিরূপ বিপদের মুখে পড়তে হতে পারে সে সম্পর্কে ওডিসিউসের প্রতি সার্কির সতর্কবাণী। সার্কি ওডিসিউসের প্রতি প্রসন্ন ছিলেন তাই বিপদ থেকে তাকে পূর্বেই সাবধান করে দেন।

সার্কি বলেন···দেখবে অন্য দিকে রয়েছে দুইটি পাহাড়। এর বড়টির শিখর একেবারে আকাশে উঠে গেছে। তার চারদিক ঘিরে দেখা যাবে কালো মেঘ যা কিনা কি গ্রীষ্ম কি শস্য কাটার সময় কোন কালেই মেঘমুক্ত হয় না। মেঘ সেখান থেকে সরে যায় না বলেই আবহাওয়া সেখানে পরিষ্কার হয় না কখনই।

·· এটা হল সিলার বাড়ি, যার গলার আওয়াজ কুকুরের ডাকের মত ভয়ংকর। একথা ঠিক, সে আওয়াজ একটি কুকুর-বাচ্চার ভেক-ভেকের চেয়ে উচ্চ নয় ; তবু সে এক দারুণ জানোয়ার, কেউ তার মুখের দিকে চেয়ে আঁৎকে না উঠে পারবে না। এমন কি দেবতার চোখ পড়লে সে-ও না। ঐ রাক্ষসীর বারোখানা পা, সব শূন্যে ঝোলে আর ছয়টি লম্বা গলা, গলার শেষ প্রান্তে কুৎসিৎ মাথা, তাতে তিন সারি দাঁত ঘন ঘন বসানো। একেবারে মূর্তিমান বিকট মৃত্যু। তার দেহের অর্ধেকখানি গুহার মধ্যে ডোবান। তার মাথাগুলো যেন পাতাল থেকে

বেরিয়ে এসেছে। সে তার বাড়িতে বসেই শিকার ধরে। পাহাড়ের চতুর্দিকে লক্ষ্য রাখে আর যেই ডলফিন, তরোয়াল মাছ বা অন্য কোন বড় জানোয়ার দেখতে পায় অমনি তাকে ধরে ফেলে। কোন নাবিক বলতে পারবে না, সে সিলার পাশ দিয়ে জাহাজ চালিয়ে গেছে কিন্তু কাউকে হারায়নি। যে জাহাজই ঐ পাহাড়ের পাশ দিয়ে যাবে সিলার ছয়টি মাথা তা থেকে ছয়জন লোক তুলে নেবেই, এই তার শিকার ধরার পদ্ধতি।

"দুটি পাহাড়ের অন্যটি ছোট, ওডিসিউস, তুমি নিজেই দেখতে পাবে এদের দুটির মধ্যেকার দূরত্ব, তীর ছুঁড়লে যতখানি যাবে তার চেয়ে বেশি নয়। ঐ পাহাড়ের ওপর একটা ডুমুর গাছ আছে, তার পল্লব সতেজ। ঠিক এর নিচে প্রাণ কাঁপানো চ্যারিবডিস কালো জল শোষণ করে নেয়। দিনে তিনবার সে ফুৎকার দিয়ে জল বের করে দেয়, আর তিনবার জল টেনে নেয়। তার ফলে যখন এই রকম জল নিয়ে খেলা চলে ঈশ্বর যেন তোমায় তার কাছ থেকে দূরে রাখেন, কারণ যিনি পৃথিবী কাঁপান স্বয়ং তিনিও তোমাকে বিপদ থেকে রক্ষা করতে পারবেন না। না, তুমি সিলা পাহাড়ের কোল ঘেষে যত বেগে পারো জাহাজ চালিয়ে পার হয়ে যেও, কারণ সবসুদ্ধ মারা পড়ার চেয়ে ছয়জন নাবিক খোয়ান বরং ভাল।"

আমার মন ভারি খারাপ হয়ে গেল। এর কিছু পরে আমার সঙ্গী লোকেদের সব কথা খুলে জানালাম, বললাম—বন্ধুগণ, দেবী সার্কি তাঁর দৈবী বিজ্ঞতার বলে আমার কাছে যে ভবিষ্যৎবাণী করেছেন তা আমাদের একজন বা দুজন জানবে তা ঠিক নয়। আমি তোমাদের কাছে সেই কথাগুলো বলছি যাতে আমরা মরি বা বাঁচি, সবাই আগে থেকে সাবধান হতে পারি। তাঁর প্রথম সতর্ক-বাণী হল রহস্যময়ী সাইরেনদের সম্পর্কে। তাদের গান শুনে আমরা যেন না ভুলি আর তাদের কুসুমাস্তীর্ণ প্রান্তর থেকে যেন দূরে থাকি। তিনি বলেছেন, কেবল আমি তাদের কণ্ঠ শুনতে পারি কিন্তু তোমরা আমাকে মাস্তুলের খুঁটির সঙ্গে শক্ত করে বেঁধে রাখবে যাতে আমি সেখান থেকে নড়তে না পারি। দড়ির প্রান্তটা ঐ খুঁটির সঙ্গেই আটকিয়ে রাখবে। আমি যদি আমাকে মুক্ত করে দেবার জন্য তোমাদের অনুরোধ করি তোমরা আমাকে আরো শক্ত করে কষে বাঁধবে।'

এইভাবে আমি আমার লোকেদের সবকথা বুঝিয়ে দিলাম। ইতিমধ্যে আমাদের উত্তম জাহাজখানা ঠিক ঠিক মত বাতাস পেয়ে সাইরেনদের দ্বীপের কাছাকাছি এসে পড়ল। কিন্তু এই সময় বাতাস পড়ে গেল। কোন-শক্তি যেন ঢেউগুলো শান্ত করে ঘুম পাড়িয়ে দিল, চারিদিক নিথর হয়ে গেল। আমার লোকেরা আসন থেকে উঠে পাল নামিয়ে ফেলল এবং সেটি নৌকার

খোলের মধ্যে গুটিয়ে রাখল। তারপর দাঁড়ে বসে মসৃণ পাইনকাঠের দাঁড় জলে নামিয়ে দিয়ে জল মন্থন করে তাতে ফেনা তুলতে লাগল। এই অবসরে আমি বড় গোলাকার এক পিণ্ড মোম নিয়ে তরোয়াল দিয়ে ছোট ছোট টুকরো করলাম, গায়ের সবখানি জোর দিয়ে আঙ্গুলের পেষণে টিপতে সুরু করলাম। আঙ্গুলের চাপে কিছুটা গরম হল, আকাশে সূর্যদেবেরও সহায়তা পেলাম, মোম গরম হয়ে অনেকটা নরম হল। তখন প্রতিটি নাবিকের কান মোম দিয়ে বন্ধ করে দিলাম। তারপর তারা মাস্তুলের সঙ্গে আমার হাত পা বেঁধে আমাকে বন্দী করে রাখল, দড়ির প্রান্ত মাস্তুলের গায়েই জড়িয়ে রেখে দিল। এই কাজ শেষ করে তারা নিজ নিজ জায়গায় বসে ধূসর জলে দাঁড় চালাতে লাগল।

আমরা যখন তীরের কাছাকাছি এসে পড়েছি তখন সাইরেনরা জানতে পারে যে, একখানা জাহাজ তাদের দিকে বেগে আসছে। তখন তারা মধুরস্বরে গান গাইতে সুরু করল।

জলের ওপর দিয়ে সেই কণ্ঠ এসে আমার হৃদয় কামনায় এমন পূর্ণ করল যে, আমি আমার লোকেদের আকারে ইঙ্গিতে, ভ্রূকুটি করে আমার বাঁধন মুক্ত করতে আকুতি জানাতে লাগলাম। কিন্তু তারা দাঁড় টেনেই চলল। ঐ সময় পেরিমিডিস এবং ইউরিলোকাস লাফ দিয়ে উঠে আমার বাঁধন আরো কষে, আরো নতুন দড়ি লাগিয়ে দিল। তারপর সাইরেনদের দ্বীপ পার হয়ে যাওয়ার পর তাদের কণ্ঠ এবং গানের রেশ যখন আর শোনা গেল না, আমার সঙ্গীরা তাদের কানের মোম তুলে ফেলে আমাকে বাঁধন খুলে মুক্ত করে দিল।

এই দ্বীপ পিছনে রেখে যেতে না যেতেই সামনে চেয়ে দেখি ধোঁয়ার কুণ্ডলী আর উত্তাল ঢেউ, যার গর্জন আগে থেকেই শুনতে পাচ্ছিলাম। আমার নৌকার মাল্লারা এত ভীত হয়ে পড়ল যে, হাতের মুঠি থেকে দাঁড় খসে নৌকার গায়ে এসে লেগে রইল, নৌকাও গতিহীন স্থির হয়ে গেল। আমি তখন নৌকায় নাবিকদের কাছে গিয়ে গিয়ে তাদের সাহস দিলাম।

এইভাবে ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে আমরা একদিকে সিলা, অন্যদিকে চ্যারিবডিস—এই দুই বিপদের মধ্যেকার প্রণালী দিয়ে অগ্রসর হতে লাগলাম। চ্যারিবডিস তার গহ্বরে সাগরের লোনা জল টেনে নেয়; সে যখন তা বমি করে দেয়, বিরাট কড়াই উপচে জ্বলন্ত আগুন বেরিয়ে পড়ার মত হয় সে দৃশ্য। যে জল সে শূন্যে ছুঁড়ে দেয় তা পাহাড়ের দুইপাশে বৃষ্টির ধারায় এসে পড়ে। কিন্তু সে যখন লবণজল গিলে খায়, তার উদর গহ্বরের ভিতরের দিকটা খালি হয়ে পড়ে, তার প্রাণচমকানো গর্জন পাহাড়ে প্রতিধ্বনিত হয়, দেখা যায় সাগরতলের কালো বালি।

আমার লোকেরা ভয়ে ফ্যাকাশে হয়ে গেল। এই সময় ঐদিক থেকে বিপদ আসতে পারে ভেবে আমরা যখন চ্যারিবডিসের দিকে চেয়ে আছি, সিলা আমার নৌকার ওপর থেকে নাবিকদের মধ্যে সবচেয়ে সমর্থ ছয়জনকে কামড়ে ধরে

রাক্ষসী সিলা নাবিকদের তুলে নিচ্ছে

তুলে নিল। নৌকার দিকে ফিরে মাঝিদের ওপর চোখ ফেলতেই নজরে পড়ল শূন্যে আমার মাথার ওপর রাক্ষসীর মুখ হতে নাবিকদের হাত পা ঝুলছে। কানে এল 'ওডিসিউস্' বলে কাতর আর্তনাদ। এই শেষবারের মত তারা আমার নাম উচ্চারণ করল। বঁড়শি দিয়ে মাছ ধরার সময় মৎস্যশিকারী যেমন টোপ গেঁথে বঁড়শিটি দূরে ছুঁড়ে দেয় এবং ছোট মাছ তাতে এসে ঠোকর দিলেই এক সট্‌কা টানে ছট্‌ফটকরা মাছটিকে ডাঙায় তুলে ফেলে, সিলা তেমনি আমার সঙ্গীদের ঝটকা মেরে ধরে পাহাড়ের ওপর নিয়ে তুলল, তারা তখন হাত-পা ছুঁড়ছে, চিৎকার করে আমার দিকে হাত বাড়িয়ে যন্ত্রনায় কাতরাচ্ছে; আর রাক্ষসী তার নিজের ঘরের দরজায় বসে তাদের খাচ্ছে। সাগরে কত ভয়ংকর বেদনাদায়ক দৃশ্যই তো দেখতে পেয়েছি কিন্তু এর চেয়ে করুণ কোন দৃশ্য আমি দেখিনি।

সাগরের দানব

পৃথিবীর সকল জাতির সাহিত্য, পুরাণ ও উপকথায় সাগরের উল্লেখ রয়েছে। সাগর একদিকে যেমন আদি মানবের ভয় ও বিস্ময় উৎপাদন করত, অন্য দিকে খাদ্যসম্পদ ও অ্যাডভেঞ্চারের ক্ষেত্র বলে আকর্ষণও করত। মানুষের স্বভাব এই, যা নিত্য পরিচিত তার চেয়ে নতুন মনকে বেশি দোলা দেয়। সুন্দর এবং বৃহৎ তাকে অভিভূত করে। সুন্দর তার মনে যে অনুভূতি জাগায় তাতে আছে আনন্দ ও সৌন্দর্যবোধ ; বৃহৎ ভয়ংকর তার মনে আনে ভীতি মিশ্রিত বিস্ময়। তাই বাঘের ভয়াল সৌন্দর্যে সে আকৃষ্ট হয়, সাপের প্রাণনাশক ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও তার দৈহিক সৌন্দর্যে সে মুগ্ধ হয় কিন্তু ভয়ংকর যদি কুৎসিৎ হয় তা উৎপাদন করে ঘৃণামিশ্রিত ভীতি।

মিশর, ব্যাবিলন, ভারত, চীন ও গ্রীক সাহিত্যে সাগরের দানব সম্পর্কে অনেক কাহিনী আছে। হোমারের মহাকাব্য ওডিসিতে সাইরেন, সিলা ও চ্যারিব্-ডিসের কবলে নাবিকেরা কিরূপ বিপন্ন হত তার রোমাঞ্চকর বিবরণ আছে। সাইরেনরা দ্বীপবাসিনী মায়াবিনী রাক্ষসী, সিলা বোধ হয় অতিকায় অক্টোপাস বা স্কুইড এবং চ্যারিবডিস সাগরের ঘূর্ণাবর্ত যার মধ্যে পড়লে আরোহীর সলিল সমাধি ছিল নিশ্চিত। অক্টোপাসের বাহু আটখানা স্কুইডের বাহুর সংখ্যা দশ। হোমারের বর্ণনায় সিলার বাহু ১২ খানা ও মুখ ৬ টি। দানবের অস্বাভাবিক ভয়ংকরতা বোঝানর জন্য এটি কাব্যিক অতিরঞ্জনও হতে পারে।

চীনাদের রূপকথায় সামুদ্রিক ড্রাগন বিরাট আকারের সাপ, তার আছে ধারাল নখরযুক্ত পা, পিঠ ও লেজের ওপর কাঁটা ; তার নিঃশ্বাসে আগুন ছোটে। বাইবেল ওল্ড টেস্টামেণ্টে বলা হয়েছে, মহাপ্রলয়ের দিন, যেদিন পৃথিবী ধ্বংস হবে সেদিন ঈশ্বর তাঁর তরবারি দিয়ে বিরাট সাপ ও সাগরের ড্রাগনকে হত্যা করবেন। দীর্ঘ সর্পাকৃতি দানব এখনও সমুদ্রের গভীর অংশে বাস করছে, সমুদ্রে চলাচলকারী নাবিকদের অনেকের মনে এরূপ বিশ্বাস বিদ্যমান। তার কারণ রাত্রিকালে বা অন্য সময়ে অস্পষ্ট আলোকে বিশাল সর্পসদৃশ এমন প্রাণী তাদের চোখে পড়ে যা জীব বিজ্ঞানীর নজরে আসে নি। তাই তার স্বরূপ জানা যায়নি, নামকরণও হয়নি।

অনেকের এমন ধারণাও আছে যে, প্রাগৈতিহাসিক যুগে স্থলভাগে এক সময়ে যেসব অতিকায় ডায়নোসর বিচরণ করত, তাদের কেউ কেউ সাগরে আশ্রয় নিয়ে এখন পর্যন্ত বেঁচে থাকতে পারে।

* আধুনিক যুগের জলদৈত্য

আধুনিক যুগ বিজ্ঞানের বিস্ময়কর অগ্রগতির যুগ। ভূপৃষ্ঠে এমন কোন স্থান নেই যেখানে মানুষের দৃষ্টি পড়েনি। উচ্চতম পর্বত থেকে গভীরতম সমুদ্র অঞ্চল পর্যন্ত তার কৌতূহল, অনুসন্ধিৎসা ও বৈজ্ঞানিক চেতনা প্রসারিত। সমুদ্রের তলদেশে, যেখানে সূর্যকিরণ পেঁছয় না, চির অমাবস্যার অন্ধকার যেখানে স্থায়ী হয়ে বাসা বেঁধেছে, সেখানেও মানুষ পেঁছে গেছে উজ্জ্বল আলোক আর ক্যামেরা নিয়ে। শুধু তাই নয়, মহাকাশে পাড়ি দিয়ে যা মনে হয় ধরা ছোঁয়ার বাইরে সেই কল্পনার উৎস চাঁদেও মানুষ পদক্ষেপ করেছে এবং ধরণীতে ফিরে এসেছে সেখানকার মৃত্তিকা নিয়ে। এই যুগে 'ক্ষুদ্র' পৃথিবীতে যে কোথাও অজানা বিস্ময় লুকিয়ে থাকতে পারে অনেকে হয়ত তা মানতে চাইবেন না। কিন্তু আমরা যা জানি তার চেয়ে আরো অনেক অজানা বস্তু রয়ে গেছে যার স্বরূপ এখনো সঠিক জানা যায়নি। এই রকম একটি রহস্য হল জলদৈত্যের অস্তিত্ব।

স্কটল্যাণ্ডের পশ্চিম অংশে ইনভারনেস-সায়ার প্রদেশ, সেখানে সাগর থেকে মাত্র ৫২ ফুট উঁচুতে এক মিঠাজলের হ্রদ, লকনেস (Lock Ness) ২২½ মাইল দীর্ঘ, গভীরতা ৭৫০ ফুট। ১৯৩৩ সনে হ্রদের মধ্যে এক বিশাল প্রাণীর মাথা দেখা গেল ; দীর্ঘ গলা, মুখ কতকটা ঘোড়ার মুখের মত, শুধু গলা ও মাথা জাগিয়ে তুলেছে। দূর থেকে তোলা ফটোগ্রাফে দৈত্যের সুস্পষ্ট আকার বোঝা গেল না। তবে এটি সমুদ্রের পরিচিত অন্য প্রাণী থেকে পৃথক, তা বোঝা গেল এর মাথা ও গলা দেখে। অনেকের ধারণা হল, এটি ডায়-নোসর ধরণের অতিকায় জীব কিন্তু এর গতিবিধি এখন পর্যন্ত রহস্যময় হয়েই রয়ে গেছে। তবে কারো কারো ধারণা এটি সামুদ্রিক সাপ, শুধু সামনের অংশটা চোখে পড়েছে। দূর থেকে যে অংশটুকু দেখা গেছে তার হিসাবে এর পূর্ণাঙ্গ দেহ ৬০।৭০ ফুটের কম হওয়ার কথা নয়। কিন্তু এ পর্যন্ত সামুদ্রিক সাপের যে বিবরণ জানা গেছে তাতে ৯ ফুটের বেশি দীর্ঘ কোন নমুনা মেলেনি।

১৮৩৩।৩৪ সালের পর থেকে অনেকে এ প্রাণীটিকে ক্ষণকালের জন্য দেখেছে, কেউ কেউ ফটোও তুলেছে তবে এটি প্রকৃত কী প্রাণী, সে সম্বন্ধে সঠিক জানার মত ছবি বা তথ্য পাওয়া যায়নি। কাজেই লকনেস জলদৈত্য মানুষের কাছে রহস্যাবৃত প্রাণীরূপেই চিহ্নিত হয়ে আছে।

ঝিনুক, শঙ্খ, কড়ি

সমুদ্রের পরিচয় লাভের পর এ কথাটা আমাদের কাছে পরিষ্কার হয়ে যায় যে, রুদ্ররূপে সমুদ্র ভয়ংকর, প্রাণঘাতী, মানবের প্রাণান্তকারী বহু জীবের আবাস। আবার ভদ্ররূপে সমুদ্র মানবের প্রাণের রক্ষক, খাদ্য ও সম্পদের আকর, মানবের মনোতোষী বহুবিধ বস্তুপুঞ্জের উৎস। স্থলচর জীব আমরা, আমাদের সঙ্গে প্রতিদিন সমুদ্রের সাক্ষাৎ যোগাযোগ সম্ভব নয় তবু পরোক্ষ যোগাযোগ বিদ্যমান।
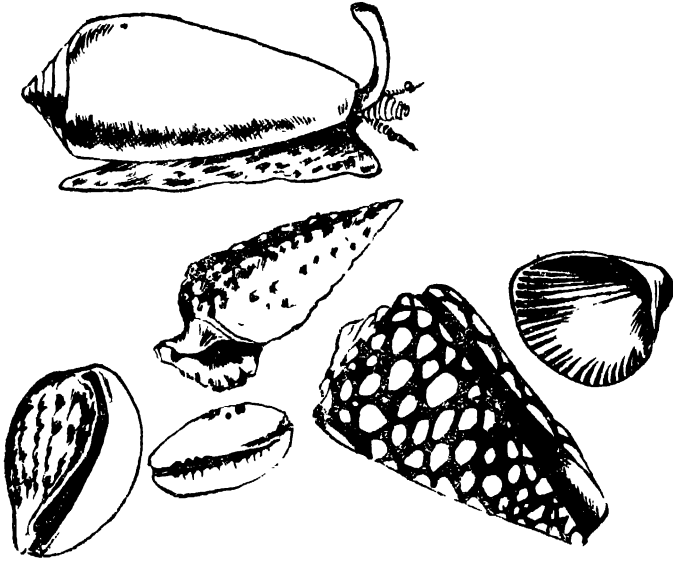
সমুদ্রের বিচিত্র ঝিনুক, শঙ্খ, কড়ি

প্রাচীনকাল থেকেই নানা আকারের নানা ডিজাইনের বিচিত্র বর্ণের শামুক, ঝিনুক, শঙ্খ, কড়ি মানুষের কাছে আকর্ষণীয়। ঢেউ-এর দোলায় সাগরবেলায় এরা এসে পড়লে মানুষ এদের সমুদ্রের দান হিসাবে সানন্দে গ্রহণ করেছে। ধীবরেরা জালে তুলেছে বহু বিচিত্র ঝিনুক শঙ্খ। এগুলো একদিকে খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হয়েছে, অন্যদিকে এদের নকশারঞ্জিত রঙিন খোলা অলংকার ও নানা শৌখিন দ্রব্য নির্মাণের উপাদানরূপে কাজে লাগানো হয়েছে। তাছাড়া বিচিত্র-দ্রব্যসংগ্রহকারীদের উদ্যম দেখা দেয় নানাজাতের ঝিনুক-শঙ্খখোলা

যোগাড় করার দিকে। প্রায় এক লক্ষ প্রজাতির ঝিনুকের মধ্যে কে কতটি তার সংগ্রহ-ভাণ্ডারে জমাতে পারে—তা নিয়ে চলে প্রতিযোগিতা। এক সময়ে দুর্লভ রঙিন ঝিনুকের চাহিদা এমন বেড়েছিল যে, একটি ঝিনুক খোলা ৫০ থেকে ৬০ ডলারে বিক্রি হত। সবচেয়ে উত্তম ঝিনুক 'সাগরের গৌরব' **Conus gloria meris, The glory of the sea** ১৯৫৭ সনে ১২৫০ ডলার অর্থাৎ সাড়ে বারো হাজার টাকা দাম পেয়েছিল। ভারতের বিভিন্ন সাগরতটে নানা আকারের যেসব ঝিনুকখোসা ছড়িয়ে থাকতে দেখা যায় সেগুলি এত মূল্যবান বিবেচিত না হলেও তাদের সৌন্দর্য, গড়ন, বৈচিত্র্য ও রঙের নিপুণ নকশা কম নয়নলোভন নয়।

এক সময়ে কড়ি আমাদের জীবনযাত্রার অপরিহার্য অঙ্গরূপে বিবেচিত হত। কড়ি অর্থাৎ সমুদ্রের ঝিনুক জাতীয় জীবের দেহের শক্ত খোল প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যেত। কেনাকাটায়, জিনিসপত্রের লেনদেনের ব্যাপারে কড়ি ছিল স্বীকৃত মুদ্রা, বলা যায় সমুদ্রের টাঁকশালে তৈরি বরুণদেবের 'পয়সা'। আমাদের দেশে এর প্রচলনের স্মৃতি টাকা-পয়সার সঙ্গে যুক্ত হয়ে এখনও টিকে আছে। কড়ির প্রচলন এখন নেই কিন্তু 'টাকাকড়ি', 'পয়সাকড়ি', 'কানাকড়ি' কথাগুলি অর্থবোধক হয়ে সচল আছে।

আর শঙ্খ? অলংকার ছাড়াও হিন্দুর ঘরে ঘরে পুজার আসনের কাছে এর স্থান। উৎসবের সময় শঙ্খধ্বনি মাঙ্গলিক শব্দ, বিপৎকালে শঙ্খধ্বনি দ্বারা অন্য সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করা প্রথারূপে গণ্য। বিভিন্ন শঙ্খের শব্দে পার্থক্য আছে। প্রাচীন ভারতে সুদূরকালে যোদ্ধারা নিজ নিজ শঙ্খধ্বনি করে আপন সৈন্যদের উৎসাহ ও শত্রুপক্ষের ভীতি উৎপাদন করতেন। মহাভারত যুদ্ধকালে কৌরব ও পাণ্ডবপক্ষের সেনানীরা যেসব শঙ্খ বাজিয়ে হুংকার ঘোষণা করেছিলেন তাদের বিচিত্র নাম আমরা পাই মহাভারতে ও ভগবত-গীতায়। শ্রীকৃষ্ণের শঙ্খের নাম 'পাঞ্চজন্য', অর্জুনের শঙ্খ 'দেবদত্ত', ভীমের শঙ্খ 'পৌণ্ড্র' আকারে বিশাল, যুধিষ্ঠিরের শঙ্খ 'অনন্তবিজয়' নকুল ও সহদেবের শঙ্খ 'সুঘোষ' ও 'মণিপুষ্পক' নামে পরিচিত। এই শঙ্খগুলির হয়ত আওয়াজে এমন বৈশিষ্ট্য ছিল যে, কার শঙ্খ বাজছে তা দূর থেকে শুনেই বোঝা যেত। বর্তমানকালের যুদ্ধে শঙ্খ বাজানোর প্রয়োজন হয় না; শঙ্খের চেয়ে অনেকগুণ বেশি উচ্চশব্দকারী আয়ুধ মানুষের অস্ত্রাগারে জমা হয়েছে। তাই বলে শঙ্খের আদর কিছুমাত্র কমেনি। শঙ্খ-ঝিনুক-কড়ির মাধ্যমে হিন্দুরা সমুদ্রের সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রাখে। শঙ্খের মধ্যে সমুদ্রের কলগর্জন স্তব্ধ হয়ে আছে, মুখের ফুৎকারে তার জাগরণ।

দক্ষিণমেরু সামুদ্রিক অভিযান

দক্ষিণমেরু পৃথিবীর শীতলতম সর্বাধিক বায়ু-আলোড়িত, তীব্রতম ঝটিকাসংকুল মহাদেশ। ১৯১২ সনের ১২ জানুয়ারী ক্যাপ্টেন স্কট দক্ষিণমেরুতে পৌঁছে বলেছিলেন—'ওঃ পরমেশ্বর! কী ভয়ংকর স্থান।'

দুর্গম এবং অজানাকে জানার বাসনায় মানুষ জীবন তুচ্ছ করে মৃত্যুর মুখে এগিয়ে যেতে ভয় পায় না। তবু আজ পর্যন্ত অনাহরিতসম্পদ কুমেরু মহাদেশ মানুষের কাছে প্রায় অজ্ঞাতই রয়ে গেছে, তার কারণ এর নিঃসঙ্গ অবস্থান, এর প্রাণহীন ভূমির প্রকৃতি এবং অদ্ভুত আবহাওয়া।

দক্ষিণমেরু মহাদেশ আয়তনে অষ্ট্রেলিয়ার চেয়ে বড়, যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপ একত্র করলে যতবড় হয় তার চেয়ে বড়, চীন ও ভারত একত্র করলে যতবড় হয় তার চেয়েও বড়। এতবড় দেশ কিন্তু বলতে গেলে প্রাণের অস্তিত্ব নেই। ১ কোটি ৪৩ লক্ষ বর্গকিলোমিটার আয়তনের দেশ দেড় কিলোমিটারের বেশি পুরু বরফস্তরে ঢাকা। যেখানে বরফস্তর সবচেয়ে পুরু সেখানে তার ঘনত্ব ৪½ কিলোমিটার। এখানে ৫,১২,০০০ বর্গকিলোমিটার স্থলভাগ বরফযুক্ত আছে। দক্ষিণমেরুর বরফ যদি কোন কারণে গলে যায়, পৃথিবীর সকল মহাদেশের সমুদ্র ৬০ মিটার (প্রায় ১২০ ফুট) ফুলে উঠবে অর্থাৎ সাগরতীরের অনেক দেশ-নগর-বন্দর সাগরজলে ডুবে যাবে। কুমেরুতে রয়েছে পৃথিবীর বরফের প্রায় ৯০ ভাগ। পৃথিবীর মিঠাজলের ৭৫ ভাগই দক্ষিণমেরুর 'তুষার-ব্যাংকে' জমা রয়েছে।

* দক্ষিণমেরুর সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক কী?

বর্তমান মানচিত্রের দিকে তাকালে ভারতের সঙ্গে দক্ষিণমেরুর কোন সম্পর্ক অনুমান করা যাবে না। এখন ভারত মহাসাগর, আটলান্টিক মহাসাগর ও প্রশান্ত মহাসাগর কুমেরুদেশকে চারদিক থেকে ঘিরে রেখেছে; কুমেরু থেকে ভারতের দূরত্ব ভারত মহাসাগরের ছয় হাজার মাইল বিস্তার, মাঝে কেবল কয়েকটা ক্ষুদ্র দ্বীপ। কিন্তু এই রকম ভৌগোলিক অবস্থান আদিতে ছিল না। ভূতত্ত্বের মেসোজোয়িক যুগে আফ্রিকা, কুমেরু, দক্ষিণ আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া ও ভারত—এই পাঁচটি স্থলভাগ একত্র ছিল। বিজ্ঞানীরা এর নাম দিয়েছেন গন্ডোয়ানাল্যান্ড। কালক্রমে এই স্থল অংশ ভেঙে দূরে দূরে সরে গেছে, মাঝে দেখা দিয়েছে মহাসাগর। ভূমি গঠনের দিক থেকে দক্ষিণ ভারতের সঙ্গে দক্ষিণমেরু দেশের কোন প্রকার আত্মীয়তা বা সগোত্রতা আছে কিনা বিজ্ঞানীর কাছে তা কৌতূহলের বিষয়।

বিজ্ঞানীদের ধারণা কয়লা, লোহ, ইউরেনিয়াম, তেল, গ্যাস প্রভৃতির অফুরন্ত ভাণ্ডার রয়েছে দক্ষিণমেরুতে। জনবসতির পক্ষে সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত এই মহাদেশের বাসিন্দা হল পেঙ্গুইন প্রভৃতি কয়েক জাতের মেছো পাখি, আর সমুদ্রে রয়েছে চিংড়িজাতীয় ছোট মাছ (ক্রিল) যার পরিমাণ মনে করা হয় ১০ কোটি টনের কম নয়। এই খাদ্যের জন্য কুমেরু সাগর হয়েছে নানা জাতের তিমির বিচরণক্ষেত্র। তিমি এবং মাছের সন্ধানে মানুষও হাজির হয় কুমেরুর আশেপাশের মহাসাগরে। স্থল-উপনিবেশ স্থাপন করে রাজ্য গড়ে তোলার পক্ষে উপযোগী না হলেও উন্নত দেশগুলি এখান থেকে সম্পদ আহরণের চেষ্টায় বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি নিয়ে হাজির হয়েছে। মানুষ যখন মহাশূন্যে ভাসমান উপগ্রহের ওপর নগরী স্থাপনের স্বপ্ন দেখছে, চাঁদে উপনিবেশ স্থাপনের পরিকল্পনা করছে, তখন পৃথিবীরই এক প্রান্তের দেশ মানুষের বাসের অযোগ্য বলে পরিত্যাগ করবে ? একথা নিশ্চিত যে, দক্ষিণমেরু মহাদেশেও মানুষের কর্ম তৎপরতা বৃদ্ধি পাবে। যারা সেখানে আগে গিয়ে উপস্থিত হবে, তাদের সুবিধা হবে বেশি।

* দক্ষিণ গঙ্গোত্রী

ভারতের তিন-চতুর্থ ভাগ সাগরবেষ্টিত। ভারত মহাসাগরের সঙ্গে আমাদের জীবন-মরণ সম্পর্ক। ভারতের জলবায়ু নির্ধারিত হয় ভারত মহাসাগর দ্বারা, ভারতের উপকূল বাণিজ্য ও প্রতিরক্ষায় ভারত মহাসাগরের গুরুত্ব অপরিসীম। আবার দক্ষিণমেরু মহাসাগর নানাভাবে ভারত মহাসাগরের গতিপ্রকৃতি নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। কাজেই জাতীয় স্বার্থেই দক্ষিণমেরু মহাসাগরের স্বরূপ অবগত হওয়ার প্রয়োজন অনুভূত হয়। শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর প্রধানমন্ত্রীত্বকালে সাগর বিষয়ে গবেষণার জন্য মহাসাগর উন্নয়ন বিভাগ গঠিত হয় এবং তাঁর দূরদৃষ্টি ও উৎসাহের ফলে ১৯৮১ সালের জুলাই/আগস্টে প্রথম কুমেরু অভিযানের সূত্রপাত। এই অভিযানের উদ্দেশ্য ছিল—(i নিবিড়ভাবে সমুদ্র বিদ্যা চর্চার প্রবর্তন (ii সমুদ্র সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ (iii) বৈজ্ঞানিক ও অর্থনৈতিক অগ্রগতির লক্ষ্য অনুসরণ করে ভারতীয় জ্ঞান ও কর্মের ক্ষেত্র সম্প্রসারণ (iv কুমেরু মহাদেশে একটি কর্মতৎপরতার কেন্দ্রস্থাপন।

দক্ষিণমেরু সাগর সাধারণ সমুদ্রের মত নয়। প্রচণ্ড শীতে এবং হিমশৈলে আচ্ছন্ন। এখানকার সাগরে চলার জন্য বিশেষভাবে নির্মিত বরফ ভাঙা জাহাজ প্রয়োজন যা একদিকে যেমন জমাট তুষারশৈলের চাপ সহ্য করে অক্ষত থাকবে, অন্য দিকে তুষারের বাধা অতিক্রম করে এগিয়ে চলবে। ডঃ এস. জেড কাশিমের নেতৃত্বে ২১ সদস্যের অভিযাত্রী দল গঠিত হয়। নরওয়ের G. E. Reifer and

Co. Bergen থেকে M. V. Polar Circle নামে একখানা ভাড়া করা Ice breaker জাহাজে গোয়ার মার্মাগাঁও বন্দর থেকে ১৯৮১ সালের ৬ই ডিসেম্বর প্রথম ভারতীয় অভিযাত্রী দল যাত্রা করলেন। ১৬ ডিসেম্বর অভিযাত্রী জাহাজ পেঁছিল মরিশাস দ্বীপে ; সেখান থেকে যাত্রা ২২ ডিসেম্বর। তারপর

গিরিজা সিং সিরোহী—প্রথম ভারতীয় দক্ষিণ গঙ্গোত্রী অভিযাত্রী। ১৯৬০ সালে আমেরিকান দলের সঙ্গে দক্ষিণ মেরুতে পদার্পণ করেন।

৪০° এবং ৫০° অক্ষাংশের মধ্যে গর্জনশীল চল্লিশা (Roaring Forties)-এর তুমুল ঝড় তুফান কাটিয়ে, বড় বড় হিমশৈলের বাধা অতিক্রম করে তুষারস্তূপ ভেঙে জাহাজ গন্তব্যস্থানে গিয়ে পেঁছিল।

একমাস তিন দিন পরে ১৯৮২ সনের ৯ই জানুয়ারী বৈজ্ঞানিক অভিযাত্রী দল দক্ষিণমেরু মহাদেশে উপনীত হয়ে ৬৯·৫৯", ২৩·১২" দক্ষিণ অক্ষাংশ এবং ১১·৫৩", ২৬·৮৩" পূর্ব দ্রাঘিমাংশে বেসক্যাম্প স্থাপন করলেন। এর নাম দেওয়া হল 'দক্ষিণ গঙ্গোত্রী'। ঐ দিনটি ভারতের বিজ্ঞান-গবেষণার ইতিহাসে এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করে দিল।

দক্ষিণ গঙ্গোত্রী নামটির অতীত ও বর্তমানের মধ্যে কাব্যিক বন্ধন সূচিত হয়েছে। ভারতের পুণ্য নদী গঙ্গা উত্তরে অবস্থিত হিমালয়ের গোমুখী থেকে নির্গত হয়ে প্রায় সারা উত্তর ভারত সলিলধারায় স্নিগ্ধ ও সুফলা করে সাগরে এসে পড়েছে। অতি প্রাচীন ভূতাত্ত্বিক যুগে ভারত গন্ডোয়ানাল্যান্ডের অংশ হিসাবে কুমেরু মহাদেশের সঙ্গে যুক্ত ছিল। এখন ভারত ও কুমেরুর মধ্যে

সমুদ্রের ব্যবধান দুস্তর হলেও তার সঙ্গে প্রাচীন সম্পর্ক পুনঃ প্রতিষ্ঠার উদ্যমে গঙ্গার প্রবাহ মিলনসূত্ররূপে কাজ করতে পারে। দক্ষিণ গঙ্গোত্রী গঙ্গার সর্বদক্ষিণ উপস্থিতির প্রতীক। প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী দক্ষিণ মেরু দেশে উপনীত অভিযাত্রী দলকে আনন্দবার্তা পাঠিয়ে উৎসাহিত করেছিলেন। পরের বছর, ১৯৮৩ সনের ৯ই জানুয়ারী ডাক ও তার বিভাগ কর্তৃক দক্ষিণ মেরুদেশে উপনীত প্রথম বৈজ্ঞানিক অভিযাত্রী দলের সম্মানে স্মারক ডাকটিকিট প্রকাশ করা হয়।

* ইন্দিরা মাউন্ট

প্রথম অভিযাত্রীদল নতুন মহাদেশে পর্যবেক্ষণকেন্দ্র স্থাপন করে নানা বৈজ্ঞানিক তথ্য সংগ্রহ করা ছাড়া একটি ভৌগোলিক আবিষ্কারের কৃতিত্ব অর্জন করেছেন। যন্ত্রপাতির সাহায্যে সমুদ্রতলদেশের অবস্থা পরীক্ষা করতে গিয়ে এঁরা ৫৩´ ৩৯·৭৯´ দক্ষিণ অক্ষাংশে এবং ৫৫·৮২´ উত্তর দ্রাঘিমাংশে একটি অজানা ডুবো পাহাড়ের সন্ধান পান। এটা 8,৫০০ মিটার গভীর তলদেশ থেকে ১,২০০ মিটার পর্যন্ত উঠে-আসা অর্থাৎ ৩,৩ ০ মিটার উঁচু নির্বাপিত আগ্নেগিরি যা এতদিন পর্যন্ত মানুষের কাছে অজ্ঞাত ছিল। ভারতীয় বিজ্ঞানীগণ এই সাগর-পাহাড়টি 'ইন্দিরা মাউন্ট' নামে চিহ্নিত করেছেন। বলা যায়, ইন্দিরা মাউন্ট ভারতের বৈজ্ঞানিক গবেষণা তৎপরতায় দক্ষিণমেরু মহাসাগরের উৎসাহসূচক স্বাগত-উপহার।

দক্ষিণমেরু মহাসাগরের ভূতাত্ত্বিক ইতিহাসে এই নিমজ্জিত পাহাড়ের আবিষ্কার বিশেষ গুরুত্ব পাবে। তথ্য পুস্তিকায় বলা হয়েছে ঃ

> **The discovery of this hitherto unreported sea mount will have in important bearing on the geological history of the Antarctic Ocean. —Antarctica, p. 13**

প্রথম অভিযাত্রীদল দক্ষিণ গঙ্গোত্রীতে ১০ দিন থাকার পর ভারতে ফিরে আসেন। দক্ষিণমেরুতে ৬ মাস দিন, ৬ মাস রাত্রি। ফেরার আগে অভিযাত্রীরা স্বয়ংচালিত আবহাওয়া নিরূপক যন্ত্র স্থাপন করে আসেন যাতে বাতাসের গতি, বেগ, তাপ, আর্দ্রতার পরিমাণ লিপিবদ্ধ হয়ে থাকবে। বৃষ্টিপাত ও তুষারপাত মাপার যন্ত্র স্থাপন করা হয়। কম্পিউটার স্থাপন করে তার মধ্যে ক্যাসেট রাখা হয় যাতে বিভিন্ন তথ্য সংগৃহীত হবে। সৌরতাপে চালিত কম্পিউটারে এমন ব্যাটারি সন্নিবেশ করা হয় যাতে ৬ মাস দীর্ঘ সূর্যবিহীন রাত্রিকালেও যন্ত্রপাতি চালু থাকে।

দক্ষিণ গঙ্গোত্রী অভিযানে সংগৃহীত তথ্য ও বিবিধ ভূতাত্ত্বিক নিদর্শন থেকে

জ্ঞানের অনেক নতুন সূত্রের সন্ধান মিলেছে। শিলা পরীক্ষায় দক্ষিণ ভারতের সঙ্গে দক্ষিণমেরু দেশের ভূতাত্ত্বিক সামঞ্জস্য ধরা পড়েছে।

* দ্বিতীয় অভিযান

অমিতাভ সেনগুপ্ত—প্রথম বাঙালী দক্ষিণগঙ্গোত্রী অভিযাত্রী। দিল্লীস্থ ন্যাশনাল ফিজিক্যাল ল্যাবরেটরির বিজ্ঞানী প্রথম ও দ্বিতীয় অভিযানে ভারতীয় দলে অংশগ্রহণ করেছিলেন।

দ্বিতীয় দক্ষিণ গঙ্গোত্রী অভিযান ১৯৮২ সনের ২৭ শে ডিসেম্বর কুমেরু দেশে উপনীত হয়। এবারের অবস্থানকাল ৫৭ দিন। এবারের কাজ ছিল পূর্ব স্থাপিত যন্ত্রপাতি পরীক্ষা, ক্যাসেট উদ্ধার, স্থায়ী কেন্দ্র স্থাপনের আয়োজন, বিমান অবতরণক্ষেত্র চিহ্নিত করা এবং দক্ষিণমেরু দেশ ও ভারতের মধ্যে সরাসরি বেতার যোগাযোগ স্থাপন। এছাড়া ঐ অঞ্চলের বিবিধ জৈব ও অজৈব নিদর্শন এবং আবহাওয়া পরীক্ষার ব্যবস্থা করা। সমুদ্রের গভীরে বিভিন্ন স্তরে তাপমাত্রার পরিমাপ এবং গভীর সমুদ্রের তলদেশে শব্দ পরিবহন সম্পর্কে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালানো হয়।

* তৃতীয় অভিযান

ফিনল্যাণ্ডের আইস-ব্রেকার জাহাজ ফিন পোলারিস (**Finn Polaris**) ডঃ এইচ. কে. গুপ্তের নেতৃত্বে ৮৩ জনের অভিযাত্রীদল নিয়ে ৩রা ডিসেম্বর, ১৯৮৩

যাত্রা করে, ২৭শে ডিসেম্বর দক্ষিণ গঙ্গোত্রীতে উপনীত হয়। এই দলে দুইজন মহিলা বিজ্ঞানীর একজন ছিলেন সুদীপ্তা সেনগুপ্তা। স্থায়ী. ঘাঁটি স্থাপন করার পর এখানে জনা ১২ সদস্যের এক বছর থাকার ব্যবস্থা করা হয় যাতে ৬. মাস

সুদীপ্তা সেনগুপ্তা—প্রথম বাঙালী মহিলা অভিযাত্রীণী। যাদবপুর বিশ্ব বিদ্যালয়ের অধ্যাপিকা তৃতীয় অভিযাত্রীনী সঙ্গী। আর একজন ভারতীয় মহিলা পুনার অদিতি পন্থের সহযাত্রী ছিলেন। এই অভিযানেই প্রথম মহিলারা অংশগ্রহণ করেন।

ব্যাপী শীতের রাতে এখানকার অবস্থা পর্যবেক্ষণের সুযোগ পাওয়া যায়। শীততাপ নিয়ন্ত্রিত বিশেষ ধরণের কক্ষে ১৫ জনের বাসের যোগ্যস্থান সহ গবেষণা কক্ষ ও অবসর যাপনের জন্য বিশেষ বন্দোবস্ত রাখা হয়েছে।

- চতুর্থ অভিযান

ভারতের চতুর্থ দক্ষিণমেরু অভিযান ১৯৭৪ সনের ৪ ডিসেম্বর গোয়ার মার্মাগাঁও বন্দর থেকে যাত্রা করে, কুমেরুতে উপস্থিত হয় ২৫ জানুয়ারি, ১৯৮৫। তৃতীয় অভিযানে যাত্রীদল যে জাহাজ ব্যবহার করেছিলেন, এবারও সেই ফিন্‌পোলারিস (**Finn Polaris**) নামে ফিনল্যান্ডের আইস-ব্রেকার (**Ice-breaker**) জাহাজ

ব্যবহার করা হয়। ১৫৯ মিটার দীর্ঘ, ১২,৩৮৫ টন ওজনের ভার বহনক্ষম শক্ত খোলের এই জাহাজটি ৭০ সি. এম. বরফস্তর কেটে এগিয়ে চলতে পারে। সাধারণ জাহাজের পক্ষে বরফস্তূপ ঠেলে এগিয়ে যাওয়া এবং চাপ সহ্য করে অক্ষত থাকা সম্ভব নয়।

মার্মাগাঁও বন্দর থেকে দক্ষিণমুখে ভারতমহাসাগরের ভিতর দিয়ে মরিশাস দ্বীপ। সেখানে পেঁছিতে সময় লাগে ৮ দিন। সেখানে ৩ দিন বিশ্রাম, তারপর অতিথি অভিযাত্রী হিসাবে মরিশাসের এক বৈজ্ঞানিককে দলে নিয়ে কুমেরু উদ্দেশ্যে যাত্রা। দক্ষিণমেরুর দিকে এগিয়ে চলতে অতিক্রম করতে হয় প্রবল-ঝটিকায় উত্তাল সমুদ্র ও হিমশৈলের প্রতিরোধ। এসব কাটিয়ে চললেও পূর্বে-স্থাপিত 'দক্ষিণ গঙ্গোত্রী বেস্ ক্যাম্পে উপস্থিত হতে হেলিকপটার ছাড়া উপায় নেই কারণ, যাত্রাপথের শেষ ৭০ কিলোমিটার মত সমুদ্র-পথ জাহাজের পক্ষে অগম্য। পরিকল্পনা অনুসারে ৪ খানা হেলিকপ্টার 'ফিনপোলারিসে' নিয়ে যাওয়া হয়। হেলিকপ্টার জাহাজে রাখা এবং তার পরিচালন-ব্যবহারের যাবতীয় বন্দোবস্ত অভিযানের অঙ্গ হিসাবে সুনিয়ন্ত্রিত।

* দল ও প্রস্তুতি

চতুর্থ অভিযানের নায়ক নির্বাচিত হন ধানবাদ খনিবিদ্যা প্রতিষ্ঠান (Indian School of Mines)-এর ভূ-পদার্থবিদ্যার বিভাগীয় প্রধান ডঃ বিমলেন্দুভূষণ ভট্টাচার্য। দলের সদস্য সংখ্যা ছিল ৮২। এঁদের মধ্যে ছিলেন ভারতীয় সেনাবাহিনীর ২৬ জন, বিমানবাহিনীর ১৩ জন, নৌবাহিনীর ১৩ জন, সেনাবাহিনীর ৪ জন ডাক্তার এবং বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক সংস্থা থেকে নির্বাচিত ২৫ জন বিজ্ঞানী। এছাড়া মরিশাস বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষিবিদ্যা-প্রতিষ্ঠানের একজন প্রতিনিধি বৈজ্ঞানিক সহযাত্রী হন, আর ভারতীয় ফিল্মস ডিভিশনের একজন ফটোগ্রাফার ক্যামেরা নিয়ে সঙ্গী হন নতুন মহাদেশের তথ্যচিত্র তোলার উদ্দেশ্যে।

কুমেরু অভিযান ভারতের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে কিংবা উষ্ণমণ্ডলীয় অঞ্চলের এক দেশ থেকে অন্য দেশে অভিযানের মত নয়। বলা যায়, উষ্ণ আরাম-দায়ক পরিবেশ থেকে শীতলতম নির্মম পরিবেশে অবতরণ; সূর্যকিরণের কোমল সুখস্পর্শ আলিঙ্গন থেকে মৃত্যুতুল্য হিমপ্রবাহের কবলে স্বেচ্ছায় উপস্থিতি। মনোরম জলবায়ু-পরিবেশে অভ্যস্ত ভারতীয়দের দক্ষিণমেরুর আবহাওয়া-পরিস্থিতির জন্য দৈহিক ও মানসিক দিক থেকে প্রস্তুত হয়ে রীতিমতো বাস্তব প্রশিক্ষণের প্রয়োজন হয়। ভাগ্যক্রমে হিমালয়ের বিভিন্ন অংশে তুষারস্তূপ ও হিমবাহের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সুযোগ মেলে। জম্মু ও কাশ্মীরের জোজিলা

গিরিপথের ম্যাকোই হিমবাহ-ক্ষেত্রে এঁদের পর্বত আরোহণ, তুষারস্তূপ তুষার ফাটল ও অন্যান্য বাধা অতিক্রম করার কৌশল শেখানো হয়। প্রাকৃতিক বিপদের মুখে স্থৈর্য ও স্নায়বিক ভারসাম্য রক্ষার ওপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়। দলগত সামর্থ হল অভিযাত্রীদলের শক্তি, ব্যক্তির সামর্থ্য নিয়েই দলের সামর্থ্য। কাজেই প্রতি সদস্যের দৈহিক পটুতা ও মানসিক ক্ষমতা সম্বন্ধে ডাক্তারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হয়। নগরজীবন থেকে হাজার মাইল দূরে দলের কোন একজনের বিকলতা সমগ্র দলের কার্যক্ষমতার ওপর প্রতিকূল প্রভাব বিস্তার করে ; সেজন্যই সর্বপ্রকার পূর্ব-সতর্কতা।

দক্ষিণমেরু মনুষ্য-বিহীন, বৃক্ষলতাহীন, বিশ্বের শীতলতম স্থান, যেখানে বাতাসের গতিবেগ ঘণ্টায় ২৫০ কি. মি. ; শীতাংক শূন্যের চেয়েও ২৪ ডিগ্রি কম।

* রসদ

দক্ষিণমেরুতে অভিযাত্রীদের যাত্রাপথের এবং সেখানে অবস্থানকালীন যাবতীয় খাদ্যদ্রব্য ও অন্যান্য উপকরণ সঙ্গে নিয়ে যেতে হয় ; কারণ সেখানে কিছুই মেলে না। উত্তরমেরু অঞ্চলে ঠিক এরকম অবস্থা নয়। সেখানে প্রকৃতি থেকে মানুষ খাদ্য সংগ্রহ করে নিতে পারে ; কয়েক শতাব্দী ধরে এস্কিমো-রা ওখানে পরিবার পরিজন নিয়ে বসবাস করছে। দক্ষিণমেরুতে পেঙ্গুইন ও সামুদ্রিক স্কুয়া পাখি ছাড়া মানুষের নাগালের মধ্যে আর কিছু নেই। সমুদ্রে আছে লাল চিংড়ি জাতীয় ক্রিল (Krill) মাছ যা বিশাল আকারের তিমিদের প্রধান খাদ্য। অভিযাত্রীদের তাই প্রয়োজনীয় যাবতীয় খাদ্য সঙ্গে নিয়ে যেতে হয়। এগুলি হল তৈরী করা চাপাটি, বিবিধ টিনফুড, জেলি, মাছ, মাংস, মশলা, লবঙ্গ ফল, আটা, ভাত, শাকসবজি, পানমশলা ইত্যাদি।

এর ওপর পোশাক-পরিচ্ছেদ, ঔষধপত্র, যন্ত্রপাতি, অবসর বিনোদনের উপকরণ তো বটেই।

* বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান

চতুর্থ অভিযানের ওপর ভার ছিল আবহাওয়া সম্বন্ধে তথ্যানুসন্ধান, হিমবাহ— তার বয়স, গতিবিধি ও প্রকৃতি সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করা ; জলসম্পদ ও খনিজ-সম্পদ বিষয়ে বিশদ তথ্য আহরণ, পেঙ্গুইন ও অন্যান্য সামুদ্রিক পাখিদের জীবন-যাত্রা পর্যবেক্ষণ, প্রোটিনসমৃদ্ধ চিংড়িজাতীয় ক্রিল (krill) সম্বন্ধে গবেষণা ও তথ্যসংগ্রহ। এই সব তথ্য শুধু ভারতীয় বৈজ্ঞানিক, ভৌগোলিক ও প্রাণি-বিজ্ঞানীদের গবেষণাক্ষেত্র বিস্তৃতই করবে না, ভারতের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির ক্ষেত্রও প্রসারিত করতে পারে।

* নতুন কেন্দ্র ঃ 'মৈত্রী'

চতুর্থ অভিযাত্রীদল প্রতিকূল আবহাওয়ার মধ্যেও তাঁদের নির্ধারিত অনুসন্ধান কার্য সমাধা করে ফিরে এসেছেন। এবার তাঁরা 'দক্ষিণ-গঙ্গোত্রী' বেসক্যাম্পের ১৯৫ কিলোমিটার দক্ষিণে একটি সাবস্টেশন স্থাপন করেছেন, এর নাম দেওয়া হয়েছে 'মৈত্রী'। ২৬ জানুয়ারি অভিযাত্রীরা ঐ তুষারমহাদেশেই জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে উৎসাহের সঙ্গে প্রজাতন্ত্রদিবস পালন করেছেন।
সদ্য প্রত্যাগত অভিযাত্রীদল চিত্রসম্বলিত যে বিস্তৃত বিবরণী প্রকাশ করবেন দেশবাসী তার জন্য সাগ্রহে প্রতীক্ষা করবে কারণ, ভারতীয় যুবশক্তির সামনে এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হবে যেখানে বৈজ্ঞানিক মনীষা ও তারুণ্যে তৎপরতা প্রদর্শনের অবারিত সুযোগ মিলবে। সমুদ্র গবেষণা ও সমুদ্র-পরিচিতি ভারতের পক্ষে এক আকর্ষণীয় এবং সম্ভাবনাপূর্ণ চ্যালেঞ্জ। পৃথিবীর কয়েকটি সভ্য দেশ এ বিষয়ে অনেকখানি এগিয়ে রয়েছে। দেরিতে হলেও সমুদ্রের প্রতি ভারত আগ্রহী হয়ে উঠেছে, এটাই আশার কথা।

* ভারত ও কুমেরু মহাদেশ চুক্তি (**India and the Antarctic Treaty**)

১৯৫৯ সনে ওয়াশিংটনে দক্ষিণমেরু মহাদেশ চুক্তি সম্পাদিত হয়। ১৯৬১ সন থেকে ৩০ বছরের জন্য এই চুক্তির কার্যকাল। প্রথমে ১২টি দেশ এতে যোগ দেয়, পরে আরো ১৪টি দেশ এই চুক্তিভুক্ত হয়। ১৯৯০-৯১ সনে বর্তমান চুক্তির মেয়াদ শেষ হলে নতুন করে আন্তর্জাতিক চুক্তির ব্যবস্থা করতে হবে। ১৯৮২ সনে ভারত সহযোগী রাষ্ট্র হিসাবে **Antarctic Treaty**-র অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। ভারত ভারত মহাসাগরকে যেমন শান্তির এলাকারূপে চিহ্নিত করতে চায় তেমনি কুমেরু মহাদেশকে আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা ও শোষণ থেকে মুক্ত রেখে এর নির্মল পরিবেশ রক্ষার পক্ষপাতী। যন্ত্রবিজ্ঞানের প্রসার ও সামরিক উদ্যমের ফলে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল যখন দূষিত হয়ে পড়ার আশংকা দেখা দিয়েছে তখন বিশ্বমানবতার স্বার্থেই কুমেরুর পরিবেশের ভার প্রকৃতির হাতেই থাকা উচিত। কুমেরু মহাদেশ-চুক্তির সদস্য হওয়ার প্রধান শর্ত হল বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও প্রযুক্তিবিদ্যায় পারদর্শিতা প্রদর্শন। সমুদ্র উন্নয়ন বিভাগের তত্ত্বাবধানে এই নতুন ক্ষেত্রে যে কর্মতৎপরতা চলেছে তা দেশবাসীর কাছে অভিনন্দন এবং বিশ্বের বিজ্ঞানী মহলে স্বীকৃতি লাভ করেছে।

* ভারত ও ভারতমহাসাগর

এশিয়া মহাদেশের প্রাকৃতিক মানচিত্রের দিকে তাকালে ভারতবর্ষকে মনে হবে একখানি মৌচাক হিমালয় থেকে দক্ষিণ দিকে ঝুলে রয়েছে। এর পশ্চিমের অর্ধাংশ বাদে সমগ্র দক্ষিণ দিক ঘিরে রেখেছে সমুদ্রের জলরাশি। পশ্চিমে আরবসাগর, দক্ষিণ জুড়ে ভারতমহাসাগর। ভৌগোলিক কারণে জলদায়িনী নদীগুলির উৎস হিসাবে হিমালয়কে যদি বলা হয় ভারতের জনক, ভারত মহাসাগরকে বলা যায় ভারতের প্রাণের পোষক, সম্পদের ভাণ্ডার এবং রক্ষক। প্রাচীনতমকাল থেকে ভারত মহাসাগর মেঘরূপী স্নেহাশিস শূন্যপথে ভাসিয়ে দেশের অভ্যন্তরে পাঠিয়ে করুণাধারায় দেশকে স্নিগ্ধ করেছে, জীবন-ধারণের অনুকূল পরিবেশ রচনা করে দিচ্ছে। আবার বাণিজ্যপ্রসারের বিস্তৃত অঙ্গন প্রসারিত করে দিয়ে ভারতবাসীকে বিদেশের সঙ্গে পণ্যদ্রব্য ও ভাবধারা বিনিময়ের সুযোগ দিয়েছে। শুধু বর্তমানকালে নয়, সুদূর অতীতেও উদ্যমশীল দেশবাসীর বিচরণক্ষেত্র হয়েছিল এই মহাসাগর। কবি তাই ভারতের অতীত গৌরব প্রসঙ্গে বলেছেন 'একদা যাহার অর্ণবপোত ভ্রমিল ভারতসাগরময়।'

ভারতমহাসাগর একদিকে সম্পদের পরিবহণ পথ, বিদেশে জ্ঞানধর্মসভ্যতার বাণীর বাহন, অপর দিকে অশেষ রত্নের ভাণ্ডার।

* সামুদ্রিক খনি

আটলাণ্টিক, প্রশান্ত ও ভারতমহাসাগরের নিচে ভূপৃষ্ঠের ওপর ছড়িয়ে রয়েছে অজস্র নুড়ি, ভূতাত্ত্বিকরা যাদের নাম দিয়েছেন পলিমেটালিক নোডিটলস **(Polymetallic nodules)**। এইসব নুড়ির মধ্যে আছে তামা, নিকেল, কোবাল্ট এবং দস্তার মত মূল্যবান ধাতু। এই নুড়ি বেশি পরিমাণে দেখতে পাওয়া যায় ৩৫০০ থেকে ৬০০০ মিটার গভীরতায়। মহাসাগরগুলির নিচে ৪৬০ লক্ষ বর্গ কিলোমিটার স্থান জুড়ে এগুলি ছড়িয়ে আছে। এগুলির অবস্থান —প্রশান্তমহাসাগরে ২৩০ লক্ষ বর্গ কিলোমিটার, ভারতমহাসাগরে ১৫০ লক্ষ বর্গ কিলোমিটার এবং আটলাণ্টিক মহাসাগরে ৮০ লক্ষ বর্গ কিলোমিটার স্থানে। এইসব নুড়ি থেকে মোট ১'৭ ট্রিলিয়ন টন মূল্যবান ধাতু সংগ্রহ করা যেতে পারে। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মত এ ব্যাপারে ভারতীয় বিজ্ঞানীরাও উদ্যোগী হয়েছেন। গোয়ার ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব ওসেনোগ্রাফি ভারতমহাসাগর থেকে নিয়মিত সংগ্রহ করছেন এ ধরণের নুড়ি, এবং পরীক্ষা করে

দেখছেন। অদূর ভবিষ্যতে এইসব নুড়ি থেকে মূল্যবান ধাতু সংগ্রহের ব্যাপারে তাঁরা পরিকল্পনাও করেছেন। —বিজ্ঞানের টুকরা খবর, দেশ ২৫, ১০, ৮৬

* সমুদ্র মানুষের খাদ্যভাণ্ডার

শস্য-উৎপাদক ভূমিই একমাত্র খাদ্যভাণ্ডার নয়, সমুদ্রও অফুরন্ত খাদ্যের যোগানদার। এ খাদ্য শুধু পুষ্টিসমৃদ্ধ মাছ ও অন্যান্য জলচর জীব নয়, সমুদ্রজলের ভিতরেও খাদ্যের মৌল উপাদান নিহিত। বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় সমুদ্র জল থেকে প্রোটিন উৎপাদনের কৌশল আবিষ্কৃত হয়েছে, জৈব উপাদান থেকে প্রাপ্ত প্রোটিনের সঙ্গে এর গুণগত কোন পার্থক্য নেই, পার্থক্য শুধু স্বাদে, সামান্য মিষ্টত্বের অভাবে, এই অভাবটুকু পূরণ করে দিলেই স্বাভাবিক প্রোটিনের পর্যায়ে এসে যায়। এই আবিষ্কারের ফলে মানুষের প্রয়োজনীয় একটি মূল্যবান বস্তুর উৎস মানুষের আয়ত্তে এসেছে।

* সমুদ্র শক্তির উৎস

সর্বদা আন্দোলিত সমুদ্র তরঙ্গ যান্ত্রিক উপায়-মাধ্যমে ব্যবহার করে বিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদনে সাফল্য লাভ করেছে পশ্চিমের কতকগুলি রাষ্ট্র। ভারতের উপকূলে সমুদ্রের জলোৎক্ষেপ কাজে লাগিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদনের চেষ্টা চলেছে। এদিক দিয়ে চিরন্তন সমুদ্র অন্তহীন শক্তির উৎস।

* সমুদ্র ভবিষ্যতে কৃষিভূমি ও আশ্রয়

জল ও স্থলের প্রাণী তাদের দৈহিক গড়ন ও জীবনক্রিয়া সঞ্চালনের অঙ্গের পার্থক্যের জন্য একে অন্যের জগতে প্রবেশ করতে পারে না। মাছের পক্ষে ডাঙায় চলা ও শ্বাস-প্রশ্বাসের উপযোগী অঙ্গের অভাব, তেমনি মানুষের পক্ষে জলের তলায় স্বাভাবিক জীবনযাত্রা সম্ভব নয়। কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞান মানুষকে জলে জলচর প্রাণীর মত চলতে অনেকখানি স্বাচ্ছন্দ্য এনে দিয়েছে। এই বিজ্ঞান ও কৃৎকৌশলের সহায়তায় মানুষ সমুদ্রতলকে কৃষি ও বসবাসের পক্ষে কাজে লাগানোর উপায় উদ্ভাবনে সচেষ্ট। ভূমধ্যসাগর অঞ্চলে, বিশেষ করে ফ্রান্সের দক্ষিণ উপকূলসাগরে সাগর ও ভূমির সঙ্গে যেমন সম্পর্ক গড়ে তোলা হচ্ছে তাতে অদূর ভবিষ্যতে সাগর জলের নিচে মানুষের কর্মতৎপরতা রীতিমত বেড়ে যাবে, অনুমান করা যায়। এরূপ অবস্থার প্রচলন হলে ভারতের বিস্তীর্ণ উপকূলবর্তী ভারতমহাসাগর নতুনভাবে গুরুত্ব পাবে, কারণ উষ্ণমণ্ডলে এমন অনুকূল সমুদ্র-পরিবেশ বেশি দেশের নেই। সাগর তখন হবে কৃষিউদ্যান ও মানুষের বাগানবাড়ি।

* সমুদ্র কামান ?

সমুদ্রের তলায় কামান আছে, যেখান থেকে তোপধ্বনি উঠে, নদীপথে দেশের মধ্যে চলে আসে ? বরিশাল গান (**Barisal gun**) আর তিস্তা গান (**Tista gun**) এই অদ্ভুত নামে পরিচিত হয়েছে এই জলবাহিত শব্দ। সিরাজগঞ্জ মহকুমার অধিবাসী যাঁরা ব্রহ্মপুত্র শাখা যমুনার তীরবর্তী গ্রামে বাস করেন তাঁদের কাছে এই শব্দ অজানা নয়। বর্ষাকালে নদী যখন জল প্রবাহে স্ফীত এবং রুদ্ররূপিণী তখন মাঝে মাঝে, বিশেষ করে সন্ধ্যার দিকে এবং রাত্রিতে দক্ষিণ-পূর্ব কোণে গুরুগম্ভীর দূরাগত প্রচণ্ড কামান গর্জন শোনা যায়, ঘন ঘন নয়, কদাচিৎ স্বল্পব্যবধানে দুইবার। সর্বদা দক্ষিণ-পূর্ব কোণ থেকেই আওয়াজটা আসে ; সেই শব্দ অনুসরণ করে চললে বঙ্গোপসাগরে পেঁছান যাবে, বরিশালের দক্ষিণে। তাই সম্ভবত এর নাম বরিশাল কামান। বর্ষার পর এই কামান গর্জন শোনা যায় না। ব্রহ্মপুত্র-শাখা যমুনা নদীর পাশের গ্রামাঞ্চল ছাড়া অন্য কোন স্থান থেকে এই গর্জন শুনতে পাইনি।

বর্ষায় তিস্তা নদী থেকেও এমনি আওয়াজ শোনা যায়। শব্দের প্রকৃতি এবং উত্থানের সময়-কাল একইরূপ এবং উৎপত্তিস্থলও একই বলে মনে হয়। জলপাইগুড়ি থেকে দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত তিস্তায় এই গর্জন শোনা যায় দক্ষিণ-দক্ষিণ-পূর্ব কোণে—আওয়াজের গম্ভীরতা ও পরিণাম ঠিক বরিশাল কামানের মতই। এ দুটি কি একই শব্দ জলপথে স্রোতের উজানে একই সঙ্গে বাহিত হয়েছে ? মনে হতে পারে জলস্রোত ঘূর্ণি আকারে নদী-পাড়ে বা তলদেশে প্রতিহত হওয়ায় এ শব্দের উৎপত্তি। কিংবা উঁচু নদীপাড় ভেঙে পড়ার শব্দ। কিন্তু বর্ষায় ভরা নদীতে উঁচু পাড় কোথায় ? বর্ষার পরে পাড় ভেঙ্গে পড়ায় যে শব্দ শোনা যায়, তা বেশিদূরে বায় না। শব্দও সব সময়ে এক রকম হয় না। তবে ? যেখানে জলধারা পাহাড় থেকে নেমে তীব্রবেগে শিলাখণ্ডের ওপর দিয়ে বেগে ছুটে চলে সেখানে এমন শব্দ ওঠে না। কামান গর্জন শুনে বোঝা যায় এতে গভীরতা আছে যা উচ্ছল অগভীর জলে নেই। এ শব্দের উৎপত্তিকেন্দ্র সমুদ্র বলে অনুমান। বিস্ময় এই যে, এতে কোন জলোচ্ছ্বাস নেই। আর কিভাবে সেই প্রচণ্ড শব্দ কিছুমাত্র ক্ষীণ না হয়ে সাগর থেকে ৩।৪ শো মাইল দূরেও শ্রুত হয়। মনে হয় ঐ তো মাইল খানেক দূর থেকে আসছে। রহস্যময় গর্জন।

গ্রন্থপঞ্জী

সমুদ্র ও সমুদ্রজীবন সম্পর্কে তথ্যের জন্য প্রধানত যেসব গ্রন্থের ওপর নির্ভর করতে হয়েছে ঃ

১। Encyclopaedia Britannica Vols 1—23 Edn.

২। Ocean life – Martin and Heather Angel, Octopus Books.

৩। Ocean Life – Norman & Olga Marshall, Blandford Press, London.

৪। Dangerous Sea Creatures—Edited by Eleanor Greaves, Vineyand Books Inc.

৫। Wonderland of Knowledge – Vols 1—12

৬। The Cultural Library Vol 2, Parents' Institute, New York.

৭। Life on Earth, David Attenborough, Fontana.

৮। The Reader's Digest Great World Atlas.